শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে

দ্বিতীয় খণ্ড

সঙ্কলক ও সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আনন্দের বিষয়, এবারেও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথিতে 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'র দ্বিতীয় খণ্ডটি আমরা পাঠকবর্গের হাতে তুলিয়া দিতে পারিলাম। সন্দেহ নাই, প্রথম খণ্ডটির মতো এই খণ্ডটিও ভক্তজনের কাছে আদরণীয় হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গত ডিসেম্বরে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হইবার তিন মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া যায় এবং পুনর্মুদ্রণ করিতে হয়।

এই খণ্ডে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য আশুতোষ মিত্রের সুপরিচিত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'শ্রীমা' শীর্ষক স্মৃতিগ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে (১৩৫১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে) প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশকের ঠিকানা ছিল ঃ সন্তোষকুমার ঘোষ, ৭বি সর্ব খাঁ রোড, পাইকপাড়া, বেলগাছিয়া, কলিকাতা। বিগত ৫১ বৎসরে গ্রন্থটির কোন পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। ভক্তদের নিকট হইতে এই গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের জন্য আমাদের কাছে অনেক অনুরোধ আসিয়াছে। আমরা আশা করি, 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'র দ্বিতীয় খণ্ডে ভক্তগণ রচনাটি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ত্যাগিসন্তানদের মধ্যে যে-দুইজন এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের অন্যতম ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ তাঁহার সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য-পরিচয়' শীর্ষক মূল্যবান তালিকাটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকাশের জন্য আমাদের দিয়াছেন। তালিকাটি অবশ্য ১৩৬০ সালে তিনি প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রকাশের পরে উহার কোন পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ তালিকাটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করিয়া দিয়াছেন।

১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ **স্বামী সত্যব্রতানন্দ**

সম্পাদকের নিবেদন

'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'র দ্বিতীয় খণ্ডের দুটি পর্ব—তৃতীয় পর্ব ও চতুর্থ পর্ব। তৃতীয় পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী-পার্ষদ মনোমোহন মিত্রের, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিসেস সারা ওলি বুল, মিসেস বেটী লেগেট, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ও ভগিনী নিবেদিতার এবং স্বামী পরমানন্দের শিষ্যা ভগিনী দেবমাতার মাতৃস্মৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শেষোক্তটি ভিন্ন অপর স্মৃতিকথাগুলি প্রত্যক্ষভাবে স্মৃতিকথা হিসাবে লিখিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রকাশিত কথোপকথন, চিঠিপত্র এবং অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে সঙ্কলন ও অনুবাদ করে এগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পর্বের স্মৃতিকথাগুলির মধ্যে মনোমোহন মিত্রের স্মৃতিকথাটি ভিন্ন সবগুলিই ইংরেজীতে লেখা। সংশ্লিষ্ট রচনায় তার যথাযথ উৎস নির্দেশ করা হয়েছে। ভগিনী দেবমাতার স্মৃতিকথাটি তাঁর লেখা 'Days in an Indian Monastery' গ্রন্থের একটি অধ্যায়। অধ্যায়টির শিরোনাম—'A Woman Saint of India'।

গ্রন্থের চতুর্থ পর্বে একটি রচনা রয়েছে। রচনাটি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য আশুতোষ মিত্রের। একটি রচনা হিসেবে দেখানো হলেও আসলে তা তিনটি অধ্যায় বা পর্বের সমষ্টি। আশুতোষ মিত্রের মূল রচনাটি আজ থেকে ৫১ বছর আগে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে (১৩৫১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে) 'শ্রীমা' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গত ৫১ বছরে গ্রন্থটির কোন পুনর্মুদ্রণ হয়নি। আমরা রচনাটি প্রায় সম্পূর্ণতঃ বর্তমান খণ্ডে প্রকাশ করেছি। সামান্য দু-একটি অংশ সেখানে বাদ দেওয়া হয়েছে সেখানে '...' চিহ্ন দিয়ে নির্দেশিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যেক প্রখ্যাত জীবনীকার এই গ্রন্থটি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

বর্তমান গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশে শ্রীশ্রীমায়ের কিছু কথা (যা তাঁর নিজের মুখ থেকে শ্রীম-র স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবী শুনেছিলেন) প্রকাশিত

হয়েছে। শ্রীম নিকুঞ্জ দেবীর কাছে যা শুনেছিলেন তা ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন। অবশ্য শ্রীমায়ের কাছে শোনা নিকুঞ্জ দেবীর সব কথা শ্রীম-র ডায়েরীতে নেই। তাঁর দীর্ঘ মাতৃসান্নিধ্যে প্রাপ্ত 'কিছু কিছু' কথা যা শ্রীম তাঁর কাছে শুনেছিলেন সেগুলি শ্রীম তাঁর ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন। সেই অপ্রকাশিত ডায়েরী অবলম্বনে শ্রীম-র পৌত্র অনিল গুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের কথাগুলি দীর্ঘকাল আগে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশ করেন। সেই রচনাটিই পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত 'শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য-পরিচয়' অংশটি ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। যদিও দীর্ঘকাল (১৩৬০ বঙ্গাব্দ) আগে এটি তিনি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পরে তার কোন পুনর্মুদ্রণ হয়নি। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ তালিকাটি স্বয়ং সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবিত দুজন ত্যাগী-শিষ্যের অন্যতম এবং শ্রীশ্রীমায়ের সুপরিচিত জীবনীকার পঁচানব্বই বছর বয়সী ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজের অত্যন্ত নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতি এই দুষ্প্রাপ্য তালিকাটি ভক্তজনের কাছে পুনরায় তুলে দিতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। পূজ্যপাদ মহারাজের 'নিবেদন'টিও মূল্যবান উপাদান-সম্বলিত।

যেসমস্ত সূত্র থেকে এই খণ্ডের স্মৃতি-নিবন্ধগুলি সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয়েছে, সেগুলি যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেকটির সংশ্লিষ্ট প্রকাশকের কাছে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

পরিশেষে বলতে হয় তরুণ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্যের নীরব ও একনিষ্ঠ সেবার কথা। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা থেকে প্রকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রয়েছে। আর একজনের কথাও বলতে হবে। তিনি 'উদ্বোধন'-এর একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবী শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। শ্রীশ্রীমা তাঁদের উভয়ের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ করুন—এই প্রার্থনা।

১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ **স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ**

তৃতীয় পর্ব

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী

মনোমোহন মিত্র

কামারপুকুর ও জয়রামবাটী মহাতীর্থ। কামারপুকুর ও জয়রামবাটী-বাসীর দর্শনলাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

ঠাকুরের কাছে নিত্যজীব-টীব ছিল না। তিনি বুঝিতেন পতিত জীব, অজ্ঞান জীব, মায়ান্ধ জীব। যদি একবার তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিতেন যে, ইহারা ভগবানকে আশ্রয় করিতে চায়, তাহা হইলে তাঁহার কৃপার অফুরন্ত ভাণ্ডার আপনি উন্মুক্ত হইয়া যাইত। তিনি নিজে তাঁহাকে কৃপা করিতেন, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা তাঁহাকে পাওয়াইয়া দিতেন এবং আধার শুদ্ধ হইলে তাঁহার ইষ্টদর্শনও করাইয়া দিতেন। কতভাবে যে কৃপা দেখাইতেন তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

১৩০৮ সালে যোগোদ্যানে পাকা নাটমন্দিরটি নির্মিত হইলে উৎসবের সময় শ্রীশ্রীমাকে যোগোদ্যানে আনাইয়াছিলাম। সেইদিন শ্রীশ্রীমা নিজহাতে ঠাকুরের বেদির সম্মুখে বসিয়া পূজা করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের পূজা দেখিয়া অনুভব করিয়াছিলাম—শ্রীশ্রীমা কৈলাসের ভগবতীরূপে সাক্ষাৎ মহাদেবের পূজা করিতেছেন, আর আমরা ভাবে প্রেমে আত্মহারা হইয়া সেই পূজা দেখিতেছি। শ্রীশ্রীমায়ের নিবেদনকালীন আর্তির কথা কি আর বলিব! আমরা সকলে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিতে নবনির্মিত নাটমন্দিরটি পূত ও পবিত্র হইয়া গেল।

আরেকদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট বহুক্ষণ ছিলাম। তথা হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যাকালীন ধ্যানের সময় সহসা ধ্যানের মধ্যে মহালক্ষ্মীরূপে শ্রীশ্রীমাকে দেখিলাম। দেখিলাম, একখানি

রত্নসিংহাসনের উপর শ্রীশ্রীমা বসিয়া আছেন, মায়ের দুপাশে দুজন কিশোরী চামর দুলাইতেছে। সিংহাসনখানির তলদেশে দুইটি হস্তী শুঁড় উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। মায়ের মাথায় স্বর্ণখচিত মুকুট, দেহ নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত, পরনে একখানি বিদ্যুৎপ্রভা উজ্জ্বল শাড়ি। এক হাতে বর, আরেক হাতে আশীর্বাদ, অধরে হাস্যরেখা। যেখানে যেখানে মায়ের দৃষ্টি পড়িতেছে সেখানে স্তবকে স্তবকে পদ্ম ফুটিয়া উঠিতেছে। মা সেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। আমার হৃদয়টি যেন পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার পরের কথা আমার জানা নাই!*

---

* উদ্বোধন কার্যালয় থেকে ১৩১১ সালে প্রকাশিত 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট মনোমোহন মিত্র সম্পর্কে স্মৃতিকথা থেকে সংগৃহীত (দ্রঃ পৃঃ ২৫৭-২৫৮, ২৭২-২৭৩)। —সম্পাদক

সারদাদেবী ঃ আমাদের আধ্যাত্মিক জননী

সারা ওলি বুল

আমরাই প্রথম বিদেশী যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী সারদাদেবীকে দর্শন করার অনুমতি পেয়েছিলাম।[১] তিনি 'আমার মেয়েরা' বলে আমাদের গ্রহণ করেছিলেন। বলেছিলেন যে, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ। তিনি আমাদের একেবারেই অপরিচিতভাবে দেখেননি। গুরুর কাছে আনুগত্য বলতে কি বোঝায়, একথা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো—তাঁর ক্ষেত্রে আবার নিজ স্বামীই গুরু—তিনি জানালেন ঃ কাউকে গুরু নির্বাচন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সব কথা শুনতে বা মানতে হবে, কিন্তু ঐহিক বিষয়ে নিজের সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে কাজ করলেই—সে-কাজ যদি কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুর অননুমোদিত হয় তবুও—

---

১ শ্রীমাকে মিসেস ওলি বুল প্রথম দর্শন করেন ১৭ মার্চ ১৮৯৮। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড এবং ভগিনী নিবেদিতা (তখন মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কয়েকমাস পরে (নভেম্বর ১৮৯৮) নিবেদিতার বাগবাজারস্থ ১৬ বোসপাড়া লেনের বাড়িতে শ্রীমায়ের প্রথম আলোকচিত্র গৃহীত হয় এবং তার ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব নিয়েছিলেন মিসেস বুল। শ্রীমায়ের প্রতি তাঁর ছিল সমুচ্চ শ্রদ্ধা। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন প্রতিমাসে ষাট টাকা করে শ্রীমায়ের নামে তিনি পাঠাতেন। (দ্রঃ শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১০ম সং, ১৩৯৩, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, পৃঃ ৬৯)—অনুবাদক

গুরুকে শ্রেষ্ঠ সেবা করা হবে।[২]

স্বামীর সঙ্গে বাল্যেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। স্বামীকে যখন সানন্দে সন্ন্যাসীর জীবনযাপনে অনুমতি দিলেন, তখন স্বামীর গভীর বন্ধুতা পেলেন ও তাঁর শিষ্যারূপে গৃহীত হলেন। স্বামী তাঁকে দিন দিন শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুললেন। অপরপক্ষে পতি-সান্নিধ্যে অতিবাহিত বছরগুলিতে তিনি স্বামীর পরামর্শদাতা ছিলেন। [স্বামীর কাছে] তিনি নিরন্তর প্রার্থনা করেছেন, আমার বাসনাকে শুদ্ধ করে তোল, যাতে চিরদিন তোমার যোগ্য হতে পারি। দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্যের ব্রত তিনি নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন গর্ভধারিণী জননীর সাধারণ আনন্দ, কিন্তু হয়ে উঠেছেন বহু সন্তানের আধ্যাত্মিক জননী।[৩]

অনুবাদ ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু

---

২ শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী অভয়ানন্দের (ভরত মহারাজের) কাছে শুনেছি ঃ "শ্রীমা বলতেন, 'আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিশ্চয়ই গুরুবাক্য ও গুরুনির্দেশ শেষকথা, কিন্তু ঐহিক বিষয়ে সব দিক ভেবেচিন্তে যা হিতকর মনে করবে তা-ই করার সিদ্ধান্ত নেবে।' মায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই নির্দেশ বাস্তবিকই অতুলনীয়। এই শিক্ষা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি তিনি পেয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে।" এই প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের আরেকটি কথা মনে পড়ে। একজন ভক্তমহিলা 'গুরুনিন্দা' প্রসঙ্গে তাঁর কাছে একটি শ্লোক শুনেছিলেন। শ্লোকটি মহিলা পরে ভুলে গিয়েছিলেন, তবে ভাবটি ছিল এই—"উচিত কথা গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ হয় না।" (দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ৯ম সং, ১৩৭৬, পৃঃ ১৭)—সম্পাদক

৩ শ্রীনগর থেকে ম্যাক্সমুলারকে লেখা মিসেস ওলি বুলের ১১ জুলাই ১৮৯৮ তারিখের চিঠি। (দ্রঃ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, পৃঃ ১৭৬-১৭৭)
—অনুবাদক

সারদাদেবীর দিব্যসান্নিধ্যে

বেটী লেগেট

আমার কলকাতা-ত্যাগের[১] দুদিন আগে সারদাদেবী [বারাণসী থেকে] কলকাতায় এসেছিলেন। [বাগবাজারে] তাঁর ছোট বাড়িটিতে আমি তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম। তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থানের বিরাট এবং গভীর অভিজ্ঞতা আমার মতো আলবার্টারও[২] হয়েছিল। বহুক্ষণ তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। আমাদের [বেটীর সঙ্গে সিস্টার ক্রিস্টিনও

---

১ মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের দিদি স্বামী বিবেকানন্দের পরম অনুরাগিণী মিসেস বেটী লেগেট তাঁর কন্যা ও জামাতাকে নিয়ে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের শেষে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। শ্রীশ্রীমা কাশী থেকে কলকাতায় ফিরেছিলেন ১৬ জানুয়ারি ১৯১৩। সুতরাং মিসেস লেগেট ১৮ জানুয়ারি কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন। কথাগুলি জাহাজ থেকে ২০ জানুয়ারি ১৯১৩ বেটী লেগেট লিখেছিলেন—জাহাজ তখন রেঙ্গুনের কাছে।—অনুবাদক

২ আলবার্টা হলেন মিসেস বেটী লেগেটের প্রথম বিবাহের (তখন তিনি মিসেস স্টার্জিস) কন্যা। ব্রিটিশ রাজপরিবারে আলবার্টার বিবাহ হয়েছিল। নবম আর্ল অব স্যান্ডউইচ জর্জ মন্টেগু তাঁর স্বামী। মিসেস লেগেটের সঙ্গে নয়, শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে আলবার্টা এবং জর্জ মন্টেগু আলাদাভাবে গিয়েছিলেন। আলবার্টা এবং জর্জ মায়ের দর্শন লাভ করে অভিভূত হয়েছিলেন। মাসিমা মিস ম্যাকলাউডকে সেকথা আলবার্টা পরে চিঠিতে জানিয়েছিলেন। আলবার্টা তাঁর মাতৃদর্শনের বিবরণ-সহ যে-চিঠিটি মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন, সেই চিঠিটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি, তবে সেই চিঠির উত্তরে আলবার্টাকে লেখা মিস ম্যাকলাউডের চিঠিটির অংশবিশেষ প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার লিখিত 'Tantine : The Life of Josephine MacLeod—Friend of Swami Vivekananda' গ্রন্থে (Sri Sarada Math, Dakshineswar, Calcutta, 1st Edn., 1990, p. 147) পেয়েছি। গ্রন্থে চিঠিটির কোন তারিখ দেওয়া নেই। প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা মৌখিকভাবে জানিয়েছেন তারিখটি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩। চিঠিটি 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে (পৃঃ ৭৯৭) জর্জ মন্টেগুকে লেখা বলে উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে, চিঠিটির তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩।—অনুবাদক

ছিলেন।] কাছে তিনি ছিলেন খুব খোলামেলা। মাথায় কোন ঘোমটা ছিল না এবং হাতও ছিল অনাবৃত। আমার সামনে তিনি নিজেই [আমার বসার জন্য] মাদুর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। [এরপর বেটী লেগেট বর্ণনা করেছিলেন শ্রীমায়ের কাছে শোনা ডাকাত-বাবা ও ডাকাত-মার কাহিনী এবং ষোড়শীপূজার কথা।]

খুব শান্ত-গম্ভীর তিনি। স্বামীজীর [ঠাকুরের ?] প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর কথায়, তাঁর নানা ভঙ্গিতে তাঁর সেই শ্রদ্ধা প্রকাশিত হচ্ছিল।... শ্রীমায়ের একটি ফটো আমি নিয়েছি। যেমন তিনি নিজে সুন্দর, তেমনি তাঁর ফটোটিও চমৎকার। কয়েকবার তিনি আমার মুখটি তাঁর দুহাতে ধরে আদর করেছিলেন। প্রতিবারেই তাঁর গভীর স্নেহের স্পর্শে আমি অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। ক্রিস্টিন মাঝে মাঝে দু-একটি কথা বলছিল। তাঁর পূজার ঘর—যে-ঘরে তিনি বসেছিলেন—যখন ছেড়ে এলাম, আমাকে দেওয়া হলো তিনটি বিরাট ফুলের মালা। সেগুলি আমার ফ্রকের ওপর মোটামুটি রুচিসম্মতভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। দেখে তিনি খুব আনন্দ পাচ্ছিলেন। মালাগুলি তিনি স্পর্শ করলেন। তিনি হাসছিলেন শিশুর মতো। আমি তাঁর বাড়ির সব ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেখলাম সব জিনিসপত্র, দেববিগ্রহ, দেবতাদের পট। ভাবছিলাম আমাদের ম্যাডোনার (মেরীমাতার) সারল্য এবং অনাড়ম্বর জীবনের সঙ্গে শ্রীমায়ের সাদৃশ্যের কথা, যিনি নিশ্চয়ই তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে শ্রীমায়ের মতোই ছিলেন। সারা বাড়ি ঘুরে আমি যখন তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, দেখলাম তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন সিঁড়ির মুখে—জ্যোতির্ময়ী! তাঁর কাছে আমাকে টেনে নিয়ে আবার তিনি তাঁর দুহাতের মধ্যে আমার মুখটি ধরলেন। আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আনন্দে আবেগে আমার দুচোখ জলে ভরে গেল। আমার মনে হলো তাঁর চোখও শুকনো ছিল না, কিন্তু আমার চোখ জলে ভরে থাকায় তাঁর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না।...[৩]

অনুবাদ : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

---

৩ **মিস ম্যাকলাউডকে লেখা বেটী লেগেটের পত্র : ২০ জানুয়ারি ১৯১৩**
—অনুবাদক

পবিত্রতাস্বরূপিণী

জোসেফিন ম্যাকলাউড

পবিত্রতাস্বরূপিণী মা ! আমি তাঁকে দেখেছি ! আমি তাঁকে দেখেছি ![1] মহামূল্য মণিরত্নের আকর তিনি । আমরা সকলেই তা অনুভব করেছি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই অর্চনা করেছিলেন। [রামকৃষ্ণসঙ্ঘের] মূল কেন্দ্র তিনি; শান্ত, শক্তিময়ী, মানবিক ঐশ্বর্যে পূর্ণ এবং পরম অন্তর্দৃষ্টির অধিকারিণী ।[2] তিনি এই নতুন ধর্মসঙ্ঘের মহিমময়ী মেরীমাতা ।[3]

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬তম শ্লোকে আছে ঃ সকল ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করে আমার শরণ নাও । আমি তোমার সকল পাপ মোচন করব । শোক করো না । কথাগুলির আশ্চর্যজনক রূপায়ণের সংবাদ জেনেছিলাম, যখন মঠে গঙ্গার ঘাটে বসে থাকার সময় দুই তরুণ সন্ন্যাসী ফণী [পরবর্তী কালে স্বামী ওঙ্কারেশ্বরানন্দ] ও গোপাল-চৈতন্যের [রামময়, পরবর্তী কালে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দের] মুখে সারদাদেবীর কাহিনী শুনেছিলাম । সারদাদেবী দীক্ষা দেবার সময় ওদের কপালে ও মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে বলেছিলেন ঃ "তোমাদের পূর্বজন্ম ও এই জন্মের সমস্ত পাপের বিনাশ হোক ।" এর অর্থ, গুরু আক্ষরিকভাবে নিজের ওপর শিষ্যের সকল পাপভার তুলে নেন ।

---

১ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ৫০৩

২ বোনঝি আলবার্টাকে লেখা মিস ম্যাকলাউডের চিঠি । (দ্রঃ Tantine : The Life of Josephine MacLeod—Friend of Swami Vivekananda—Pravrajika Prabuddhaprana, p. 147) 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে (পৃঃ ৭৯৭) চিঠিটি আলবার্টার স্বামী জর্জ মন্টেগুকে লেখা বলে উল্লিখিত । চিঠিটির তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ ।—অনুবাদক

৩ আলবার্টাকে লেখা চিঠি ঃ ৫ অক্টোবর ১৯২৭ (ইংল্যান্ডের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের সৌজন্যে প্রাপ্ত ।)—অনুবাদক

এখানে সারদাদেবীই সেই গুরু। দেখা যাচ্ছে, হিন্দুধর্মের মধ্যেও অন্যের পাপগ্রহণের ভাব আছে। দেখেছিলাম, এই দুই তরুণ সন্ন্যাসীর মন, প্রাণ ও জীবন এখন এমনই ভাস্বর যে, তাদের সংস্পর্শে অন্যের মধ্যে সেই আনন্দ অনিবার্যভাবে সঞ্চারিত হয়। যতদূর মনে হয়, ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ফণী প্রথম মাতাদেবীকে দেখেছিল এবং তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছিল। ঐদিন দীক্ষা দেবার আগেই মায়ের খাবার বাড়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সরিয়ে রেখে তিনি ফণীকে নিয়ে একাকী ঠাকুরঘরে যান এবং সকলে অবাক হয়ে দেখে, দশ মিনিট ধরে দীক্ষানুষ্ঠান চলে। পরের সপ্তাহে ফণী স্বেচ্ছায় [প্রথম] মহাযুদ্ধের সৈন্যদলে যোগ দিয়ে অপর তিরিশ জন ছাত্র-সৈনিকের সঙ্গে করাচি যাত্রা করে। সেখান থেকে পারস্য। দীক্ষাগ্রহণের সময় ফণী সেনাবাহিনীতে যোগদানের কথা ভাবেইনি।

সকলেই অনুভব করেন, ঘটনাটি যে ঘটবে তা সারদাদেবী আগেই দেখতে পেয়েছিলেন [অর্থাৎ তিনি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না]। "তিনি জানতেন।" তাঁকে প্রথম দর্শনকালে গোপালচৈতন্যের বয়স ছিল চোদ্দ। জয়রামবাটী থেকে ছ-মাইল দূরে সে থাকত। পাছে তার বাড়ির লোকেরা সারদাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে, তাই সে অন্য গ্রামে তাঁর এক শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে (শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে বাড়ির লোকের আপত্তি ছিল না।) ঘুরপথে প্রতি সপ্তাহে মাতাঠাকুরানীর সঙ্গে দেখা করত। ফলে, বস্তুতপক্ষে প্রতিবার তাকে চোদ্দ মাইল হাঁটতে হতো। একদিন সবিস্ময়ে সে দেখে, তার বাবা তাকে বারো টাকা দিয়ে বলেন : "এটা রাখ, যেভাবে ইচ্ছে খরচ করতে পার।" (যদিও এর আগে সে কখনো তার মায়ের কাছ থেকে একটি-দুটি পয়সার বেশি পায়নি, আর বাবার কাছ থেকে কিছুই পায়নি।) ফলে সে তখন থেকে ঐ টাকাগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত সারদাদেবীর জন্য প্রতি সপ্তাহে ফল-মিষ্টি কিনতে চার আনা থেকে আট আনা খরচ করতে পেরেছিল। তারপর টাকা শেষ হয়ে গেলে তার যেতে সঙ্কোচ হতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যে সারদাদেবী গোপালের গ্রাম থেকে কিছু কিছু জিনিস কিনে আনার জন্য

প্রতি সপ্তাহে তাকে কিছু অর্থ দিতে লাগলেন। গোপালচৈতন্যের গ্রাম সারদাদেবীর গ্রামের চেয়ে বড়। এখন সে খুব খুশি, কারণ কিছু নিয়ে যেতে পারছে। মাঝে মাঝে কোন বিশেষ উৎসব বা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে সারদাদেবী তাকে সোমবার সকালের দিকে স্কুলে যাওয়ার পথে আটকে দিতেন, বলতেন ঃ "তোমার শিক্ষকেরা দেরি হওয়া নজরই করবেন না।" আর বাস্তবিকই তাই হতো।

সারদাদেবীর শিষ্যসংখ্যা হাজার হাজার [?], সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য মুষ্টিমেয় এবং স্বামীজীর কয়েকশো; কারণ সারদাদেবী স্বামীজীর পরে কুড়ি বছরেরও বেশি [বস্তুতপক্ষে আঠারো বছর] জীবিত ছিলেন। নিজের পরিবারে নিকট-লোকদের নিয়ে তিনি বেশ ঝঞ্ঝাটে ছিলেন। তাঁর ভাইঝি [রাধু] খুবই বিরক্তিকর স্বভাবের মেয়ে, সে তাঁর সঙ্গে একই বিছানায় শুতো, তাঁকে সারাক্ষণ অতিষ্ঠ করত। সারদাদেবী ভাইঝির বিয়ে দেন। স্বামী পরে তাকে পরিত্যাগ করে। শেষপর্যন্ত মেয়েটি অশক্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বালিকা (এখন মহিলা বলাই উচিত) বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ। যে মহীয়সী নারী জীবৎকালে আক্ষরিকভাবে পূজিতা হয়েছেন, ঘরসংসারে তাঁর যথার্থ সত্য-চিত্রটি যে কেমন ছিল তা জানতে আমার আনন্দ ও আগ্রহের শেষ নেই। এখন [জয়রামবাটীতে] তাঁর নামে একটি অতি সুন্দর মন্দির তৈরি হয়েছে; বেলুড়ে স্বামীজীর মন্দিরের চেয়ে অনেক বড় সেটি[৪] —তিনজন সাধু ও ব্রহ্মচারী তাঁর সেবায় আছেন। সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানে এখনো পর্যন্ত মন্দির হয়নি (তবে সেজন্য দান সংগ্রহ করা হয়েছে)। গোপাল বলল, সারদাদেবী তাকে নিখুঁত কাজ করার শিক্ষা দিয়েছেন; কাজ যেন এলোমেলো অগোছালো না হয়। একবার তিনি গোপালকে খেতে বসবার জন্য একসারিতে আটটি আসন পাততে বলেন; গোপাল তা করে। তিনি তাকে ঠিক করে পাততে বলেন। দ্বিতীয়বারেও যখন সোজা করে পাতা হলো না,

---

৪ বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্দিরের চেয়ে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির প্রস্থে বড়—একথাই মিস ম্যাকলাউড বলতে চেয়েছেন।—সম্পাদক

তখন তিনি নিজে ঠিক করে দিলেন। প্রতিটি পাতা যাতে খুব যত্নে ধোওয়া হয়, তারপর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে তা মোছা হয়, যাতে রুটি পাতায় না জড়িয়ে যায়—সেদিকে তাঁর নজর ছিল।

একদিন গোপাল ফুলবাগান কোপাতে ভুলে গিয়েছিল। এসে দেখে, সারদাদেবী নিজেই তা করছেন। যখন সে আপত্তি জানালো, তখন সারদাদেবী বললেন ঃ "আমার এই দুটি হাত সব কাজ করতে পারে।" এমন কোন কাজ ছিল না যা তিনি করতেন না বা করতে পারতেন না।[৫]

[২১ জুলাই ১৯২০[৬]] সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি নির্বাপিত হয়েছে—আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে রেখে গিয়েছে আগামী তিনহাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ। আমার কাছে তাঁর জীবন হলো অসীম উৎসাহের জীবন—যা আমাদের সবাইকে সেই শরণদায়ী সহানুভূতিভরা জীবনতলে একত্র করেছে, যা নতুন প্রয়োজনের অনুরূপ আত্মপ্রত্যয়-পূর্ণ ঋজু প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিত নতুন নতুন আদর্শের নজির সৃষ্টি করেছে! ওঃ, তাঁর জীবন অবলম্বনে আমরা প্রত্যেকেই কী দৃষ্টান্তই না দেখাতে পারি! তিনি আদর্শের নতুন নতুন নজির সৃষ্টি করে গেছেন—আমাদেরও অবশ্য তাই-ই করতে হবে—তাঁর নয়, আমাদের স্বকীয় [জীবনের নজির সৃষ্টি]! আর অন্য কোন উপায়ে জগতের সমস্যাগুলির সমাধান করা যাবে না।[৭]

অনুবাদ ঃ বিমলকুমার ঘোষ

---

৫ বোনঝি আলবার্টাকে ২ জুন ১৯২৬ তারিখে লেখা মিস ম্যাকলাউডের চিঠি। (দ্রঃ শতরূপে সারদা, পরিশিষ্ট) মূল চিঠিটি ইংল্যান্ডের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। চিঠিটির সম্বোধন-অংশটি পাওয়া যায়নি। চিঠিটি বেলুড় মঠের গেস্ট হাউস থেকে লেখা। চিঠিটি প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার লেখা মিস ম্যাকলাউডের জীবনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (পৃঃ ১৯১-১৯২)।—অনুবাদক

৬ ২০ জুলাই ১৯২০—৪ শ্রাবণ ১৩২৭, রাত্রি দেড়টায় শ্রীশ্রীমার দেহান্ত ঘটে। ইংরেজী মতে তারিখটি তাই ২১ জুলাই।—সম্পাদক

৭ স্বামী সারদানন্দকে লেখা মিস ম্যাকলাউডের ১৫ আগস্ট ১৯২০ তারিখের চিঠি। (দ্রঃ উদ্বোধন, ৭১তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃঃ ৩৪৪)—অনুবাদক

শ্রীশ্রীমা ঃ আমাদের চির-আশ্রয়
ভগিনী নিবেদিতা

১৭ মার্চ ১৮৯৮। সেন্ট প্যাট্রিকের জন্মদিন। আমার জীবনের 'day of days'—সেরা দিন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদাদেবীকে সেদিন আমরা [মিসেস সারা ওলি বুল, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড এবং ভগিনী নিবেদিতা—তখন মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল] প্রথম দর্শন করি। [শ্রীশ্রীমা মাত্র দু-চার দিন আগে জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় এসে তখন বাগবাজারে ১০/২ বোসপাড়া লেনের ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করছেন।]

পঞ্চাশ-পেরোননি[১] এমন হিন্দু বিধবার মতো তিনি সাদা কাপড় পরেন। পরার ধরন—কাপড় প্রথমতঃ কোমরে স্কার্টের আকারে জড়ানো, তারপরে শরীরের ওপর দিয়ে গিয়ে মাথা ঢেকে রাখে—অনেকটা খ্রীস্টান সন্ন্যাসিনীদের অবগুণ্ঠনের মতো। পুরুষমানুষ কথা বলতে এলে তাঁকে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়; তিনি সাদা কাপড়ের ঘোমটাকে সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে সামনে নামিয়ে দেন; সরাসরি কথা বলেন না; বেশি-বয়সী কোন মহিলাকে মৃদু স্বরে প্রায়-ফিসফিসিয়ে কিছু বলে দেন, সেই মহিলাটি তাঁর কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেন জোরে। এইজন্য মনে হয় আচার্যদেব [স্বামীজী] কখনো তাঁর মুখ দেখেননি।[২] এইসঙ্গে ভেবে নিতে হবে, সর্বদাই তিনি ছোট একটি চাটাই পেতে মেঝেয় বসে আছেন।

---

১ শ্রীমায়ের জন্ম ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৩। সুতরাং নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় মায়ের বয়স ছিল প্রায় ৪৫ বছর।—সম্পাদক

২ একই প্রসঙ্গে অন্যসময় নিবেদিতা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখেছেন ঃ "স্বামীজী কিংবা এমনকি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে তাঁর বিবাহের পরে, (বিবাহকালে বয়স মাত্র পাঁচ !) অবগুণ্ঠনহীন দেখেননি। পুরুষেরা তাঁকে পূজা করবার জন্য অন্তঃপুরের দরজা পর্যন্ত, কিংবা কখনো তার ভিতর পর্যন্ত এলেই অবিলম্বে তাঁর মুখের উপর লম্বা শাদা ঘোমটাটি নেমে আসে, যদিও কখনো কখনো

[পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে এবং সেকালের ব্রাহ্মণ পরিবারের পর্দাপ্রথা সম্পর্কে অনবহিত একালের এদেশের মানুষের কাছেও] সমস্ত ব্যাপারটা খুব বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হবে না; কিন্তু তাঁকে একটু ভালভাবে জানলেই দেখা যাবে, চূড়ান্ত তাঁর সহজ বুদ্ধি ও বাস্তববোধ, প্রতি ক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছু করবার আগে তাঁর পরামর্শ সর্বদা নিতেন। রামকৃষ্ণ-শিষ্যরা তাঁর উপদেশ সর্বদা মেনে চলেন।

প্রান্তে একটু ফাঁক থাকে, যাতে আড়চোখে দেখে নিতে পারেন। এই নিয়ে আমি এত মজা করেছি যে, পুরুষেরা বাইরে অপেক্ষা করার কালে সারাক্ষণ তিনি হেসে লুটোপুটি। কিন্তু কোন চাকর কিংবা সন্ন্যাসী যেমনি সিঁড়ির ওপরে উঠে এসে চেঁচিয়ে জানালেন—অমুকচন্দ্র অমুক শ্রীমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম জানাতে আসছেন—অমনি সমস্ত ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে ঘনীভূত, সমস্ত কথা স্তব্ধ, হাত-পাখার নাড়াচাড়াও বন্ধ, ঘোমটা মুখে নেমে আসে নিঃশব্দে, সারা শরীর কাপড়ে ঢেকে নেওয়া হয়, ঘরের মাঝখানে তিনি বসে থাকলে দরজার দিক থেকে মুখ সরিয়ে পাশ ফিরে বসেন—সবকিছু ঘটে যায় একেবারে নিঃশব্দে। তারপর আগন্তুক বাইরে এসে দাঁড়ান, চৌকাঠে মাথা ঠেকান, কিংবা ভিতরে এসে শ্রীমার চরণ স্পর্শ করে বলেন—তিনি এই-এই কাজ করতে যাচ্ছেন। মানুষটি হয়তো সদ্য কলকাতায় এসেছেন, মায়ের জন্য কিছু প্রণামী এনেছেন, কিংবা তিনি কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন, তাই মায়ের আশীর্বাদ চান। শ্রীমা তখন পার্শ্ববর্তিনীর কাছে অতি মৃদুস্বরে সস্নেহে মানুষটির সম্বন্ধে কুশলপ্রশ্নাদি করেন, সেগুলি উচ্চতর স্বরে তাঁকে শোনানো হয়। সবশেষে তিনি আবার প্রণত হন, শ্রীমা হাত জোড় করেন, যার দ্বারা বোঝা যায় তিনি আশীর্বাদ করলেন। তখন মানুষটি চলে যান। এতক্ষণে আবহাওয়ার ভার কমে। আগেকার ভাবভঙ্গি ফিরে আসে, কথা শুরু হয়, পাখা নড়তে থাকে, ঘোমটা খসে পড়ে।

"তাঁর মতো স্বামীকে পূজা করেছেন অথচ স্বামীকে মুখ দেখতে দেননি—এমন কাউকে ভাবা যায়? মুখ দেখতে দিলে স্বামীর মনে বা চিন্তায় তিনি কখনো কখনো উদিত হবেন—এই লোভ তো থাকতে পারত। না, অপরূপ তাঁর আত্মবিলয়—তিনি তাও চাননি। ভাবতেও শিহরিত হয়ে উঠি।" (দ্রঃ নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬৮, পৃঃ ১৮৩-১৮৪)

ঠাকুরকে মায়ের মুখ না-দেখানোর ব্যাপারটি অবশ্য সম্পূর্ণতঃ সত্য নয়। তবে দক্ষিণেশ্বরে আসার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত ঠাকুরের সামনে মা ঘোমটা খোলেননি। পরে কাশীর এক প্রাচীন মহিলা-ভক্ত জোর করে মায়ের সঙ্কোচ কাটিয়ে দেন। (দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সং, ১৩৮০, পৃঃ ১৩২ পাদটীকা। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ভগিনী দেবমাতার স্মৃতিকথাটিও দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৬২।)—সম্পাদক

সত্যিই অসীম মাধুর্যে ভরপুর তিনি। কী স্নিগ্ধ ভালবাসা তাঁর! অথচ বালিকার মতোই হাসি-খুশি। সেদিন যখন আমি জোর করে বললাম, স্বামীজীকে এখনি এখানে আমাদের মধ্যে আসতে হবে, নইলে আমরা চলে যাব—সেই শুনে তাঁর কী হাসি! স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের দেখা হতে দেরি হবে—এই খবর নিয়ে যে সন্ন্যাসীটি এসেছিলেন—তিনি আমাকে সত্যিই চলে যাবার জন্য জুতো পরতে উঠছি দেখে রীতিমত ভড়কে গেলেন, এবং দ্রুত স্বামীজীকে ডেকে আনতে ছুটলেন—তখন তাঁর উচ্ছ্বসিত হাসির কী রূপ! আর কী যে মিষ্টি তিনি! আমাকে বলেন, 'আমার খুকি'!

আচার-বিচারে বরাবরই ছিলেন খুবই রক্ষণশীল, অথচ সবকিছু সরিয়ে দিলেন যখন প্রথম দুটি [নিবেদিতা-সহ প্রকৃতপক্ষে তিনটি] বিদেশী মেয়ে—মিসেস সারা ওলি বুল ও মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড—তাঁর কাছে এলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি খেলেনও! আমরা যেতেই আমাদের ফল খেতে দেওয়া হলো; তাঁকেও দেওয়া হলো। সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই ফল তিনি একসঙ্গে গ্রহণ করলেন!! এর দ্বারা আমরা জাতে উঠলাম [অর্থাৎ নিবেদিতার মনে হলো, সারদাদেবীর সাদর অভ্যর্থনায় তাঁরা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।] এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হলো, যা অন্য কিছুতে হতে পারত না।[৩]

তাঁর যথার্থ মহিমার একটি সেরা প্রমাণ, কলকাতায় যখন তিনি থাকেন তখন সদাসর্বদা ১৪-১৫টি উচ্চবর্ণের হিন্দুমহিলা তাঁকে ঘিরে থাকেন, যাঁরা রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটি করে সকলকে অস্থির করে মারতেন, যদি-না তিনি তাঁর অপূর্ব বিচক্ষণতা এবং প্রফুল্লতার দ্বারা তাঁদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি রক্ষা করে চলতেন! তাই বলে সত্যিই আমি

---

৩ এই ঘটনায় উল্লসিত স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮, মার্চে গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয় ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন।... ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?" (পত্রাবলী, ৫ম সং. ১৯৮৭, পৃঃ ৬২৫)—সম্পাদক

ঐসব মহিলার স্বভাবের বিরুদ্ধে কোন কটাক্ষ করছি না, আমি নারীজাতির সাধারণ স্বভাব অনুমান করে এই কথা বলছি।

তাঁর সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের সম্ভ্রম বীরোচিত। তাঁকে সর্বদা 'মা' বলে ডাকা হয়। তাঁর বিষয়ে উল্লেখের সময় বলা হয় 'শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী'; যেকোন সঙ্কট বা সমস্যার সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করার কথা প্রথমেই মনে করা হয়; সব-সময়ে তাঁর সেবায় দু-একজন সন্ন্যাসী হাজির থাকেন; তাঁর যেকোন ইচ্ছাকে চূড়ান্ত আদেশতুল্য জ্ঞান করা হয়। সত্যি এ এক দর্শনীয় অপরূপ সম্পর্ক! একজন সন্ন্যাসী একদিন আমার হয়ে বাঙলা করে তাঁকে 'Magnificat' (যীশুজননী মেরীর গান) পড়ে শোনালেন। তিনি কী ভাবেই না তা উপভোগ করলেন! দেখবার মতোই সে-দৃশ্য। [আমার মনে হয়েছিল] অতি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে তিনি পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালটি আমার স্মৃতিপটে কয়েকটি ছবির মতো ভাসছে। মে মাসের প্রথম থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত কী অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়েই না আমরা [কখনো স্বামীজীর সঙ্গে, কখনো স্বামীজীর কোন গুরুভ্রাতার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারত] ভ্রমণ করেছিলাম! প্রথম থেকেই স্থির ছিল যে, যত শীঘ্র সম্ভব সুবিধামত, আমি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় শুরু করব। এই পরিকল্পনা কার্যকর করবার জন্য আমি নভেম্বরের (১৮৯৮) শুরুতে একলা কলকাতায় ফিরে এলাম।[৪] [হাওড়া] স্টেশন থেকে শহরের উত্তর প্রান্তে বাগবাজারে রাস্তা চিনে পৌঁছে যেতে আমার অসুবিধা হয়নি। সেখানকার মেয়েদের মধ্যে বাস করব, এরকম একটা নাছোড় জেদ ধরে বসলাম। ঘটনাক্রমে স্বামীজী তখন কলকাতায় সঙ্ঘের আস্তানা এক ভক্ত-গৃহে [বলরাম বসুর বাড়িতে] অবস্থান করছিলেন। তাঁরই মাধ্যমে আমার থাকার ব্যাপারে কথাবার্তা

৪ নিবেদিতা কলকাতায় ফিরেছিলেন ১ নভেম্বর ১৮৯৮। (দ্রঃ ভগিনী নিবেদিতা —প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ২য় সং, ১৯৬৩, পৃঃ ১২২)—সম্পাদক

হলো। মাতাঠাকুরানী সঙ্গিনীবৃন্দ-সহ কাছেই [১০/২ বোসপাড়া লেনে] বাস করছিলেন। সেইদিনই তাঁর বাড়িতে একটি ঘরে মা আমাকে থাকতে দিলেন।[৫]

জীবনের কোন কোন ঘটনার দিকে ফিরে তাকিয়ে আমরা অনুভব করি যে, ঐ সব ক্ষেত্রে আমাদের সাহস ঈশ্বরবিধানে আমাদের অজ্ঞতারই সৃষ্টি। নচেৎ সমস্যার প্রয়োজনীয় সমাধানই বা হতো কি করে! কিন্তু তবু—যদি আমি সত্যিই তখন অনুভব করতে পারতাম, আমার ঐ হঠকারিতার দ্বারা আমার নিরপরাধ আশ্রয়দাত্রী শুধু নন, তাঁর আত্মীয়গণও দূর গ্রামে কিরকম সামাজিক গণ্ডগোলের সম্মুখীন হবেন—তাহলে তখন যা করেছিলাম, কদাপি তা করতাম না।[৬] যেভাবেই হোক, সেক্ষেত্রে আমি আমার ঐ জেদ থেকে সরে আসতাম। কিন্তু তখন আমার ধারণা ছিল, জাতিভেদ নির্বোধ ব্যক্তিগত কুসংস্কার মাত্র—বিদেশীমাত্রই অনাচারী, এই ভ্রান্ত ধারণাই তার কারণ—প্রকৃত সত্য জানলে তা দূর হয়ে যায় এবং সেই কুসংস্কারকে বর্জন করার মানসিকতা ঐ ভারতীয় মহিলার রয়েছে—একথা ভেবে নিয়ে নিশ্চিত প্রত্যয়ে আমি স্বচ্ছন্দে তাঁর অতিথি হয়ে পড়লাম।

---

৫ ১০/২ বোসপাড়া লেনের যে-ভাড়া বাড়িতে শ্রীমা তখন বাস করছিলেন তার দোতলায় তিনি ও অন্যান্য মহিলারা থাকতেন। একতলায় প্রবেশপথের দুদিকে দুটি ঘর ছিল। একটি ঘরে শ্রীমায়ের সেবক, অসুস্থ স্বামী যোগানন্দ থাকতেন। অন্য ঘরটিতে নিবেদিতাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে তখনো নিবেদিতার বিশেষ পরিচয় হয়নি, তাছাড়া তাঁদের রক্ষণশীলতাও ছিল। তাছাড়া পৃথক ঘরে নবাগত নিবেদিতা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন। এসমস্ত ভেবেই শ্রীশ্রীমা প্রথমে তাঁর জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন।—সম্পাদক

৬ শ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়রামবাটী গ্রামে চূড়ান্ত সামাজিক রক্ষণশীলতার জন্য ব্যক্তিগত শত উদারতা সত্ত্বেও অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জয়রামবাটী যাওয়ার জন্য নিবেদিতার ইচ্ছায় শ্রীমাকে অসম্মতি জানাতে হয়েছিল। শ্রীমায়ের মা শ্যামাসুন্দরী দেবীও নিবেদিতাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, কিন্তু জয়রামবাটী যাওয়ার ব্যাপারে নিবেদিতার আগ্রহকে ঘোর অনিচ্ছায় তাঁকেও অসম্মতি জানাতে হয়েছিল। নিবেদিতা শ্যামাসুন্দরীকে বলেছিলেন ঃ "দিদিমা, তোমার দেশে যাব, তোমার

সৌভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রভাব সর্বজয়ী হলো। আমি [হিন্দু] সমাজে[৭] গৃহীত হলাম। আট-দশ দিনের মধ্যে খুব কাছেই একটি বাড়ি পাওয়া গেল [শ্রীমায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে ১৬ নং বোসপাড়া লেনে]। কিন্তু তাহলেও আমি প্রতি অপরাহ্ণ শ্রীমায়ের ঘরেই কাটাতাম। তারপর গ্রীষ্ম এলে তাঁর সুস্পষ্ট আদেশে তাঁর বাড়িতেই বিশ্রামের জন্য আসতাম। সেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা ছিল। আলাদা কোন ঘরে নয়, সকলের সঙ্গেই এক ঘরে শুতাম। সাদা সিধে ঘরটি ছিল ঠাণ্ডা। লাল রঙের মেঝের ওপর সার সার মাদুর ও বালিশ পাতা, এবং মশারি টাঙানো।

রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করব।" শ্যামাসুন্দরী তাতে বলেছিলেন ঃ "না, দিদি, উ কথাটি বলোনি। তুমি আমার হেঁশেলে ঢুকলে দেশের লোক আমাদের ঠেকো (একঘরে) করবে।" (দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৮৪, পৃঃ ৩০২) অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজের অনুশাসনকে যে তাঁরা মেনেছিলেন তা শুধু সামাজিক বয়কটের আশঙ্কাতে নয়, তাঁদের একান্ত স্নেহের নিবেদিতার অসম্মান ও লাঞ্ছনার আশঙ্কাতেও। জয়রামবাটীতে নিবেদিতাকে নিয়ে যেতে সাহস না পেলেও জয়রামবাটীতে শ্রীমা গ্রামীণ রক্ষণশীলতাকে বার বার ভেঙেছেন। আমজাদের ঘটনা তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এছাড়া আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। সেসবের জন্য সমাজপতিদের চাপানো অর্থদণ্ড বা জরিমানাও বহুবার তাঁকে দিতে হয়েছে। জয়রামবাটীতে নিবেদিতাকে নিয়ে গেলে হয়তো সামাজিক রক্ষণশীলতায় যে-তরঙ্গ উঠত তাতে শ্রীমায়ের নিজের লাঞ্ছনার চেয়ে নিবেদিতারই হতো বেশি। মনে হয় সেজন্যই শ্রীমা প্রতিনিবৃত্ত হয়েছিলেন। তবে কলকাতায় তিনি ছিলেন আপোষহীন। একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন স্বামী অসিতানন্দ ঃ "একবার নিবেদিতা ভোগ রেঁধে ঠাকুরকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীমাকে খেতে দেন। শ্রীমা পরম আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। এর ফলে গোঁড়া মেয়েমহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায় এবং তাঁরা শ্রীমার কাজের কঠোর নিন্দা করেন। বিরক্ত ও ব্যস্ত হয়ে শ্রীমা বলেন ঃ 'নিবেদিতা আমার মেয়ে; ঠাকুরকে ভোগ রেঁধে নিবেদন করার অধিকার তার আছে; তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে, কোন দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি কারো তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক'।" (নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০১)—সম্পাদক।

৭ প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন ঃ "অবশ্য 'হিন্দু সমাজ' ব্যাপকার্থে নহে। শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তসমাজ, সেই সমাজে নিবেদিতার স্থান হইয়াছিল। পরবর্তী কালে উদার ও শিক্ষিত হিন্দুগণেরও তিনি শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। আহারাদি ব্যাপারে তখনকার সমাজ, বিশেষ করিয়া নারীগণ নিশ্চিতই

অদ্ভুত এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলাম। নিচের তলায় সদর দরজার পাশের ঘরে এক সন্ন্যাসী [স্বামী যোগানন্দ] থাকতেন। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে কঠোর তপশ্চর্যার ফলে জীবনের মধ্যক্ষণে তিনি তখন ক্ষয়রোগে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত। বাঙলা শেখার জন্য আমি তাঁর ঘরে যেতাম। পিছনের রান্নাঘরে তাঁর এক শিষ্য এবং একজন ব্রাহ্মণ পাচক কাজকর্ম করতেন। ছাদ ও বারান্দা-সমেত সমস্ত ওপরতলাটা আমাদের—মেয়েদের জন্য ছিল নির্দিষ্ট। অদূরেই গঙ্গা—ওপরতলা থেকে গঙ্গাদর্শন হতো।

আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটির কর্ত্রী ছিলেন শ্রীশ্রীমা। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তাঁর জীবনের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। পাঁচ বছর বয়সে পরিণয়, আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে স্বামীর

অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, এবং কোন বিদেশীর স্পর্শ সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতেন। কিন্তু নিবেদিতা তাঁহার পরিচিত কাহার না প্রিয় ছিলেন? বাগবাজার পল্লীর ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষীয়সী মহিলা পর্যন্ত প্রতি গৃহের অধিবাসীদের মধ্যে কে না তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন? একথা সত্য, তাঁহারা স্বয়ং অগ্রসর হইয়া নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করেন নাই। নিবেদিতা নিজেই একান্ত আপনার জন জ্ঞানে তাঁহাদের নিকট গিয়াছেন; তাঁহারাও তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই, অন্তরেই স্থান দিয়াছেন। নিবেদিতা তাঁহাদের পরমাত্মীয়া ছিলেন। আজ আহার এবং স্পর্শ-ব্যাপারে বিশেষতঃ কলিকাতার হিন্দুসমাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। কোন বিদেশী হয়তো আজ শিক্ষিত হিন্দু সমাজ বা পরিবারে অপাঙ্‌ক্তেয় নহে, কিন্তু নিবেদিতার ন্যায় তিনি হৃদয়ের সেই গভীর প্রীতি কি লাভ করিতে পারিবেন? অবশ্য যে বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান লইয়া হিন্দু সমাজ গঠিত তাহার সেই দৈনন্দিন জীবনে নিবেদিতা হয়তো এক হইয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু সামাজিক মানুষগুলির সহিত তাঁহার ঐক্য ঘটিয়াছিল।" (ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ১২৩-১২৪)

প্রসঙ্গতঃ, নিবেদিতাকে পল্লীর হিন্দুনারীরা খুব ভালবাসলেও রক্ষণশীল প্রবীণাদের কেউ কেউ দীর্ঘকালের সঙ্কীর্ণতা ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। নিবেদিতার প্রথম দিকের ছাত্রী পঙ্কজিনী মুখোপাধ্যায়ের (বিয়ের পর বন্দোপাধ্যায়) বাড়ি ছিল ৩৩ নং বোসপাড়া লেনে। পঙ্কজিনী পরবর্তী কালে বলেছিলেন, একদিন তাঁর মা নিবেদিতার বিশেষ আগ্রহে তাঁকে বাঙালী মেয়েদের মতো শাড়ি পরিয়ে দেন। আরেক দিন তাঁকে বাড়িতে ভাজা মাছের কাঁটা বেছে খেতে সাহায্য করেন। এ-দুটি কাজ করতে গিয়ে 'মেমসাহেব'কে ছুঁয়েছিলেন বলে পঙ্কজিনীর ঠাকুমা ও বিধবা পিসীমা পঙ্কজিনীর মাকে গঙ্গাস্নানে বাধ্য করেছিলেন। (দ্রঃ 'উদ্বোধন' ৯৫তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা—কার্তিক, ১৪০০, পৃঃ ৫৫০)—সম্পাদক

বিস্মরণ। তারপর মায়ের অনুমতি নিয়ে গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্বামী-সমীপে তাঁর গমন, বিবাহবন্ধনের কথা স্বামীর স্মরণে আসা, কিন্তু যে-জীবন বরণ করেছেন তারই আদর্শের কথা পত্নীকে শোনানো। পত্নীরও প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর ঐ জীবনপথের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনা করে, তাঁকে গুরুরূপে বরণ করে, কেবল শিষ্যার মতো শিক্ষা-প্রার্থনা। এসমস্তই বহুশ্রুত। তারপর থেকে, তিনি বহুবছর পরম আনুগত্যের সঙ্গে মন্দির-উদ্যানেরই একটি ঘরে স্বামীর কাছে বাস করেছেন। একইসঙ্গে সহধর্মিণী ও সন্ন্যাসিনী এবং স্বামীর শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শিক্ষা-সূচনাকালে তাঁর বয়স ছিল অল্প। সেবিষয়ে শান্তভাবে পরে কথাপ্রসঙ্গে কখনো কখনো বলতেন, কতদিকে তাঁর (স্বামীর) শিক্ষা প্রসারিত ছিল; শ্রীরামকৃষ্ণ নিখুঁতভাবে সব কাজ করা পছন্দ করতেন; প্রদীপের সরঞ্জাম পর্যন্ত দিনের বেলায় কোথায় গুছিয়ে রাখতে হয় তাও শিক্ষা দিতেন। দুখ-চেটে ভাব ঠাকুর সহ্য করতে পারতেন না। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা সত্ত্বেও তিনি জীবনের লাবণ্য ও সৌন্দর্য ভালবাসতেন, আচরণে শান্ত-গাম্ভীর্য পছন্দ করতেন। এইসময়ের একটি কাহিনী : পত্নী একদিন উৎফুল্ল শিশুর মতো গর্বভরে স্বামীর কাছে এক ঝুড়ি ফল ও শাকসব্জী এনে হাজির করেন; তাতে স্বামী গম্ভীর হয়ে বলেন, "কিন্তু এত বাড়াবাড়ি খরচ কেন ?" অপ্রত্যাশিত আঘাতে তরুণী পত্নীর সমস্ত উৎফুল্লতা মুহূর্তে লুপ্ত হলো। "অন্ততঃ আমার জন্য এসব নয়", বলে নীরব অশ্রুতে নয়নভরে তিনি চলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অস্থির হয়ে পড়লেন। কাছের ছেলেদের ডেকে বললেন ব্যাকুলভাবে, "ওরে তোদের কেউ গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আন। ওকে কাঁদতে দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তিও উড়ে যাবে!"

শ্রীমা এমনই প্রিয় ছিলেন ঠাকুরের কাছে! অথচ মায়ের চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, আরাধ্য স্বামীর বিষয়ে কথা বলবার সময়ে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের আভাস কখনো ফোটে না। স্বামীর প্রতিটি কথাকে সফল করার জন্য তিনি সর্বাবস্থায়, বিপদে বা সম্পদে

সুমেরুবৎ অটল। স্বামীকে 'গুরুদেব' বা 'ঠাকুর' বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর কাছে যাঁরা থাকেন তাঁরাই বলেছেন, তাঁর কথায় এমন একটি শব্দও কদাপি থাকে না যাতে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কসূচক কোন স্বাধিকার প্রকাশ পায়। তাঁর পরিচয় জানে না এমন কারো পক্ষে তাঁর কথাবার্তা থেকে কোনভাবে অনুমান করা সম্ভব নয় যে, চারপাশের অন্য যে-কারো থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর তাঁর দাবি অধিকতর বা তাঁর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর! শিষ্যার মধ্যে পত্নী হারিয়ে গেছেন বহুকাল আগে, যদিও পত্নীর পরম নিষ্ঠাটুকু রয়ে গেছে। তথাপি তাঁর প্রতি সকলের ভক্তির সীমা নেই, প্রতি ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তাঁর সঙ্গে ট্রেন-ভ্রমণকালে কেউ তাঁর বেঞ্চের ওপরের বার্থে উঠবার কথা ভাবতেই পারে না। তাঁর উপস্থিতিই সকলের কাছে একটি পরম পবিত্র ব্যাপার।

আমার সবসময় মনে হয়েছে, তিনি ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম বাণী। কিন্তু তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা নতুন আদর্শের অগ্রদূত? প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের সমন্বয় অতীব সহজ সরল নারীর জীবনেও কিভাবে করা সম্ভবপর, তাঁকে দেখলে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার কাছে তাঁর অধ্যাত্মমহিমার মতোই অপূর্ব মনে হয়েছে তাঁর সম্ভ্রান্ত সৌজন্যের সৌন্দর্য, তাঁর প্রশস্ত মুক্ত মনের মহিমা। যত নতুন বা জটিল সমস্যাই তাঁর কাছে উপস্থিত করা হোক না কেন, আমি কখনো তাঁকে উদার ও মহৎ সিদ্ধান্ত-জ্ঞাপনে দ্বিধান্বিত দেখিনি। তাঁর সমগ্র জীবন একটি নিরবচ্ছিন্ন নীরব প্রার্থনার মতো। ব্রহ্মণ্য-শাসিত সমাজের মধ্যে তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হলেও তিনি প্রতি ক্ষেত্রে নিজেকে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঊর্ধ্বে উন্নীত করেন। কেউ যদি অপকৃষ্ট আচরণে তাঁকে আঘাত করে—তখন অদ্ভুতরকমের শান্ত স্থৈর্য ও প্রগাঢ় স্তব্ধতা নেমে আসে—আর তা-ই তাঁর প্রতিক্রিয়ার একমাত্র লক্ষণ। যদি কেউ তার বহির্বর্তী সামাজিক সমস্যা বা পীড়ন-যন্ত্রণার কথা জানায়, তিনি তৎক্ষণাৎ অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টিতে ঘটনার মর্মে প্রবেশ

করে সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে সমাধানের পথ দেখিয়ে দেন। আর যখন কঠোরতার প্রয়োজন ? সেক্ষেত্রে কোনরকম বুদ্ধিহীন ভাবালুতায় বিচলিত হন না। যে-ব্রহ্মচারীকে [কোন গর্হিত কর্ম বা আচরণের জন্য] আগামী কয়েক বছরের জন্য মাধুকরী ভিক্ষা করে খাওয়ার শাস্তি দিয়েছেন, তাকে তদ্দণ্ডেই স্থানত্যাগ করে চলে যেতে হবে।—তাঁর আদেশ! যদি কেউ আচারে-আচরণে শ্লীলতা ও মর্যাদার সীমা লঙ্ঘন করে, সে কখনোই তাঁর সাক্ষাতে আসার অনুমতি পাবে না। এই ধরনের দোষী এক ব্যক্তিকে একদা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "দেখছ না, ওর ভিতরের নারীমহিমাকে আঘাত করেছ তুমি—সর্বনাশ!"

কিন্তু তবু তিনি "সুরে সঙ্গীতে নিত্যপূর্ণ"—তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার আক্ষরিক পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর অধ্যাত্মসন্তানদের একজন বলেছিলেন—"আর পূর্ণ মধুরিমায়, রঙ্গে, লীলায়।" আর, একইসঙ্গে তাঁর পূজার কক্ষটি ভরে থাকে পরম স্নিগ্ধতায়।

মাতাদেবী পড়তে পারেন। রামায়ণ পাঠে তাঁর অনেক সময় কাটে। কিন্তু লিখতে পারেন না। তবু মনে করার কারণ নেই তিনি অশিক্ষিতা নারী। সাংসারিক অথবা ধর্মীয় প্রশাসন পরিচালনার দীর্ঘ কঠিন অভিজ্ঞতাই শুধু তাঁর নেই, অধিকন্তু ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ও প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি দর্শনের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে মানবের পক্ষে সর্বোচ্চ-সম্ভব আত্মবিকাশের সৌভাগ্য তিনি পেয়েছেন। বিরাটের সঙ্গী ও সাক্ষী হবার যোগ্য মহিমাকে তিনি প্রতি মুহূর্তেই অসচেতনে বহন করেন। কিন্তু সেই গরিমা সর্বাধিক বাঙ্ময় হয়ে ওঠে যখন তিনি মুহূর্তমধ্যে কোন নতুন ধর্মচেতনা বা ভাবের মর্মভেদ অব্যর্থভাবে করে ফেলেন।

মাতাঠাকুরানীর এই ক্ষমতার পরিচয় প্রথম ভালভাবে উপলব্ধি করি কিছুদিন আগে এক ইস্টার-দিবসে যখন তিনি আমাদের আবাসে এসে দর্শন দেন। এর আগে তাঁর সঙ্গ করার সময়ে তাঁর ভাবধারা অনুধাবনে আমি এত বেশি মগ্ন থাকতাম যে, বিপরীত ভূমিকায় তাঁকে লক্ষ্য করার কথা মনেই হয়নি। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে শ্রীমা ও তাঁর

সঙ্গিনীরা সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখার পরে, প্রার্থনাকক্ষে বসে খ্রীস্টীয় ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য শুনবার ইচ্ছা-প্রকাশ করলেন। তখন আমাদের ছোট ফরাসী অর্গানযোগে ইস্টারের গীতবাদ্য করা হলো। খ্রীস্টের পুনরুত্থান-স্তোত্র শ্রীমার কাছে অপরিচিত ও বিদেশীয় হলেও যে-রকম দ্রুত তার মর্মানুভব করে সুগভীর ভাবাত্মীয়তা প্রকাশ করলেন, তাতেই আমাদের কাছে সর্বপ্রথম অসন্দিগ্ধভাবে উন্মোচিত হলো—সারদাদেবীর বিরাট ধর্ম-সংস্কৃতির এক অনন্য দিক। এই একই ক্ষমতা শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শপূত শ্রীমার সঙ্গিনীদের মধ্যে অল্পাধিক দেখা যায়। কিন্তু সারদাদেবীর মধ্যে তার প্রত্যয় ও শক্তি অসীম—সে এক সমুচ্চ শিক্ষার অভ্রান্ত ফলশ্রুতি।

একই গুণের বিকাশ লক্ষ্য করেছিলাম অন্য এক সন্ধ্যাকালে, যখন নিজ ক্ষুদ্র মণ্ডলীর মধ্যে আসীন মাতাঠাকুরানী আমাকে ও আমার গুরু ভগিনীকে ইউরোপীয় বিবাহ-পদ্ধতি বর্ণনা করতে বললেন। প্রচুর হাসিখুশির মধ্যে আমরা কখনো 'খ্রীস্টান পুরোহিত', কখনো বর বা কনে সেজে তাঁর আদেশ পালন করলাম। কিন্তু বিবাহ-প্রতিজ্ঞাটি শুনে তাঁর মনে যে-ভাবোদয় হলো, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। "সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, শক্তিতে-অশক্তিতে যাবৎ মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে"—কথাগুলি শোনামাত্র সকলেই "আহা-হা !" করে উঠলেন আনন্দে। কিন্তু শ্রীমার পরিতৃপ্তিই সর্বাধিক। বারবার কথাগুলি তাঁর নির্দেশে তাঁকে শোনাতে হলো। বারবার তিনি বললেন, "আহা ! কী অপূর্ব ধর্মকথা ! কী অপূর্ব ধর্মকথা।"

শ্রীমায়ের আবাসে দিনগুলি শান্তি ও মাধুর্যে ভরা। প্রত্যুষের অনেক আগেই সকলে একে-একে নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করেন; বিছানার মাদুরের ওপর থেকে চাদর ও বালিশ সরিয়ে, তার ওপর স্থির হয়ে বসেন, মুখ ঘোরানো থাকে দেওয়ালের দিকে, হাতে-হাতে ঘুরতে থাকে জপের মালা। তারপরে ঘর পরিষ্কারের ও স্নানাদির সময় আসে। পর্বের দিনে শ্রীমা এক সঙ্গিনীর সঙ্গে পালকিতে গঙ্গাস্নানে

যান। তার পূর্ব পর্যন্ত রামায়ণ পড়েন। তারপরে নিজের ঘরে মা পূজায় বসেন। অল্পবয়সীরা প্রদীপ জ্বালায়, ধূপ-ধুনা দেয়; গঙ্গাজল, ফুল ও পূজার যোগাড় করে। এই সময়ে এমন-কি গোপালের মাও এসে নৈবেদ্য তৈরিতে সাহায্য করেন। তারপর দুপুরের আহার ও বিকালের বিশ্রাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ঝি লণ্ঠন জ্বালিয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের কথালাপের মধ্যে; সকলে উঠে পড়ে; পট বা বিগ্রহের সামনে আমরা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করি; গোপালের মা ও শ্রীমায়ের পদধূলি নিই; কিংবা বাধ্য মেয়ের মতো মায়ের সঙ্গে ছাদে উঠি অথবা যেখানে তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া হয়েছে, সেখানে গিয়ে বসি। বহু ভাগ্য তার, যে মায়ের পাশে তাঁর সান্ধ্য ধ্যানের সময়ে বসবার অনুমতি পায়—মায়ের সব পূজার শুরু ও শেষ যে গুরু-প্রণামে—সেই প্রণাম করতে সে শেখে—স্বয়ং মায়ের কাছ থেকে।

চারদিকে যখন ঘণ্টা বাজে, সুর ভেসে আসে, তারারা ফুটে ওঠে আকাশ-অঙ্গনে, সেই সন্ধ্যারতির কালকে আমি বলি শান্তিলগ্ন। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে। অন্তঃপুরের নারীরা প্রণত হয় বিগ্রহের সামনে। এই সময়ের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব থেকেই মাতাদেবীর গৃহে, ঠিকভাবে বলতে গেলে আশ্রমে, মহিলাদের অনেকে নিঃশব্দে জপমালা ঘুরিয়ে চলেন। আকাশ, বাতাস তখন পূজায় পূজায় পূর্ণ। চিন্তাতেও অসীম শান্তি! সন্ধ্যা, তারার আলো, চাঁদের উদয়, আর প্রার্থনার সুর—সব কিছুই যেন আমাদের শ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মতো। প্রদোষের সঘন মধুরিমার মতোই তাঁর সঙ্গ—বিশেষতঃ যখন তিনি পূজার আসনে। আহা অপরূপ! অপরূপ! শ্রীমা যখন পূজা করতে বসেন, কী সুন্দর দেখায় তাঁকে! সেই মুহূর্তে আমি তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি!

অনুভূতিতে শ্রীমা অনবদ্য। তাঁর যে ফটো[৮] তোলা হয়েছিল তার অর্থ, তিনি জীবনে প্রথম নিজ পরিবারের বাইরে কোন প্রাপ্তবয়স্ক

৮ শ্রীমায়ের প্রথম ফটো তোলার ব্যাপারে নিবেদিতার বিশেষ ভূমিকা ছিল।

পুরুষের [ক্যামেরাম্যান হ্যারিংটনের] দিকে সরাসরি তাকালেন, বা তেমন কেউ তাঁর মুখ দেখলেন। তাই বলে এর জন্য কোন আত্মসচেতনতা তাঁর ছিল না—একবিন্দুও নয়।

শ্রীমা [আমাকে] বলেছিলেন, স্বামীজী সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করতে ভালবাসি, শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক সেই কথাই স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁকে বলেছিলেন ঃ স্বামীজী জাতীয় দেবতার [শিবের] সাক্ষাৎ অবতার; আর তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] কালীর অবতার।

মাতাদেবীর মতো ভালবাসায় ভরা মুখ আমি কোথাও দেখিনি। গাঁয়ে থাকলে তিনি রোগা আর কালো হয়ে যান। [রোগে ভুগে] শরীর যেন একেবারে ক্ষয়ে যায়। কলকাতায় ফিরে এলে দেখি মানুষটি কিন্তু একই আছেন—পূর্বের মতোই সেই স্বচ্ছবুদ্ধি, উন্নত মর্যাদা, নারীত্বের মহিমা—অবিকল। তাঁকে কত রকমের আরামে রাখতে যে আমার সাধ হয়! একটি নরম বালিশ, জিনিস রাখার একটি তাক, একটি কম্বল, আরও কত কি দরকার! মাতাদেবী তাঁর একটি

তাঁর যে আলোকচিত্রটি সর্বাধিক পরিচিত, সেটি তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন নিবেদিতা এবং মিসেস ওলি বুল। ১৬ নং বোসপাড়া লেনে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে নিবেদিতার আবাসে মায়ের প্রথম তিনটি আলোকচিত্র গৃহীত হয়। মাকে অনেক বুঝিয়ে, আবদার-অনুনয় করে তাঁকে ইংরেজ ফটোগ্রাফার হ্যারিংটনের সামনে বসাতে রাজি করেন মিসেস বুল এবং নিবেদিতা। মায়ের কাপড় ঠিকমতো গুছিয়ে দেন নিবেদিতা। ফটো তুলতে রাজি না থাকার কারণ তাঁর অত্যধিক লজ্জাশীলতা। তাছাড়া স্বামী যোগানন্দের গুরুতর অসুস্থতার জন্য মায়ের তখন প্রচণ্ড মানসিক উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা। প্রথম ছবিটিতে তাঁর নতদৃষ্টি। তিনি কিছুতেই ক্যামেরার দিকে তাকাবেন না, সেই অবস্থায় তোলা হয় সেটি। এই ছবিতে তাঁর দক্ষিণ পদাঙ্গুলি কাপড়ে ঢাকা ছিল; দ্বিতীয় ছবিতে পদাঙ্গুলি কিছুটা দেখা যায়। সেটির জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য মিসেস বুলের। তাঁর অনুরোধেই মা দ্বিতীয় ফটোটি (বর্তমানে সর্বাধিক পরিচিত ও সর্বত্র পূজিত ফটো) তুলতে রাজি হন। তৃতীয় ফটোটি ওঠে শ্রীমা ও নিবেদিতাকে নিয়ে।—সম্পাদক

সদ্য-দর্শনের কথা [আমাকে] বলেছিলেন ঃ তিনি আমাকে গেরুয়া বস্ত্রে দেখেছেন।[৯]

শ্রীমা যেন পূর্ণ বিশ্বাসের দর্পণ। যদি কাউকে একবার ভালবেসেছেন, সে ভালবাসা চিরদিনের জন্য—এই তাঁর জীবন-সত্য। [স্বামী] যোগানন্দের মৃত্যু[১০] শ্রীমায়ের কাছে দারুণ বেজেছিল। যখন দাহ করার জন্য তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন ওপরতলা দীর্ঘ ক্রন্দনে আকুল হয়ে উঠল—নিচে পূজার শব্দের সঙ্গে মিশে তা ছড়িয়ে পড়ল। পুরবাসিনীরা বুঝেছিলেন—এতদিন যাঁর ওপর এই গৃহের ভার ছিল, তিনি চিরতরে চলে যাচ্ছেন। যোগীন-মার তুষারশীতল স্তব্ধতা টুটে গেল। মনে হলো, তাঁর ও মায়ের বুক বুঝি ফেটে গেল। [এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত] মৃত্যু কথাটি শ্রীমা যেন সইতে পারছিলেন না—এমনই মানবিক বেদনা।—"জানি জানি, সে আমার প্রভুর কাছে গেছে—সে কথা আমি জানি—কিন্তু সে যে আ-মা-র যোগীন—প্রভু তাকে কেড়ে নিলেন!"

সদানন্দের মুখে একটি মুমূর্ষু বালকের কথা শুনেছিলাম। মা তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। "তাহলে কি আমার মৃত্যু নিকটে?" ছেলেটি বলেছিল। "মায়ের আদেশ"—এই বলে

---

৯ শ্রীমায়ের এই 'দর্শন'-এর অর্থ—নিবেদিতার অন্তঃসন্ন্যাস। স্বামীজী নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি তাই শ্বেতবসন পরতেন। (শ্রীমায়ের স্নেহভাজন স্বামী অভয়ানন্দের (ভরত মহারাজের) কাছে শুনেছি, নিবেদিতা মাথায় একটি গেরুয়া রুমাল জড়িয়ে রাখতেন কখনো কখনো।) নিবেদিতার আগ্রহ ও প্রার্থনা সত্ত্বেও তাঁকে বাহ্যিক সন্ন্যাস না দেওয়ার কারণ স্বামীজী সম্ভবতঃ তাঁর আর্ষদৃষ্টিতে দেখেছিলেন নিবেদিতা পরবর্তী সময়ে স্বামীজী-নির্দেশিত সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের নিয়মের বাইরে রাজনৈতিক কর্মে যুক্ত হবেন। কিন্তু স্বামীজী জানতেন, নিবেদিতা "মৃত্যু পর্যন্ত" রক্ষা করবেন সন্ন্যাসের আসল ব্রত—ব্রহ্মচর্য। স্বামীজী তাঁকে তাই অন্তঃসন্ন্যাসই দিয়েছিলেন। নিবেদিতা সম্বন্ধে শ্রীমায়ের 'দর্শন'-এর তাৎপর্য সম্ভবতঃ তাই-ই।—সম্পাদক

১০ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী পার্ষদ, শ্রীমায়ের প্রথম মন্ত্রশিষ্য ও সেবক স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগ হয় ২৮ মার্চ ১৮৯৯ (১৫ চৈত্র ১৩০৬) ১০/২ বোসপাড়া লেনের শ্রীমায়ের তৎকালীন আবাসে।—সম্পাদক

ওঁরা কথা এড়িয়ে গেলেন। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ বলল—"নিশ্চয়ই। মাকে আমার প্রণাম। তাঁর কথা তো শুনতেই হবে। আপনারা আমাকে নিয়ে চলুন।" তখন ওঁরা শয্যাশুদ্ধ তাকে বাইরে আনলেন। মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নতনেত্রে চেয়ে রইলেন। [স্বামী] ত্রিগুণাতীত তার সারা গায়ে গঙ্গামাটিতে প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ, তারপরে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতার নাম লিখতে লাগলেন। ছেলেটি সেই লেখা দেখতে দেখতে বলল—"ওসব নাম মুছে একটি নাম রাখো—আমি ঐ নামটি নিয়েই এতদিন বেঁচেছি—মরণের সময়ে ঐ নামটি নিয়েই যাব।"[১১] যখন তাই করা হলো তখন সে মায়ের দিকে তাকালো বিদায় নিতে। তারপর সকলে তাকে বয়ে নিয়ে চলে গেল। সারাপথ সে চমৎকার কথা বলল। নদীতীরে পৌঁছানোমাত্র—মৃত্যু!

যদি কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য জেলে যাই, তাহলে আমার বন্ধুরা যেন দুঃখ না করে, কেননা আমি অবিলম্বে ধ্যান শুরু করে দেব, আর চেষ্টা করব—মাতাদেবী যে অপূর্ব ঊর্ধ্বলোকে বিরাজ করেন সেখানে পৌঁছাতে। আহা-হা! তাঁর মতো মধুরিমা আর স্নিগ্ধশান্তি, সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতার গহন গভীরতা ও স্নেহ—কল্পনাতীত! কী অসাধারণ জীবন তাঁর—পূজার ব্যাপক বিধিব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান—যে পূজা তাঁরই স্বামীর—যার আয়োজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যরা করে দেন। স্বামীকে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর বলে পূজা করেন, তবু অতিরিক্ত আছে তাঁর জন্য গভীর মানবিক স্নেহ-কোমলতা। "তাঁকে দেখেই ছিল আমার সুখ"—একরাত্রে মাকে বলতে শুনেছিলাম। এমন জীবন যাপন করে তিনি যেন পদ্মপত্রের উপরে জলবিন্দু হয়ে উঠেছেন—পৃথিবীকে সকল বিন্দুতে স্পর্শ করে আছেন, কিন্তু তার দ্বারা পরিবর্তিত বা প্রতারিত নন—দিব্যানন্দে পরিপূর্ণ।

---

১১ স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ) প্রাচীন সন্ন্যাসীদের সূত্রে শুনেছিলেন, মুমূর্ষু বালকটি বলেছিল ঃ "সব নাম মুছে শুধু একটি নাম লেখ—সারদা।" (দ্রঃ উদ্বোধন, ৯১তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৯৬, পৃঃ ৭৫২)—সম্পাদক

সেই গোড়ার দিকের দিনগুলিতে যখন স্বামীজীরা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন মাতাদেবী ঐকালের প্রামাণ্যসাক্ষী হিসাবে বর্তমান। পূর্ণ তিনি—মাতাদেবী!—পূর্ণ মাধুর্যে, মৌনে। আর কী জ্যোতির্ময়! ইদানীং আরও গভীরভাবে বুঝতে পারছি, তিনি কত সত্যভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী। মাতাদেবীর সান্নিধ্য অপূর্ব! অপূর্ব! অপূর্ব! এ জিনিস বলে বোঝাতে পারব না। ঐ স্থানটির [বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের আবাস, বর্তমানে ১, উদ্বোধন লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৩] একটি পরম অস্তিত্ব সত্যিই বর্তমান। মানুষের অন্তর্লোকের পরিপূর্ণ একটি কল্পলোক এখানে আছে—আছেই।

আহা, মায়ের বাড়ীতে কী মাধুর্য! যদি কেউ সেখানে দিনের কাজ আরম্ভ করার আগে কোন প্রয়োজনে হাজির হয়, তাহলে সেখানে কত না উত্তপ্ত ভালবাসা ও আশীর্বাদ পায়! 'তোমার কাছে কিছু চাই না—তুমি এসেছ, আহা কি সুন্দর!'—এই ভাবটি সেখানে ভরে আছে। এ জিনিস অনির্বচনীয়।

সবাই এখন বলছেন—স্বামীজীই হলেন নব ভাবধারার উৎস, এবং তাঁরা মাতাদেবীর চরণ স্পর্শ করতে আসছেন, আর সারদানন্দ কিছুতেই কাউকে ফিরিয়ে দেবেন না। বো এবং খোকা[১২] মাতাদেবীর পাদস্পর্শের জন্য এসেছিল। খোকা বোকে এনেছিল মাতাদেবীকে প্রণাম করাতে। মাতাদেবী কী মধুর ব্যবহারই না করলেন! সকল [স্বদেশী] দলই সমবেতভাবে বলছে, নতুন চেতনা এসেছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ থেকেই। যাঁরা কারামুক্ত হয়েছেন, তাঁরা মাতাদেবীকে প্রণাম জানাতে আসছেন। সকল বিরাট দেশপ্রেমিকই ও-কাজ এখন করেন। সকলেই স্বীকার করেন, ডাক এসেছিল স্বামীজীর কাছ থেকেই। মাতাদেবী বলেন, "কী সাহস! এমন সাহস কেবল ঠাকুর আর স্বামীজীই আনতে পারেন। দোষ যদি কারো হয়, সে তো তাঁদেরই!" অপূর্ব! মাতাদেবী সত্যিই অপূর্ব! নিখুঁত আর পূর্ণ

১২ বৌ, অর্থাৎ জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী অবলা বসু; নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে 'খোকা' বলতেন। অর্থাৎ আচার্য বসুকে নিবেদিতা তাঁর পুত্ররূপে দেখতেন। সে-হিসেবে অবলা বসু ছিলেন তাঁর বৌ—বৌমা বা পুত্রবধূ।—সম্পাদক

তিনি ! একদিন মাতাদেবীকে বললাম—‘মা, রামকৃষ্ণ যে বলেছিলেন, একদিন তোমার অগুনতি ছেলে হবে, সেদিন তো প্রায় এসে গেল, সারা দেশই যে দেখছি তোমার !” তিনি বললেন, “তাই তো দেখছি !”

বয়সের তুলনায় শ্রীমাকে কম দেখায়। সদানন্দময়ী—সারাক্ষণ কাজ করছেন, অথচ বয়স ৫৫-র বেশি। আমাকে তাঁর থেকে বুড়ি দেখায়, অথচ আমার বয়স ৪৫-ও নয়। সন্ধ্যায় যখন মাকে ঘিরে মেয়েরা বসে থাকেন, তখন তাঁর কাছে যেতে খুব ভাল লাগে। মায়ের গলার স্বর ১১ বছর আগে যা শুনেছি তেমনি তারুণ্যময়, হাসি তেমনি আনন্দভরা, প্রতিটি ভাবভঙ্গি, নড়াচড়া মনোহারী। মাথায় একটিও পাকা চুল নেই।

১১ ডিসেম্বর ১৯১০। [রোগশয্যায় শায়িত] সারার [মিসেস ওলি বুলের] জন্য খুব ভোরে গির্জায় গিয়েছিলাম প্রার্থনা করতে। ফিরে এসে মাকে চিঠিতে লিখলাম ঃ “সেখানে সবাই মেরীমাতার কথা ভাবছিল, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ি, হাতের বালা —সব কিছু সামনে ভেসে উঠল। তখন ভাবলাম, অভাগী সারার রোগের ঘরটিকে শান্তিতে আর আশীর্বাদে ভরিয়ে দিতে পারে একমাত্র তোমারই পরশ। ভাবলাম সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার সময়ে তোমার ঘরে বসে ধ্যানের চেষ্টা করে কী বোকামিই না করতাম ! কেন বুঝিনি যে, তোমার শ্রীচরণের কাছে ছোট্ট মেয়েটির মতো বসে থাকাটাই সব—সব কিছু ! মা, মাগো—ভালবাসায় ভরা তুমি ! তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই, তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো। সোনার আলোয় ভরা তা, খেলায় ভরা ! কয়েকমাস আগের সেই যে রবিবারটি, পুণ্যভরা সেই দিনটিতে গঙ্গাস্নান সেরে ছুটে তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম এক মুহূর্তের জন্য, তখন তুমি আশীর্বাদ করেছিলে, আর কি যে শান্তি আর হাল্কা বোধ করেছিলাম তোমার বাঞ্ছিত আবাসে !

"প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরূপ স্তোত্র কিংবা প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম ! কিন্তু জানি, সেও যেন তোমার তুলনায় শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে ! সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র—যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ, যারা নিঃসহায়। সত্যিই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।"

গির্জায় সবাই তখন মেরীমাতার কথা ভাবছিল। কিন্তু শ্রীমাকে আমার মেরীমাতা বলেই মনে হলো। তাঁর সান্নিধ্য শুদ্ধিকর। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রায়---আমরা সবাই তাঁর মতো হই।

শ্রীমা যখন কলকাতা থেকে গ্রামে যান তখন সবকিছু শূন্য মনে হয়। আর যখন এখানে থাকেন তখন আমি যাই তাঁর শ্রীচরণ ধৌত করতে। সেই ধ্রুবমন্দির থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আসি। এত সাদাসিধে নারী তিনি, তবু আমার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।

তিনি যখন এখানে [কলকাতায়] থাকেন, আমাদের আশ্রয় থাকে। *

অনুবাদ ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু

---

* ভগিনী নিবেদিতার ডায়েরী, তাঁর 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থ এবং তাঁর চিঠিপত্র থেকে সঙ্কলন ও বঙ্গানুবাদ (যার বেশ কিছু 'নিবেদিতা লোকমাতা' এবং 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে প্রকাশিত) করে শঙ্করীপ্রসাদ বসু এই স্মৃতিনিবন্ধটি প্রস্তুত করেছেন। সঙ্কলন ও গ্রন্থনার প্রয়োজনে দু-এক জায়গায় সংযোজক বাক্য বা বাক্যাংশ তৈরি করতে সামান্য স্বাধীনতা তিনি নিয়েছেন।—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যসান্নিধ্যে

ভগিনী দেবমাতা

আমার কলকাতা-ভ্রমণ ছিল তীর্থযাত্রার মতো। কলকাতার অদূরে গঙ্গার তীরে রয়েছে সেই মন্দিরটি, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করেছেন ও ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। গঙ্গার অপরতীরে কিছু দক্ষিণদিকে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় মঠ। সর্বোপরি রয়েছে বাগবাজারের সেই অনাড়ম্বর বাড়িটি, সেখানে বাস করতেন এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধিকা। তাঁর নাম সারদামণি দেবী, কিন্তু সচরাচর তিনি 'শ্রীমা' বা 'মাতাদেবী' বলেই পরিচিত। তাঁর কাছে উপস্থিত হবার জন্যই বাংলাদেশে আমার এই তীর্থযাত্রা।

মাদ্রাজে পৌঁছাবার পরেই তাঁর কাছ থেকে এই সস্নেহ আশীর্বাদ-পত্রটি পেলাম ঃ

স্নেহের দেবমাতা,

ঠাকুরের প্রতি তোমার ভক্তির সংবাদ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনন্ত ভক্তিতে তোমার হৃদয় পূর্ণ হউক, তোমার প্রতি আমার এই আশীর্বাদ। ইহার জন্য আমি ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। তুমি দীর্ঘজীবী হও এবং আমার অন্যান্য সন্তানদের সহিত চিরশান্তিতে পূর্ণ হও। ...

আমি ভাল আছি।

ইতি

তোমার স্নেহশীলা মাতাঠাকুরানী

চিঠিখানি বাংলায় লেখা ছিল—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাকে

ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। (চিঠিটির বর্তমান বাংলা-অনুবাদ ইংরেজী-অনুবাদ থেকে করা।)

আমার তীর্থযাত্রা ছিল আধুনিক ধরনের—প্রথমতঃ ট্রেনে, তাছাড়া জুতো পরে। কিন্তু আমি প্রাচীন রীতি বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলাম এবং আমার সঙ্গে কিছু প্রণামী-দ্রব্য নিয়ে যাচ্ছিলাম। ভারতীয় ধর্মীয় রীতিতে—পুণ্যস্থানে শূন্যহস্তে যাওয়া অনুচিত। আমার সঙ্গে ছিল সঙ্ঘের বর্ষীয়ানদের জন্য পাড়বসানো তাঁতবস্ত্র, নতুন সুতি-কাপড়ে জড়ানো এক মস্ত পুঁটলি, বড় একঝুড়ি দুষ্প্রাপ্য কমলালেবু—যা শুধু দক্ষিণভারতেই জন্মায়; ট্রেনে ব্যবহারের জন্য বিছানাপত্র (ভারতে প্রত্যেক যাত্রীই তাঁর নিজের বিছানাপত্র বহন করেন), একটা টিনের তোরঙ্গ, আর এক-টুকরি ফলমূল এবং কিছু বই। সহযাত্রীরা আমার তীর্থযাত্রার লটবহর বেশ অবজ্ঞার সঙ্গেই দেখছিল। জিনিসপত্র তাদের সঙ্গেও ছিল, কিন্তু সেগুলো বিলাতিকেতার, আর আমারটা ভারতীয়—তফাত অনেকখানি।

মাদ্রাজ থেকে কলকাতা—অধীর আগ্রহে একে একে চল্লিশটি ঘণ্টা গুণে দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নের কিছু আগে পৌঁছালাম। স্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিলেন ভগিনী ক্রিস্টিন। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন (বাগবাজারে) বালিকা বিদ্যালয়ে। সেখানেই আমার জন্য শ্রীমায়ের স্নিগ্ধ ভালবাসার সংবাদ অপেক্ষা করে ছিল। তিনি আমার ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন তাঁর নিজের ঘরের উপরতলায়। সেখান থেকে আশপাশের বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে গঙ্গাদর্শন করা যায়। কিন্তু সে-বাড়িতে পর পর কয়েকটি সংক্রামক রোগের ঘটনার জন্য শেষপর্যন্ত স্কুলবাড়িতেই আমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হলো। সিস্টার নিবেদিতা ও সিস্টার ক্রিস্টিন আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও দাক্ষিণ্যপূর্ণ আদরযত্ন করেছিলেন এবং তাঁদের পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু [কলকাতায় এসেই এখানকার জলহাওয়ার সঙ্গে অপরিচিত আমি সংক্রামক কোন রোগে (কলেরা, বসন্ত) আক্রান্ত হয়ে

না পড়ি সকলের সেই উদ্বেগে] রাত্রির মতো দিনেও যে মায়ের নিকট-সান্নিধ্য পাব না—সেকথা ভেবে দুঃখও সংবরণ করতে পারিনি।

বিদ্যালয় থেকে সারি সারি কয়েকটি বাড়ির পরেই 'মায়ের বাড়ী'। আমাকে কেউ একজন এসে নিয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না। একটা ছোট টুকরিতে সঙ্গে নিয়ে-আসা কিছু কমলালেবু এবং অন্য প্রণামী-দ্রব্য নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়লাম। এক অপরিচিত ভদ্রলোক আমাকে মালপত্রের ভারে বিব্রত দেখতে পেয়ে তাঁর ছেলেকে আমার হাতের জিনিসপত্রগুলো বয়ে নিয়ে যেতে বললেন। 'মায়ের বাড়ী'তে আমরা পৌঁছালাম। নতুন বাড়ি। মা থাকতেন দোতলায়—নিচের তলায় [উদ্বোধন] পত্রিকা অফিস।

সদর-দরজা এবং উঠোন পেরিয়ে চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। পূজার ঘরের পিছনে একটি ঘরে শ্রীমাকে একলা পেলাম। তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করলাম নিজেকে, প্রণামীর সঙ্গে। স্নিগ্ধ স্নেহের সঙ্গে বললেন ঃ 'ওমা দেবমাতা ! দেবমাতা !' তারপর তাঁর শ্রীহস্ত আমার মাথায় রাখলেন। তাঁর স্পর্শে আমার অন্তর থেকে নবজীবনের তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে আমার সমগ্র সত্তাকে প্লাবিত করে তুলল।

তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন মন্দিরের বেদির কাছে। প্রণাম করে মেঝেতে বসলাম, বিশ্রাম নেবার জন্য তিনি কাছেই শুয়ে পড়লেন। একজন সন্ন্যাসিনী [সেবিকা] এসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন—ভারতবর্ষে ভালবাসায়-ভরা সেবার এটি প্রচলিত রীতি। সে-দৃশ্য দেখে মনে হলো ঃ "আমি কি কোনদিন এই সেবার অধিকার লাভ করতে পারব !" আমার এই চিন্তা মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে সন্ন্যাসিনীর স্থান গ্রহণ করতে বললেন। তাঁর কোমল সুঠাম শ্রীঅঙ্গস্পর্শের সৌভাগ্য—সে এক দুর্লভ আশীর্বাদ ! কিন্তু পাথরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসা ক্রমেই আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। এবারও তিনি আমার মনের ভিতরের কথা

বুঝে নিয়ে আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। আমরা একে অন্যের ভাষা জানতাম না। যখন পরস্পরের বক্তব্য বুঝিয়ে বলার কেউ উপস্থিত থাকতেন না, তখন তিনি হৃদয়ের অকথিত গভীরতর ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতেন। সে ভাষা বুঝতে আমাদের কারোরই কোন অসুবিধা কখনো হতো না।

মা অবিলম্বে আমাকে নিজের কাজকর্মে লাগিয়ে দিলেন। তাঁর ঘর দেখাশোনা করার সুযোগ পেলাম। প্রতিদিন সকালে আসতাম, তাঁর বিছানা ঠিকঠাক করে দিতাম এবং জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতাম। সেই কাজ করবার সময়ে একদিন চোখে পড়ল, সামনের বারান্দার দিকে পাঁচটি বড় বড় জানালার শার্শিপাল্লায় রঙ আর পুডিং-এর দাগ ধরে আছে। সেগুলো সব সময় খোলা থাকত বলে স্বভাবতই কারও নজরে পড়েনি। একদিন সকালে আমি কিছু পরিষ্কার কাপড় আর বানর-মার্কা সাবান ('বন আমি'-র ভারতীয় বিকল্প) নিয়ে গিয়ে শার্শিগুলো ঝক্‌ঝকে করে ফেললাম। মা দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত। সেদিন যখনই কেউ এসেছে, মা একটা জানালা বন্ধ করিয়ে দেখিয়েছেন তার কাচগুলো কেমন ঝক্‌ঝক্ করছে।

আর একবারের কথা। একজন বাছাইকরা দুটি সেরা আম নিয়ে এসেছেন। মা চাইছিলেন আমি ঐ আম দুটি নিয়ে যাই। কিন্তু আমি রাজি হলাম না, কারণ জানতাম, সেগুলি শেষ মরশুমের আম, আর মা আম খুব ভালবাসেন। বললাম ঃ "আম দুটি আপনি নিজে রাখলে আমার বেশি আনন্দ হবে।" মা চকিতে বললেন ঃ "আমি রাখলে তোমার আনন্দ, আর তুমি নিলে আমার আনন্দ, কার আনন্দ বেশি হবে তুমি মনে কর?" আমার মুখে তখনই কথা জুগিয়ে গেল ঃ "মা, আপনার আনন্দই বেশি হবে, কারণ আপনার অনেক বড় মন।" জবাব শুনে মনে হলো মা খুশি হলেন।

প্রতিটি প্রাণী সম্পর্কে তাঁর অন্তহীন স্নেহ-ব্যাকুলতা। মানুষের মাপে তাকে মাপা যায় না। তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে তার আভাস মেলে। সেগুলি থেকে কিছু কিছু এখানে উপস্থিত করছি, যদিও তা

করতে সঙ্কোচ হচ্ছে। কারণ, সেগুলি এতই অন্তরঙ্গ চরিত্রের যে, প্রকাশ করা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও আমি তাঁর ভাব ও ভাবনার পরিচয়লাভের সুযোগ থেকে অন্যদের বঞ্চিত করতে চাই না।

আমার আদরের কন্যা,

তোমার ভালবাসাভরা পত্রগুলি পাইয়াছি। ঠিক সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া কিছু মনে করিও না। তোমার কথা সব সময় মনে পড়ে। তুমি যেখানে বসিয়া ধ্যান করিতে সেই জায়গাটির দিকে চোখ পড়িলেই তোমার সুন্দর মধুর চেহারাটি সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। এ-বাড়ির সকলে তোমার কথা খুব বলিয়া থাকে। তোমার শেষ পত্রে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ভাল আছেন জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম।...

এখানে সকলের কুশল। ইতি

আশীর্বাদিকা

তোমার একান্ত স্নেহশীলা মাতাঠাকুরানী

আমার আদরের কন্যা,

তোমার পয়লা নভেম্বরের পত্র পাইয়াছি। চিঠি পাইয়া যে কী আনন্দ হইল তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আমি এখানে [পুরীতে] বায়ু-পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছি। আরও দুই-এক মাস থাকিব। আশা করি তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র দিবে। আমি এখন আগের চেয়ে ভাল আছি। বস্টন কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন হইয়াছে এবং ঠাকুরের ভাব দিন দিন ছড়াইয়া পড়িতেছে জানিয়া আমি সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আদরের কন্যা আমার, আমি সকল সময় তোমার কথা ভাবি। আশা করি এখন সম্পূর্ণ কুশলে আছ। আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ লইও।

তোমার স্নেহময়ী মাতাঠাকুরানী

আমার আদরের কন্যা,

তোমার সব পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। সেগুলি যে আমার কত ভাল লাগিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। তোমার দিনযাপনের পদ্ধতিটি সুন্দর। তোমার শরীর-স্বাস্থ্য দিন দিন ভাল হইয়া উঠিতেছে জানিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। আমার স্নেহের কন্যা, তুমি নিশ্চয় জানিবে, ঠাকুর তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তোমার কথা সর্বদা মনে পড়ে। এই মাসের ১৬ তারিখে আমি দেশে যাইব।... এখানে সকলে ভাল আছে। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ লইবে।

তোমার একান্ত স্নেহময়ী মাতাঠাকুরানী

মা নিজের হাতে চিঠি লিখতেন না। তাঁর সঙ্গে থাকতেন এমন কোন মহিলাকে চিঠির কথা মুখে মুখে বলে যেতেন। তাঁর পত্রের অনুলেখিকা অবশ্যই খুব নির্ভরযোগ্য। মা যেমনটি বলতেন ঠিক তেমনটি তিনি লিখে নিতেন, কারণ আমার কাছে একবার একটি চিঠি এসেছিল যাতে 'প্রিয় দেবমাতা' বলে সম্বোধন করা ছিল। অন্য কেউ বাকি ঠিকানা যোগ করে দিয়েছিলেন। চিঠিটি ছিল এই ঃ

বাগবাজার, কলকাতা, ভারত

আমার পরম আদরের কন্যা প্রিয় দেবমাতা,

তোমার ১৬ আগস্টের পত্র পাইয়াছি। যখন তোমার কথা ভাবিতেছিলাম, ঠিক তখনই তোমার পত্রটি আসিল। সুতরাং বুঝিতে পার সেটি পাইয়া আমি কতখানি আনন্দ পাইয়াছি।

তুমি পত্রে ওখানকার কাজকর্মের যে-বিবরণ পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। পরমানন্দ[১] এবং ওয়াশিংটন ও বস্টনের অন্যান্য ভক্তদিগকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাইবে। তুমি

---

১ স্বামী পরমানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য।—সম্পাদক

আবার সুস্থ হইয়া উঠিয়াছ এবং পরম উৎসাহে ঠাকুরের কাজ করিতেছ জানিয়া আমি আরও খুশি হইয়াছি। সত্যিই এই সংবাদ পাইয়া আমি অত্যন্ত খুশি হইয়াছি। আমি আগের চাইতে এখন একটু ভাল আছি।

সারদানন্দ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, সত্যকাম[২], কুসুমদেবী[৩], গণেন, নিবেদিতা ও সুধীরা ভাল আছে। তাহারা প্রায়ই তোমার কথা বলে। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিও। আদরের কন্যা আমার!

ইতি
তোমার স্নেহময়ী মাতাঠাকুরানী

নিচের দুখানি পত্রও আমার আমেরিকা প্রত্যাবর্তনের পরে লেখা ঃ

সুন্দর বিলাস, মাদ্রাজ, ভারত

আদরের কন্যা আমার,

তোমার ১৭ জানুয়ারি ও ৯ ফেব্রুয়ারির দুইখানি পত্র পাইলাম। ওয়াশিংটন ও বস্টনের কাজের বিবরণ খুব আগ্রহের সহিত আমি শুনিয়াছি। ভবিষ্যতে ঐ-বিষয়ে আরও জানিবার ইচ্ছা রহিল।

দুইমাস কোঠারে কাটাইয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি এখানে যে-বাটীতে অবস্থান করিতে আমি এখন সেইখানে আছি। দেড়মাস হইল এইখানে আসিয়াছি। ইহার মধ্যে আমি রামেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম এবং সেখানে চারদিন ছিলাম। বলরামবাবুর পরিবারের লোকেরা এখন আমার সঙ্গে আছে। সবাই ভাল আছে, কেবল উহাদের পরিবারের একজন মহিলা আন্ত্রিক-জ্বরে ভুগিতেছে। সে সুস্থ হইয়া উঠিলেই আমরা কলিকাতা রওনা হইব। কাল আমাকে

---

২ স্বামী সত্যকামানন্দ—তখন শ্রীমায়ের অন্যতম সেবক। পূর্বাশ্রমের নাম আশুতোষ মিত্র—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের ভাই।—সম্পাদক

৩ কুসুমকুমারী দেবী। শ্রীমায়ের সেবিকা। 'গোপালের মা'-র শিষ্যা। গোপালের মা-র পাদমূলে উপবিষ্টা নিবেদিতার যে সুপরিচিত ছবি আছে, তাতে পাখা হাতে মহিলাই কুসুমকুমারী দেবী।—সম্পাদক

ব্যাঙ্গালোর যাইতে হইবে। সেখানে দু-এক দিন থাকিব। তারপর এখানে ফিরিয়া আসিব।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এখন একটু ভাল। অন্যান্য সাধুরা ভাল আছেন।

তুমি, স্বামী পরমানন্দ এবং ওয়াশিংটন ও বস্টনের সকল ভক্ত আমার আশীর্বাদ জানিও।

ইতি

তোমার স্নেহের মাতাঠাকুরানী

জয়রামবাটী গ্রাম, হুগলী জেলা

স্নেহের কন্যা দেবমাতা,

খুব আনন্দের সহিত তোমার ১১ জুলাই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। শ্রীমান পরমানন্দ এখনও ভারতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। যোগীন-মা, গোলাপ-মা এবং অন্যান্য সকলে ভাল আছে। আমি এখন ভাল আছি। আশা করি তোমরা ওখানে সকলে কুশলে আছ।...

অত্যন্ত বেদনার সহিত জানাইতেছি, আমার বড় স্নেহের সন্তান শশীর [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের] শরীর গিয়াছে। আমার এই ক্ষতি পূরণ হইবার নয়। গত আগস্ট মাসে সে পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে।

তোমাদের সকলকে আমার আশীর্বাদ।

তোমার একান্ত স্নেহশীলা
মাতাঠাকুরানী

তাঁর আশীর্বাদ-লাভ এবং তাঁর কাছে শিক্ষালাভের জন্য অগণিত ভক্ত সমবেত হতেন তাঁর পদপ্রান্তে। তিনি স্বয়ং আমাকে বলেছিলেন, যখন তিনি নিজ গ্রামে থাকতেন তখন অনেকদিনই রাত দুটো-তিনটের

সময় ব্যাকুল তীর্থযাত্রীরা তাঁকে জাগিয়ে তুলতেন। প্রখর রৌদ্রে ছায়াহীন দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম না করে তাঁরা যাত্রা শুরু করতেন সন্ধ্যার পর; তাই তাঁদের পৌঁছাতে শেষরাত্রি হয়ে যেত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব দর্শনার্থীরা মায়ের অপরিচিত। কিন্তু মায়ের রীতি ছিল, তখনই শয্যাত্যাগ করে স্বহস্তে রান্না করে খাইয়ে তাঁদের অতিথিশালায় বিশ্রাম করতে পাঠানো। অতিথিশালাটি তাঁরই গ্রামের এক শিষ্য—ভক্তদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন।

কলকাতাতেও প্রায় প্রতিদিন ভক্ত-তীর্থযাত্রীরা আসতেনই তাঁকে প্রণাম নিবেদন করতে। তাঁরা কোন্ সময়ে এলেন, কোথায় তাঁদের বাস, কি তাঁদের জাতি বা বর্ণ—এসব ছিল তাঁর কাছে অবান্তর। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যেখান থেকেই আসুন, সকলের জন্যই ছিল তাঁর স্নেহ-স্নিগ্ধ স্বাগত আহ্বান। সবাই তাঁর সন্তান। মাতৃগর্ভজাত সকলকেই তাঁর মাতৃহৃদয় ঢেকে রাখত তাঁর সর্বপ্লাবী পরম ভালবাসায়। সমগ্র মনুষ্যসমাজই তাঁর সংসার।

অতি বাল্যকালে অধ্যাত্মজগতের জ্যোতির্দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে তাঁর বিবাহ। বস্তুতঃ সে-বিবাহ ছিল বাগ্দানের নামান্তর মাত্র। বিবাহের অনুষ্ঠানাদির পরে তিনি তাঁর পিতামাতার কাছে স্বগ্রামে বাস করতে থাকেন, আর তাঁর থেকে বয়সে বহু বৎসরের বড় তাঁর স্বামী ফিরে গেলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পুরোহিতের নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে। বছরের পর বছর কেটে গেল। ভগবদ্-ব্যাকুলতার প্লাবন বয়ে গেল তাঁর স্বামীর সমগ্র সত্তার ওপর দিয়ে। সর্বোচ্চ উপলব্ধির পরম আলোকিত প্রশান্তি তিনি লাভ করলেন, কিন্তু একই সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে গেল মানবিক কামনা-বাসনার শেষ চিহ্নটুকুও।

দূর গ্রামে গিয়ে পৌঁছাল ভাসা ভাসা নানা গুজব। তরুণী-বধূটিকে তা তাঁর অভিনব বৈধব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলল। ভারতীয় স্ত্রীর প্রশ্নাতীত আনুগত্য নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর স্বামীকে দেখার ব্যাকুলতায় এবং সবকিছু স্বচক্ষে দেখার অভিপ্রায়ে

তিনি পদব্রজে যাত্রা করে, বহু ক্রোশ অতিক্রম করে, কলকাতার কাছে গঙ্গাতীরে সেই মন্দিরে এসে পৌঁছালেন। বিহ্বল শিশুর মতো নমস্কার করে শ্রীরামকৃষ্ণ সাদরে তাঁকে গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন ঃ "আমি প্রত্যেক নারীর মধ্যে কেবল জগন্মাতাকেই দর্শন করি—আমি তোমাকে পত্নীরূপে দেখব কি করে ?" তিনি তখনই উত্তর দিলেন ঃ "আমি তোমার কাছে কিছু চাইতে আসিনি। আমি এসেছি শুধু সেবা করতে আর শিক্ষা নিতে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভধারিণী জননী তখন মন্দির-উদ্যানে ক্ষুদ্র নহবত-ঘরে থাকতেন। খুবই বৃদ্ধা তিনি—সারদাদেবীর ওপর তাঁকে দেখাশোনা করার ভার ন্যস্ত হলো। প্রতিদিন রান্না করাই তাঁর প্রধান কাজ। সে-খাবার মায়ের অনুগত সন্তানটি [অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ] মায়ের সঙ্গে প্রায়ই গ্রহণ করতেন। বড় সুখেই কাটছিল দিন। কিন্তু [একদিন] মৃত্যুর ছায়া এসে গ্রাস করল শতায়ু বৃদ্ধার জীবনকে। সুতরাং সারদাদেবী তখন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন।

নহবতের ওপরতলায় সানাইওয়ালারা প্রহরে প্রহরে পূজার সময় জানিয়ে সানাই বাজাত, কিন্তু নিচের ঘরে বুকচাপা স্তব্ধতা। মা নিচের যে-ঘরে থাকতেন তার সামনের বারান্দায় মানুষের মাথা ছাড়িয়ে যায় এমন তালপাতার বেড়া। শুধু একটি ফোকর দিয়ে চারপাশের বাগানের কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যেত। আর সেখানেই মা দিনের বেলা, এমনকি গভীর রাত্রি পর্যন্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন, কেবল স্বামীর মুখটুকু ক্ষণেক দেখার আশায়। কিন্তু বৃথা ! এমনকি রাত্রে ঠাকুর যখন খানিক দূরে পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে যেতেন, তখনো মাথার ওপর ভাল করে কাপড় ঢেকে দিতেন। এসব কাহিনী আমাদের শোনাতে শোনাতে মা বলতেন ঃ "বাস্তবিক সে ছিল একটি পরীক্ষাই আমার কাছে।"

ক্রমে অন্য বাঙালী মহিলারা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভে উৎসুক এইসব ভক্ত-মহিলাদের দ্বারা তাঁর ছোট্ট

ঘরখানি প্রায়ই পূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। [ইতিমধ্যে অন্যান্য] শিষ্যরাও ঠাকুরের কাছে এসে হাজির হতে শুরু করেছেন। মা দেখলেন তাঁর ভক্তের সংসার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। একবার ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন ঃ "দেখ, ছেলেপুলে সকলেরই থাকে, কিন্তু তারা প্রায়ই মন্দ আর অবাধ্য হয়, কত ঝঞ্ঝাট বাধায় ; কিন্তু আমি তোমার কাছে যেসব ছেলেদের এনেছি তারা সবাই ভাল, শুদ্ধসত্ত্ব। এরা তোমাকে কখনো কষ্ট দেবে না।"

যত লোকই আসুক না কেন, মা তাদের খাবার তৈরি করতে কখনো ক্লান্তি বোধ করতেন না। প্রায়ই তাঁর নৈপুণ্য রীতিমতো পরীক্ষার সম্মুখীন হতো। একদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন গণ্যমান্য লোক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলেন। কাঁচা সবজির ভাঁড়ার তখন শেষ। কিছু বাতিল বাঁধাকপির পাতা আর সামান্য দু-একটা আনাজ ছাড়া আর কিছুই নেই। মা পড়লেন সঙ্কটে। কিন্তু গোলাপ-মা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ "ঐ ঝড়তি-পড়তি দিয়েই চমৎকার একটা রান্না তুমি করতে পারবে।" উত্তরে মা হেসে বললেন ঃ "ভাল, দেখি চেষ্টা করে। যদি ভাল হয় তাহলে তার জন্যে প্রশংসা হবে তোমারই প্রাপ্য। আর যদি না হয় তাহলে তার বদনামও তোমায় পেতে হবে কিন্তু!" ঐসব দিয়েই দ্রুত রান্না করে মন্দিরে [শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে] পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বললেন ঃ "এমন চমৎকার রান্নার সবজি পাওয়া গেল কি করে?" না, মা কিন্তু সেই প্রশংসা বা সুখ্যাতির ভাগ নেননি—সবটাই দিয়েছিলেন গোলাপ-মাকে।

দক্ষিণেশ্বরে মা সবসময় বাস করেননি। সবসুদ্ধ বছর পনের এখানে কাটিয়েছিলেন, কিন্তু একটানা নয়। মাঝে মাঝে লম্বা ছেদ পড়ত। সেসময় তিনি থাকতেন স্বগ্রামে। মন্দির-নির্মাণকারিণী ভক্ত-বিধবা রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতেন ঃ "বাবা, তুমি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া কর না। তোমার জন্যে ভাল করে রান্না করে দেবার জন্য মাকে এখানে আনিয়ে নাও না কেন?"

সুতরাং প্রসন্নচিত্তে মা আবার ফিরে আসতেন নহবতের বারান্দায় খোলা উনুনের পাশে।[৪]

পরবর্তী কালে শুধু স্বামীর জন্য খাবার তৈরি করা নয়, তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার, কাছে বসে খাওয়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তিনি। তবু বালিকাসুলভ লজ্জা পরিত্যাগ করতে পারেননি, মুখখানি সর্বদা ঘোমটায় ঢেকে রাখতেন তিনি। এক রাত্রের কথা তিনি আমাদের কাছে বলেছিলেন। সেদিন এক ব্রাহ্মণ ভক্ত-মহিলার সঙ্গে তিনি ঠাকুরের ঘরে খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুর ঈশ্বরীয়-প্রসঙ্গ শুরু করলেন। সারারাত ধরে তা চলল—কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গিয়েছিল তার হুঁশ ছিল না কারও। মা বললেন ঃ "যখন ভোরের আলো ফুটল তখন দেখি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছি—মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে। তাঁর সেই অপূর্ব কথার যাদুতে এমনই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। দিনের আলোয় চেতনা ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে নহবতে ছুটে পালালাম।"

নহবতে তাঁর জীবন ছিল একান্ত সরল ও অনাড়ম্বর। রাত তিনটে কি চারটে, অন্য কেউ ওঠার আগে বিছানা ছেড়ে উঠে তিনি গঙ্গাস্নানে যেতেন এবং রাত্রের শেষ শান্ত প্রহরটি অতিবাহিত করতেন ঈশ্বরধ্যানে। আমাকে একজন বলেছিলেন ঃ "মা কখনো ধ্যান করেন না।"—কিন্তু আমি জানতুম, তা কখনো সত্য হতে পারে না। একদিন কথাবার্তার মধ্যে তিনি চাপা মৃদুস্বরে বলেছিলেন, তাঁর ধ্যানের

---

৪ এখানে লেখিকার একটু ভুল হয়েছে। মথুরবাবু শ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে ঐভাবে অনুরোধ করলেও মথুরবাবুর জীবিতকালে শ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বরে আসা হয়নি। মা দক্ষিণেশ্বরে প্রথম এসেছিলেন (মার্চ ১৮৭২) মথুরবাবুর মৃত্যুর (১৬ জুলাই ১৮৭১) কয়েক মাস পর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, মা যেবার প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "তুমি এতদিনে এলে! এখন কি আর আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে, তোমার যত্ন হবে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে।" [দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃঃ ৪৯]—সম্পাদক

বিশেষ সময়টি হলো প্রত্যুষে—চারটে থেকে ছটার মধ্যে। ভারতীয় নারী সব বিষয়ে খোলামেলা কথা বলে থাকেন—কেবল বলেন না সেই পবিত্র গোপন ক্ষণটির কথা যা নিবেদিত ঈশ্বরকে। সেটি তিনি রাখেন পবিত্র মন্ত্রের মতো একান্ত সঙ্গোপনে।

ঠাকুরের জন্য রান্না এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আগত ভক্তবৃন্দের দেখাশোনা করা—তাঁর সারাদিন পূর্ণ হয়ে থাকত এইসব কাজে। কিভাবে তাঁর রাত্রি কাটত, তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায় জনৈক ভক্তের[৫] কথায়। ঠাকুরের প্রতি ঐ ভক্তটির বিশ্বাস একবার ক্ষণেকের জন্য বিচলিত হয়েছিল। এক পরিচারিকার মুখে গালগল্প শুনে তাঁর মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে; মন্দির সংলগ্ন বাগানে আত্মগোপন করে তিনি ঠাকুরের উপর নজর রাখেন। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকিত রাত্রি। ঠিক মধ্যরাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দরজা খুলে গেল—তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে নহবতের দিকে দ্রুত এগিয়ে চললেন—তারপর নহবত অতিক্রম করে পঞ্চবটীতে তাঁর অভ্যস্ত ধ্যানের জায়গাটিতে গিয়ে বসলেন। আত্মগ্লানিতে অস্থির ভক্তটি ছুটে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আছড়ে পড়ে নিজের মূঢ় সংশয়ের কথা প্রকাশ করলেন। স্নিগ্ধ মধুর হেসে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "তোদের মায়ের ওখানে গিয়ে কি হবে রে ? এই মুহূর্তে সে কি আর এ-জগতে আছে ? তার মন এখন এই জগতের অনেক, অনেক ঊর্ধ্বে ! আসার সময় দেখিসনি, ওপরের বারান্দায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আছে সে ?"

মায়ের চাহিদা বলতে কিছু ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগীদের মধ্যে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী ছিল। তারা আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ভাল চাল, ডাল এবং অন্যান্য জিনিস প্রচুর পরিমাণে নিয়ে আসত তাঁর কাছে। একবার একজন[৬] একটি বালিশের মধ্যে সেলাই করে দশ

---

৫ শ্রীরামকৃষ্ণের তরুণ ভক্ত যোগীন্দ্রনাথ। পরবর্তী কালে যোগীন মহারাজ —স্বামী যোগানন্দ। শ্রীমায়ের প্রথম মন্ত্রশিষ্য এবং সেবক।—সম্পাদক

৬ লক্ষ্মীনারায়ণ—মাড়োয়ারী ভক্ত।—সম্পাদক

হাজার টাকা নিয়ে এল। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঃ "ও-জিনিস আমার চাই না। কি করব আমি ওসব নিয়ে। তোমাদের মায়ের কাছে নিয়ে যাও।" সেই প্রসঙ্গে মা বলেছেন ঃ "লোকটি আমার কাছে টাকা নিয়ে এল; সঙ্গে ঠাকুরও এলেন। যেন আমাকে পরীক্ষা করতেই তিনি বললেন, 'টাকাটা নিয়ে নাও না কেন ? ওতে তুমি জড়োয়া গয়না কিনতে পারবে, যা কোনদিন পাওনি।' আমি বললাম, 'সোনাদানা নিয়ে আমি কি করব ? ওসব আমি চাই না'।" লোকটিকে টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হলো।

একবার স্থির হলো, আলোবাতাসহীন পর্দাঘেরা নহবতের চেয়ে খোলামেলা একটি জায়গায় মা যাতে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একজন ভক্ত[৭] ঘর তৈরির জন্য দুটি পুরো গাছের কাঠ দিলেন। বড় বড় ভারী গাছের গুঁড়িগুলি গঙ্গার ঘাটে এসে ভিড়ল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগনে হৃদয়কে মা পরামর্শ দিলেন, সেগুলি ঘাটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখতে। হৃদয় কিন্তু বাইরের দিকের কাঠই কেবল বাঁধলেন। তার ফলে রাত্রে জোয়ার এসে ভিতরের কাঠ মাঝগঙ্গায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পরদিন সকালে মহা চাঞ্চল্য, কারণ গাছ দুটির দাম পাঁচশো টাকা। হৃদয় উলটে মাকে ধমক দিতে লাগলেন, তাঁরই দুর্ভাগ্যে এই দুর্বিপাক ! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে মাঝগঙ্গা থেকে কাঠ ফিরিয়ে আনতে পাঠালেন। তারপর গুঁড়ি দুটিকে চেরাই করে মন্দির-সংলগ্ন পল্লীতে মায়ের জন্য একটি ছোট বাড়ি করে দেওয়া হলো।

এসব ঘটনার বহুদিন পরে আমি মাতৃসন্নিধানে গিয়েছি। দক্ষিণেশ্বর তারই মধ্যে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে ভক্তের দল আসেন ঠাকুরের উপস্থিতির সুবাসটুকুর রেশ বুকভরে গ্রহণ করতে। মা তখন বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের তৈরি করা কলকাতার একটি বাড়িতে। সে-বাড়ির দোতলায় তিনি থাকতেন। সঙ্গে থাকতেন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী কয়েকজন মহিলা।

---

৭ কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।—সম্পাদক

অন্য সকলের মতোই সেখানে তিনি থাকতেন। সবার সঙ্গে একইভাবে গৃহস্থালির কাজকর্ম করতেন। কোথাও নিজেকে আলাদা করে রাখার কোন চেষ্টা তাঁর ছিল না। শুধু পার্থক্য ছিল তাঁর অধিকতর নম্রতায়, অধিকতর মধুরতায় এবং বিনতিতে। একদিনের কথা মনে আছে। দেখেছিলাম, গ্রাম থেকে আগত এক ব্রাহ্মণকে গভীর ভক্তিতে তিনি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করছিলেন। কারণ আর কিছু নয়, ব্রাহ্মণটি ছিলেন এক গ্রাম্য পুরোহিত অথবা কুলগুরু জাতীয় কেউ। তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণে তাঁকে অত্যন্ত সাধারণ কেউ বলে মনে হতো। সংসারের সবকিছুর মধ্যে নিজেকে এমনিভাবে সম্পূর্ণ আড়ালে তিনি ঢেকে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সহজতার অবগুণ্ঠনতলে বিরাজিত ছিল রাজরাজেশ্বরীর মহিমা, যা অভিভূত করত হৃদয়কে এবং নত করে দিত অপরকে তাঁর চরণপ্রান্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে। তাঁর অন্তরের দৈবী-চেতনার আলোককে গোপন করার পক্ষে তাঁর মানবীয় বাহ্যিক আবরণটি ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। তিনি কখনো ধর্মশিক্ষা দিতেন না; উপদেশ দিয়েছেন কদাচিৎ। তাঁর ছিল শুধু জীবন —যাপিত জীবন। সেই পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত কত মানুষের জীবনকে নির্মল ও ঊর্ধ্বায়ত করেছে, কে তার ইয়ত্তা করবে?

দোতলার যে-ঘরে তিনি থাকতেন, তার লাগোয়া একটি বড় ঘর ছিল। সেটি ছিল সকলের বৈঠকখানা—গল্প, কথাবলার জায়গা। তার একপ্রান্তে পূজার ঘর। কিন্তু উভয় ঘরের মধ্যে কোন ভেদরেখার প্রয়োজন ছিল না, কারণ সেখানে যাঁরা থাকতেন তাঁদের জীবনে দ্বিতীয় কোন সঙ্গীর অস্তিত্ব ছিল না। একমাত্র ঈশ্বরই ছিলেন তাঁদের একান্ত সঙ্গী-সহচর। স্বাভাবিকভাবেই দিবারাত্র তাঁর চরণাশ্রয়েই কাটাতেন তাঁরা। সকাল থেকেই শুরু হতো ভক্তদের আসা-যাওয়া। তাঁরা এসে প্রথমে ঠাকুরঘরের সামনে প্রণাম করতেন, তারপর ফুল-ফল বেদির পাশে রাখতেন। তারপর প্রণাম করতেন মাতাঠাকুরানীকে, এবং তাঁর নির্দেশমত কাছে বসতেন। সেখানে কয়েকজন তরুণ ছিলেন যাঁরা মায়ের আশীর্বাদ না নিয়ে কখনো

প্রাত্যহিক কাজ আরম্ভ করতেন না। এঁদের প্রতি মায়ের বিশেষ স্নেহ। এঁরা যে তাঁরই হাতে, কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছেন।

তাঁকে ঘিরে থাকত আনন্দ-স্নিগ্ধ এক মধুরতা। সেইসঙ্গে ছিল এমন প্রচ্ছন্ন রসবোধ যে, তাঁর সঙ্গে যে-কোন বিষয়ে আলাপ করা যেত। তুচ্ছতম বিষয়েও তাঁর কৌতূহল। তাঁর সঙ্গে থাকত আটবছরের ভাইঝি রাধু—তার মতোই শিশুর খেলায়, রঙ্গে, তিনি মেতে উঠতে পারতেন। একবার আমি রাধুর জন্য ইংরেজী দোকান থেকে 'বাক্সের মধ্যে জ্যাক' ('জ্যাক ইন দ্য বক্স') খেলনাটি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটি নিয়ে তাঁর খুশির দৃশ্যটি আমি এখনো যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। যতবার পুতুলটি শব্দ করে বাক্স থেকে লাফিয়ে উঠেছে ততবারই তিনি শব্দটির নকল করে হেসে লুটিয়ে পড়েছেন।

আর একদিন আমি গিয়ে দেখি তিনি কাচের পুঁতির মালা গাঁথছেন। রাধুই কারণটা জানাল ঃ "মন্দিরের ঠাকুর-দেবতার মতো আমার গোপালের যে কোন গয়না নেই!" কিন্তু মায়ের কাজে কোন ছলনা ছিল না। এই ছোট্ট খেলনা-পুতুলটিকেই তিনি ভগবানের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন, এবং যেমন করে একজন ভক্তিমতী সন্ন্যাসিনী শিশু যীশুর জন্মদিনে তাঁকে আচ্ছাদনে ভূষিত করেন তেমনি করেই তিনি সেটিকে আভরণে ভূষিত করছিলেন।

শ্রীমা আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর সত্তা আজও আমাদের সতত রক্ষা করছে। তিনি চলে যাবার আগে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম এই শেষ চিঠিখানি ঃ

আদরের কন্যা আমার,

তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। অনেকদিন পর তোমার একখানি পত্র পাইলাম। শ্রীমান বসন্ত (স্বামী পরমানন্দ) এবং তুমি কুশলে আছ জানিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি আমার কন্যা। আবার তুমিই আমার মাতা, কারণ তুমি আমার জন্য ভগবানের নিকট

প্রার্থনা করিয়াছ। বসন্তকে আমার আশীর্বাদ জানাইও। তোমাকেও আমার আশীর্বাদ। সকলের জন্যেই আমার আশীর্বাদ। বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) শরীর যাওয়াতে আমি কী পরিমাণ দুঃখ পাইয়াছি তাহা পত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বসন্তের কাজকর্ম ভাল চলিতেছে জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক কাজের চাপে তাহার এখানে আসা হইতেছে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি, যখন সম্ভব হইবে সে আসিবার চেষ্টা করিবে। মঠে যাহারা আছে তাহাদের সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাইও। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের সকলকে তাঁহার যোগ্য সন্তান করিয়া তুলুন—এই আমার প্রার্থনা। তোমার কুশল সংবাদ দিও। চিঠি দিবে।

ইতি
আশীর্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে বাস করার দুর্লভ সৌভাগ্য যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরা জেনেছেন, ধর্ম কত মধুর, কত স্বাভাবিক, কত আনন্দময় সামগ্রী। তাঁরা জেনেছেন সেই শুচিতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। তাঁরা জেনেছেন, পবিত্রতা যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ধরা দেয় এমন সুরভি-সুবাস, যা জড়বাদী স্বার্থপরতার কটু গন্ধ ও ক্লেদকে পরাভূত করে নিঃশেষে বিনষ্ট করে দেয়। করুণা, ভক্তি এবং ঈশ্বরানুভূতি—এই ছিল শ্রীমায়ের সহজাত স্বভাব। কিন্তু এতই সহজ স্বাভাবিক ছিল যে, লোকের কাছে সেগুলি আলাদাভাবে ধরা পড়ত না। তাঁর প্রাণজুড়ানো আশীর্বচনের একটি শব্দ, কিংবা ক্ষণেক স্পর্শের মধ্যে এই গুণগুলির অস্তিত্ব অনুভূত হতো।

বিস্তীর্ণ জলাশয় বা প্রবহমান নদীর মতো তাঁদের জীবন। সূর্যরশ্মি তার জলকণাকে শোষণ করে, তারপর তা আবার বর্ষণরূপে ফিরে আসে পৃথিবীকে সতেজ করবার জন্য। তাঁদের পার্থিব দেহ আমাদের সামনে থেকে সরে যায়। কিন্তু আমাদের ক্লান্ত স্তিমিত হৃদয়কে

নবপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত করতে, আমাদের নতুন আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে, আমাদের জীবনে উদ্দেশ্যের নতুন শক্তি ও রূপ উন্মোচন করতে তাঁদের পুণ্যপ্রভাব নিত্য বর্তমান। *

অনুবাদ ঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়[৮]

---

* 'A Woman Saint of India', Days in an Indian Monastery—Sister Devamata. Ananda Ashrama, La Crescenta, California. 2nd Edn., 1972, pp 211-229

৮ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় অনূদিত এই স্মৃতিসন্দর্ভটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থের পরিশিষ্টে।—সম্পাদক

চতুর্থ পর্ব

শ্রীমা*

আশুতোষ মিত্র

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২২ এপ্রিল শুক্রবারের কথা। সারদা মহারাজের (স্বামী ত্রিগুণাতীতের) সঙ্গে বেলা আন্দাজ আড়াইটায় ১০/২ বসুপাড়া লেনে যাই। তখন উহা কাহার বাড়ি, কে থাকেন, কেনই বা সেখানে গিয়াছি ইত্যাদি কিছুই জানিতাম না। বাড়িটির নিচের তলায় প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিমে দুইখানি ঘর, মধ্যে সদরদ্বার। সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দক্ষিণদিকের ঘরখানিতে গিয়া দেখি একজন সাধু শুইয়া আছেন। সাধুটি আমার বিষয়ে সারদা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

---

* রচনাটি 'শ্রীমা' শিরোনামে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে (১৩৫১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে) প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশকের ঠিকানা ঃ সন্তোষকুমার ঘোষ, ৭বি সর্ব খাঁ রোড, পাইকপাড়া, বেলগাছিয়া, কলকাতা। এপর্যন্ত [ডিসেম্বর ১৯৯৫ (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২)] গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ হয়নি। গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' লেখক বলেছেন ঃ "ইহাতে কেবলমাত্র সেইসব বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যেগুলি হয় লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছে অথবা শ্রীমায়ের শ্রীমুখে শুনিয়াছে।" শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম জীবনীকার ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' গ্রন্থের অনেক উপাদান লেখকের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তখন অবশ্য লেখকের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি। শ্রীশ্রীমায়ের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক প্রামাণ্য জীবনী, স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে লেখকের 'শ্রীমা' গ্রন্থ থেকে বেশ কিছু উপাদান গৃহীত হয়েছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীমায়ের অপর যেসকল জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিতেও 'শ্রীমা' গ্রন্থ থেকে উপাদান নেওয়া হয়েছে। মূল গ্রন্থের তিনটি অধ্যায় এখানেও পরপর সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

লেখকের নিজস্ব যেসমস্ত পাদটীকা মূল রচনায় ছিল সেগুলি সাধুভাষাতেই রাখা হয়েছে। যেসব পাদটীকা বর্তমানে সংযোজিত হয়েছে সেগুলির ভাষা চলিত এবং সেগুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে।—সম্পাদক

"এটি কি তোর ভাই ?" তিনি বলিলেন ঃ "হ্যাঁ।"[১] সাধু কহিলেন ঃ "মা কিন্তু এখন বিশ্রাম করছেন—ঠাকুর তুললে বলব।"

এই 'মা' যে কে কিছুই বুঝিলাম না; শ্রীমায়ের বিষয় তখনও পর্যন্ত কিছুই জানিতাম না, এমনকি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণেরও যে কে, তাহাও জানিতাম না। অবশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে কিছু কিছু শুনিয়াছি এবং একবার নাকি [আমি] গর্ভধারিণীর ক্রোড়ে গিয়া (তখন আমার বয়স চার/পাঁচ বৎসর) শ্যামপুকুরবাটীতে [তাঁহাকে] দেখিয়াছি, কিন্তু উহা মনে নাই। যাহা হউক, সাধুটির নাম—পরে জানিতে পারিলাম—যোগীন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ)। তাঁহার ইঙ্গিতে ঘরের এক কোণে রক্ষিত একটি বাটি আনিয়া তাহা হইতে দুধ-ভাত কিছু সারদা মহারাজকে [দিলাম] আর বাকি নিজে খাইলাম। মিষ্ট লাগিল। শুনিলাম উহা শ্রীমার প্রসাদ। বারবার 'মা'র নাম শুনিয়া মনে হইল, ['মা'] বুঝিবা ঐ সাধুটিরই মা হইবেন।

ক্ষণেক বিশ্রামের পর বেলা আন্দাজ চারটার সময় উপরের ঘরের মেজেয় একটি বাটি রাখিবার মতো শব্দ হওয়ায় যোগীন মহারাজ বলিলেন ঃ "এইবার তোরা যা, মা ঠাকুর তুলেছেন।" সারদা মহারাজ গেলেন না—লেখককে পশ্চিমের ঘরের উত্তরে সিঁড়ি দেখাইয়া উপরে যাইতে বলিলেন। তাঁহার আদেশে উপরে উঠিয়া প্রথম অর্থাৎ পশ্চিমের ঘরটিতে কাহাকেও না পাইয়া পূর্বদিকের ঘরটিতে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন দেখিলাম। তিনি [আমাকে] দেখিবামাত্র

---

১ লেখক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের (পূর্বনাম সারদাপ্রসন্ন মিত্র) সহোদর ভাই। তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। সন্ন্যাসের পর তাঁর নাম হয়েছিল স্বামী সত্যকামানন্দ। সঙ্ঘজীবনে তিনি শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পার্ষদের স্নেহসান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের দীর্ঘকাল (তের বছর) সেবার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা আদর করে তাঁকে 'আমার কার্তিক' বলে ডাকতেন। পরে ভাগ্যবিপাকে তাঁকে সঙ্ঘ ছেড়ে চলে যেতে হয়।—সম্পাদক

ডাকিয়া বলিলেন ঃ "তুমি সারদার ভাই ? মঠে যাবে ? বেশ তো। একটু মিষ্টি খাও।" দুইখানি তিলকুটা দিলেন—জল দিলেন। খাইয়া চলিয়া আসিতেছি, তিনি ডাকিয়া বলিলেন ঃ "পেন্নাম করলে না ?" অপ্রস্তুত হইয়া প্রণাম করিতে গেলে [তিনি] আগে ঠাকুরকে দেখাইয়া দিলেন। পর পর ঠাকুরকে ও তাঁহাকে প্রণাম করায় তিনি আমার চিবুক ধরিয়া চুমা খাইলেন।

মঠে যাইবার পথে সারদা মহারাজকে মায়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনিই 'শ্রীমা'। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "আপনি কি নিজে বা কাহাকেও দিয়া পূর্বে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি আপনার ভাই ?" তিনি অস্বীকার করিলেন; বলিলেন ঃ "না।"

ঐরূপে শ্রীমায়ের সহিত পরিচিত হইয়া দ্বিতীয়বার যেদিন [তাঁহার] দর্শন লাভ করি, সেদিনটা নিজের পক্ষে একটা স্মরণীয় দিন। সেদিন ১৫ মে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার। প্রত্যূষে উঠিয়া শ্রীমায়ের পূজার জন্য মঠ হইতে ফুল তুলিয়া লইয়া আসি। নিচে যোগীন মহারাজ ছিলেন। বলিলেন ঃ "তুই তো ছেলেমানুষ—একেবারে ওপরে চলে যাবি।" (তখন [আমার] আঠার বৎসর বয়ঃক্রম।) শ্রীমা তখন পূজার আসনে বসিয়াছেন মাত্র। ফুল লইলেন এবং নিকটে অপর একখানি আসনে বসিতে আদেশ করিয়া বলিলেন ঃ "আগে পূজো সেরে নিই।"

প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে পূজা সমাপন হইলে এদিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "মন্ত্র নেবে ?" অবাক হইলাম। মনে যাহাই থাকুক না কেন, কিছুই তো বলি নাই—কিরূপে মনোভাব জানিতে পারিলেন ? যাহাই হউক, শ্রীচরণে স্থান দিলেন। নিকটে একটি সুপক্ব ফল ছিল, হাতে দিয়া বলিলেন ঃ "আমায় দাও। দিতে হয়, বাবা।" তাঁহারই জিনিস তাঁহাকে দক্ষিণা দেওয়া হইল।

ঐ অবধি মাঝে মাঝে [শ্রীমার কাছে] যাইতে লাগিলাম। একদিন প্রাতে প্রায় আটটার সময় যোগীন মহারাজ ও কৃষ্ণলাল (পরে স্বামী ধীরানন্দ) শ্রীমাকে মঠে আনিলেন। সঙ্গে গোলাপ-মা (ঠাকুরের ও

শ্রীমার স্ত্রীভক্ত)। মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে। শ্রীমার নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্র মঠে শঙ্খধ্বনি হইতে থাকিল। [শ্রীমা] অবতরণ করিলে [তাঁহার] শ্রীচরণ ধুইয়া দিয়া ঠাকুরবাটীর দালানে বসাইয়া [তাঁহাকে] বাতাস করা হইল। গ্রীষ্মকাল—বড়ই গরম। নন্দলাল ভোগের ব্যবস্থায় গেলেন। সুশীল মহারাজের (স্বামী প্রকাশানন্দের) সঙ্গে [আমি শ্রীমার] সেবায় নিযুক্ত রহিলাম। মঠের বড়রা ও ছোটরা সকলে একে একে প্রণাম করিয়া গেলেন। বিশ্রামান্তে শ্রীমা পূজার জন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। পূজার আয়োজন পূর্ব হইতেই করা ছিল। পূজান্তে [তিনি] ছেলেদের জলখাবার দিতে আদেশ করিলেন। নন্দলাল শ্রীমাকে ও গোলাপ-মাকে মিছরির পানা ও ঠাকুরের প্রসাদী ফল ও মিষ্ট দিয়া বাকি রান্নাবাড়িতে লইয়া গেলেন। আমাদের উভয়ের কেহ [শ্রীমায়ের] মুখ ধুইবার জলের ব্যবস্থা, আর কেহ বা বাতাস করিতে থাকিল। শ্রীমা খাইতে খাইতে উভয়কে প্রসাদ দিলেন—পাইয়া তাহারা কৃতার্থ হইল।

ক্রমে ভোগ আসিলে শ্রীমা ঠাকুরের ভোগ ও শয়ন দিলেন। তাঁহার ও গোলাপ-মার ভোজনের ব্যবস্থা নন্দলাল দালানে করিয়া দিলেন। [শ্রীমা] বসিয়াই অগ্রে দুধে-ভাতে মাখিলেন, তাহাতে রসকরা, আম ও চিনি মিশাইলেন; উদ্দেশ্য বুঝিয়া নন্দলালকে একটি খালি বাটি আনিতে বলা হইল। ঐ বাটি আনা হইলে শ্রীমাকে উহাতে ছেলেদের জন্য প্রসাদ দিতে এবং পূর্ব বাটিতে [তাঁহার] নিজের জন্য রাখিতে অনুরোধ করা হইল। প্রথমে সম্মত হইতেছিলেন না; অনেক বলায় নিজের জন্য একটু রাখিয়া অবশিষ্ট সব দিয়া দিলেন। নন্দলাল উহা লইয়া গেলে [শ্রীমা] আহারে বসিলেন। খাইতে খাইতে কথা কহিতে থাকিলেন—কে কোথায় থাকে, কি খায়, কোথায় কে শয়ন করে, কে ঠাকুরপূজা করে—ইত্যাদি নানা কথা।

আহার শেষ হইলে একখানি মাদুর বিছাইয়া দেওয়া হইল; অর্ধশায়িতাবস্থায় বিশ্রাম করিলেন। গোলাপ-মা মেজেয় শুইয়া নাক

ডাকাইতে থাকিলেন। আমরা উভয়ে একে একে খাইয়া আসিলাম। অপরাহ্ণে চারিটায় [শ্রীমা] ঠাকুর তুলিলেন। কিছু জলযোগের পর [তাঁহাদের] প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ হইল। একে একে মঠের সকলে প্রণাম করিয়া গেলেন।

[শ্রীমা] এইবার নৌকায় উঠিবেন। সঙ্গে গোলাপ-মা, যোগীন মহারাজ ও কৃষ্ণলাল যাইবেন। শ্রীমা যাইতেছেন, এমন সময় রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) প্রার্থনাবাণী লইয়া কৃষ্ণলাল আসিলেন। তাঁহার একান্ত প্রার্থনা ঃ "শ্রীমা যাইবার পূর্বে মঠের নূতন জমিতে একবার যেন পদধূলি দিয়া যান।" অতএব স্থির হইল, শ্রীমা নৌকায় তথায় যাইবেন। যোগীন মহারাজ পদব্রজে ঐ জমিতে গেলেন। নৌকায় শ্রীমা, গোলাপ-মা, কৃষ্ণলাল, সুশীল ও লেখক গেলেন। শ্রীমা প্রায় সমস্ত জমিটি বেড়াইয়া দেখিলেন। ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড তখন ঐখানে থাকিতেন। তাঁহারা খবর পাইয়া শ্রীমাকে সঙ্গে লইয়া জমি দেখাইতে লাগিলেন। শ্রীমা জমি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ঃ "এতদিনে ছেলেদের মাথা গোঁজবার একটা জায়গা হলো। আহা, ওরা আজ এখানে, কাল সেখানে করে বেড়াচ্ছিল। ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন!"

শ্রীমা নৌকায় উঠিলেন। সুশীল ও লেখক রহিয়া গেল; তাহারা হাঁটিয়া মঠে ফিরিবে। তাহাদের ডাকিয়া মন বুঝিয়া [শ্রীমা] বলিয়া গেলেন ঃ "ভেবো না—আমি তো আছিই—মন খারাপ হলে মাঝে মাঝে এখানে আসবে।"

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভোজনের পর শ্রীমা অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করিতে করিতে কথা কহিতেছিলেন। সে-কথাবার্তার মধ্যে যেগুলি প্রকাশযোগ্য, সেগুলি এখানে দেওয়া হইতেছে।

তিনি বলিলেন ঃ "এ-বাড়িতে আমি যখন ছিলুম, তখন সারদা আমার কাছে থাকত। সে করত কি, তা জান?" আমরা শুনিতে আগ্রহান্বিত হইলে অঙ্গুলি দ্বারা ঠাকুরের ভাণ্ডারঘরের পশ্চিমদিকে দেখাইয়া বলিতে থাকেন ঃ "ওখানে একটা শিউলিগাছ আছে কি?" আমরা বলিলাম ঃ "হ্যাঁ মা, আছে।"

শ্রীমা—[সারদা] রোজ সন্ধ্যেবেলা একখানা চাদর কেচে শুকিয়ে রাখত। রাতে শুতে যাবার সময় চাদরখানা ঐ গাছতলায় বিছিয়ে রাখত। ভোরে উঠে ফুল তোলবার সময় চাদরখানা গুটিয়ে তার ওপর যত ফুল পড়ত, সব নিয়ে আমার পূজোর জন্যে সাজিয়ে রাখত। শিউলিফুল শেষ রাত্তিরে ঝরে কিনা, তাই পাছে নোঙরা মাটিতে পড়ে অশুদ্ধ হয়, সেজন্যে ওরকম করত। কি নিষ্ঠা—দেখলে ?

সুশীল মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "আর মা, ঠাকুরকে যে এখানে গঙ্গায় মিশে যেতে দেখেছিলেন ?"

শ্রীমা—হ্যাঁ বাবা, সেদিন পূর্ণিমা—চাঁদ উঠেছে, আমি ঐ সিঁড়ির ওপরে বসে গঙ্গা দেখছি, দেখি কি, পেছন থেকে ঠাকুর এসে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গঙ্গায় গিয়ে মিশে গেলেন। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—হাঁ করে দাঁড়িয়ে উঠে দেখতে লাগলুম। কোথা থেকে অমনি নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ) গঙ্গার ধারে এল আর দুহাতে সেই জল নিয়ে ছিটোতে লাগল। ওমা, দেখি কি, গোনা যায় না, এত লোক কোত্থেকে এসে নরেনের হাতের জল পেয়ে মুক্ত হয়ে যেতে থাকল ! ঐ দেখার পর থেকে কদিন আর গঙ্গায় নামতে পারিনি।

সুশীল মহারাজ বলিলেন ঃ "তাইতো হয়েছে মা, স্বামীজী পৃথিবী জয় করেছেন।"

শ্রীমা—এসব কিন্তু পঞ্চতপা করার পর দেখেছিলুম।

লেখক পঞ্চতপার বিষয়ে বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতে থাকিলেন ঃ "ঠাকুরের শরীরত্যাগের পর আমার এমন হলো যে, আর থাকতে পারি না। খালি মনে হয়, এমন সোনার ঠাকুর চলে গেলেন, আমি আর কেন থাকব ? কিছু ভাল লাগত না, কারুর সঙ্গে কথা কইতেও ভাল লাগত না। ছেলেরা আমার অবস্থা বুঝতে পেরে আমায় তীর্থে তীর্থে ঘোরাতে লাগল, যদি আমার মন স্থির হয়—নাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), ছেলে-যোগীন (স্বামী যোগানন্দ), বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ), কালী (স্বামী অভেদানন্দ), শরৎ (স্বামী সারদানন্দ)—এরা সব নিয়ে যেতে লাগল। কাশীতে যখন আছি,

একটি নেপালী মেয়ে আমার কাছে খুব আসত, সে সাধুনী—অনেক রকম অনুষ্ঠান জানত; আমার অবস্থা দেখে একদিন বললে, 'মাঈ, পঞ্চতপা কর।' আহা, মেয়েটি খুব ভাল। তার বলা থেকে খালি মনে হতে লাগল—পঞ্চতপা করলে হয়তো আমার মনের আগুন নেবে। শরীর রাখতে চেষ্টা করতে লাগলুম—একদিন তো ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমার মরা হবে না—তোমায় থাকতে হবে।' সেই থেকে কখনো মনে হতে লাগল—না, শরীর রাখব না—কি হবে শরীর রেখে ? আবার ঠাকুরের কথা মনে পড়ায় শরীর রাখতে চেষ্টা করতে লাগলুম। কি দিনই সব গেছে—কি বলব তোমাদের ! তারপর পূর্ণিমার রাত্তিরে যখন ঠাকুরকে গঙ্গায় মিশে যেতে দেখলুম, সেই থেকে শরীর রাখব ঠিক করলুম। ঠাকুরের কথা অমনি মনে পড়ে গেল—তিনি বলেছেন—'তোমার মরা হবে না—তোমায় থাকতে হবে—আমি আর কজনকে দেখেছি ? তোমার কাছে ঢের আসবে—তাদের ভার তোমার ওপর'—এইসব মনে হতে লাগল, আর সারারাত ঘুম হলো না। সকালে মেয়ে-যোগেনকে (যোগীন-মা—ঠাকুর ও মায়ের স্ত্রীভক্ত) পঞ্চতপার উদ্যোগ করতে বললুম। গোলাপ আর মেয়ে-যোগেন ছাতের ওপরে মাটি ফেলে ঘুঁটে যোগাড় করলে।

"তারপর যেদিন পঞ্চতপা করব, সেদিন যখন এল, আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল—খালি ভয় হতে লাগল, কি করে আগুনের ভেতর সেঁধুব ! বুঝে দেখ কি ব্যাপার ! পাঁচ হাত অন্তর অন্তর চারটে ঘুঁটের আগুনের বেড় মোটা করে গোল করে রাখা হয়েছে—দাউদাউ করে জ্বলছে, আর মাথার ওপর ঠিক দুপুরের সূর্যি—দারুণ গরমি কাল—গঙ্গায় নেয়ে এসে কি করে আগুনের ভেতর ঢুকব তা-ই ভাবছি—মেয়ে-যোগেন সাহস দিয়ে বললে, 'মা, ঢুকে পড়—ভয় কি ?' তার কথায় সাহস পেয়ে ঠাকুরকে স্মরণ করে ঢুকলুম—মাঝখানে গিয়ে বসলুম—সন্ধ্যে পর্যন্ত রইলুম—এইরকম পাঁচ-পাঁচ দিন করলুম। শরীরটা পোড়া কাঠ হয়ে গেল, তবে গিয়ে মনের আগুন নিবল।"

সুশীল মহারাজ বলিলেন ঃ "আপনার অতশত করবার কি দরকার ?" তিনি বলিলেন ঃ "বাবা, কেন জান ? তোমাদের জন্যে ছেলেরা কি অত করতে পারবে ? দেখছ না—গোলাপ কেমন নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুচ্ছে ! তাই সব করতে হয়। আমি আর কি করেছি ! ঠাকুর কত বেশি করেছেন !"

এই ঘটনার পর, অর্থাৎ শ্রীমায়ের নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীস্থ মঠে আগমনের পর ১০/২ বসুপাড়া লেনে তাঁহার প্রথম ফটো তোলা হয়।[২] ঐ দুইখানি ফটোই মিসেস বুলের ব্যবস্থানুসারে ও ব্যয়ে ১৩০৫ সালে তোলা হয়।[৩] মিসেস বুল, ভগিনী নিবেদিতা ও মিস ম্যাকলাউড তখন বেলুড়ে বর্তমান মঠের পুরাতন দুইখানি ঘরে, অর্থাৎ যে-দুইখানি ঘরের উপর বর্তমান মঠ নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে থাকিতেন।[৪]

ঐ ঘটনার পর দুইবার শ্রীমায়ের বাড়িতে আমাদের থাকিতে হয় —প্রথমবারে তিনদিন এবং দ্বিতীয়বারে দুইদিন। ঐ সময়ে প্রতিদিন দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রহর রাত্রে পরমভক্ত নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র থিয়েটার হইতে ফিরিতেন এবং তাঁহার গাড়ি থামিলেই মত্তাবস্থায় 'শশীর মা' নামে এক মুড়িওয়ালীকে শতেক গালিবর্ষণ করিতে করিতে নিজ বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিতেন। শশীর মা তাহার দোকানের ভিতর তখন ঘুমাইত। গিরিশচন্দ্রের নিত্যনৈমিত্তিক চিৎকারে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত এবং পরদিন প্রাতে শ্রীমার নিকট শুনিতাম যে, তাঁহার বড় ভয় হয়, যখন গিরিশচন্দ্র ঐপ্রকার করেন।

শ্রীমায়ের বাটী গিরিশচন্দ্রের বাটীর উত্তরে, মাঝে একটি সরু গলি। অতএব গাড়ি আসিয়া শ্রীমার বাটীর সম্মুখে থামিত আর মত্ত গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার ষণ্ডা ভৃত্য মাতাদিন ধরিয়া লইয়া যাইত।

২ এখানে লেখকের স্মৃতিতে ভুল হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম ফটো তোলা হয়েছিল ১৬ বোসপাড়া লেনের নিবেদিতার আবাসে।—সম্পাদক

৩ ফটো তোলা হয়েছিল দুইখানি নয়, তিনখানি এবং ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ (১৮৯৮ সালের নভেম্বর) মাসে।—সম্পাদক

৪ বর্তমান মঠ অফিসের একতলায়। বর্তমান মঠ অফিসটি পুরনো বাড়ির আদলে পরে পুনর্নির্মিত হয়।—সম্পাদক

আর একদিন সন্ধ্যার পর স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীমায়ের বাটীতে আসি। স্বামীজী [তখন] কাশ্মীর হইতে সবে ফিরিয়াছেন এবং শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে খগেন মহারাজ (স্বামী বিমলানন্দ) ও সুশীল মহারাজ আছেন। যোগীন মহারাজ, কৃষ্ণলাল ও আমরা স্বামীজীর সঙ্গে শ্রীমার নিকট উপরে যাই। শ্রীমা তাঁহার সমস্ত শরীর একখানি চাদরে আবৃত করিয়া ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া। কৃষ্ণলাল নিকটে থাকিয়া তাঁহার উত্তরগুলি স্বামীজীকে শুনাইতে থাকিলেন।

এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, শ্রীমাকে বড়দের দুই-একজন ব্যতীত কাহারও সহিত কথা কহিতে আমরা তো কখনও দেখি নাই। ঐ সময়ে ছোটদের কোন একজনকে তাঁহার নিকট থাকিতে হইত, যাহার মারফত [তিনি] তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতেন। বড়দের মধ্যে যাঁহাদের সহিত তিনি কথা কহিতেন, তাঁহারা [হইলেন] লাটু মহারাজ, গোপাল-দা বা বুড়ো গোপাল এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ নাগ মহাশয়। যাঁহাদের সহিত কথা কহিতেন না, তাঁহারা আসিলে চাদরে সর্বশরীর (চরণদ্বয় ব্যতীত) আবৃতা হইয়া দাঁড়াইতেন, আর তাঁহারা চলিয়া গেলে চাদর খুলিয়া ফেলিতেন।

স্বামীজী আসিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিলে তিনি চাদরের ভিতর হইতে দক্ষিণ হস্তটি বাহির করিয়া স্বামীজীর মস্তকে স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। স্বামীজীর পরে আমরা একে একে প্রণাম করিয়া আসিয়া সকলে ঘরের বাহিরের দালানে বসিলাম। শ্রীমা ও কৃষ্ণলাল ভিতরে রহিলেন। স্বামীজী আবদার করিয়া বলিলেন ঃ "মা, এই তো তোমার ঠাকুর! কাশ্মীরে একটা ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত-যেত বলে সে শাপ দিলে, 'তিনদিনের ভেতর ওকে হাগতে হাগতে এখান ছেড়ে যেতে হবে'—আর কিনা তা-ই হলো—আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলুম না! তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলে না!" শ্রীমা উত্তর দেওয়াইলেন ঃ "বিদ্যা; বিদ্যা মানতে হয় বইকি,

বাবা ! সব বিদ্যাই বিদ্যা, ওঁরা তো আর ভাঙতে আসেন না। আমাদের ঠাকুর তো হাঁচি-টিকটিকি পর্যন্ত মেনেছেন। শঙ্করাচার্যও তো শুনতে পাই নিজের শরীরে ব্যাধিকে আসতে দিয়েছিলেন। তোমার শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের নিজের শরীরে আসা একই কথা।" স্বামীজী বলিলেন ঃ "ও তুমি যতই বল না কেন, আমি তোমার কথা মানি না। বামুনটা কিছুই নয়।" শ্রীমা উত্তর করাইলেন ঃ "না মেনে থাকবার জো আছে কি, বাবা ? তোমার টিকি যে [তাঁর কাছে] বাঁধা !" স্বামীজী সজলনয়নে উঠিলেন আর শ্রীমায়ের চরণদ্বয় জড়াইয়া অল্পক্ষণ থাকিয়া নামিয়া আসিলেন। আমরা সকলে তাঁহার অনুগমন করিলাম। কৃষ্ণলাল প্রসাদ আনিয়া দিলে তিনি উহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া ভক্ষণ করিলেন।

আজ শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা। ইতঃপূর্বে নূতন মঠবাটী নির্মিত হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটী ছাড়িয়া মঠবাসীরা নিজস্ব বাটীতে (বর্তমান মঠে) উঠিয়া আসিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতা ও মার্কিন মহিলাদ্বয় মঠবাটীর নির্মাণকার্য আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতে বালিতে রিভার টমসন স্কুলবাড়ির নিকটে গঙ্গার ধারে একখানি সুন্দর ছোট একতলা বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে মার্কিন মহিলাদ্বয়ের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে ভগিনী বসুপাড়া লেনের ১৬ নং বাটী ভাড়া করিয়াছেন—বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য।[৫]

শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা বলিয়া মঠবাসীদের আজ আনন্দের দিন। সকলেই অতি প্রত্যূষে উঠিয়াছেন। সকলেরই মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছে। রাখাল মহারাজের আদেশে মঠের ও ঠাকুরবাটীর দ্বারদেশে মঙ্গলঘট ও কলাগাছ স্থাপিত হইয়াছে। নন্দলাল একাধারে ভাণ্ডার ও ঠাকুরপূজার আয়োজনে ব্যস্ত। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ক্ষীণশরীরে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। শরৎ মহারাজ মঠের তত্ত্বাবধায়ক—নিজে মঠবাটী, ঠাকুরবাটী, রান্নাবাড়ি, ভাণ্ডার ইত্যাদি

---

৫ এই বাড়িতে বালিকা বিদ্যালয়টির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১৩ নভেম্বর, রবিবার, ১৮৯৮—শ্যামাপূজার দিন। শ্রীশ্রীমাই তার উদ্বোধন করেন।—সম্পাদক

পরিষ্কার করাইয়া বেড়াইতেছেন। স্বামীজী মঠেই আছেন। সকলেই নিজ নিজ কার্যে অতিশয় ব্যস্ত। আজ শ্যামাপূজায়[৬] মঠে স্বয়ং মহামায়া আসিতেছেন। তাই আজ মঠবাসীদের মনে আনন্দ আর ধরে না।

দেখিতে দেখিতে শ্রীমায়ের নৌকা মঠের জমিতে আসিয়া লাগিল। তাঁহার সঙ্গে পূর্ববৎ সকলে আসিয়াছেন। অধিকন্তু সারদা মহারাজও আসিয়াছেন। ক্রমে মাস্টার মহাশয় (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-প্রণেতা 'শ্রীম'), কিশোরীবাবু (ওরফে আব্দুল) ইত্যাদি আসিয়া উপস্থিত [হইলেন]।

শ্রীমা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সকলের প্রণাম গ্রহণপূর্বক হস্তপদাদি ধৌত করিয়া সোজা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আত্মারামের পূজায় বসিয়া গেলেন। শ্রীঠাকুরের শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত বেদিমধ্যস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের কাষ্ঠদ্বার আজ উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। শ্রীমা সেই প্রকোষ্ঠাভ্যন্তর হইতে আত্মারামকে[৭] স্বহস্তে বাহির করিয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা করিতে বসিয়া গেলেন। তাঁহার দুইটি চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে থাকিল। হস্তদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। বহুক্ষণ আত্মারামকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন।

তাঁহার এই আত্মস্থ হইবার সংবাদ বৈদ্যুতিকগতিতে মঠবাসীদের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল। ফলে সকলে আনন্দে অধীর হইয়া নিম্নে বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া খোল-করতাল সহকারে গাহিতে ও নৃত্য

---

৬ স্বামী গম্ভীরানন্দ-কৃত শ্রীশ্রীমার জীবনী ('শ্রীমা সারদা দেবী', 'মায়ের ভারী' শীর্ষক অধ্যায়, ১৩শ সং, ১৪০১, পৃঃ ১৪৩-১৪৪) অনুসারে শ্রীশ্রীমা শ্যামাপূজার দিন নয়, তার পূর্বদিন (১২ নভেম্বর, শনিবার, ১৮৯৮) মঠে পদার্পণ করেছিলেন এবং নতুন মঠে (বেলুড় মঠে) শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাদি করেছিলেন।—সম্পাদক

৭ শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার অস্থি একটি তাম্রকৌটায় স্থাপিত হইয়া তদবধি মঠবাসীদের দ্বারা নিত্য পূজিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে উহা বেদির ঐ প্রকোষ্ঠে রাখা হইয়াছে। স্বামীজী উহাকে 'আত্মারাম' আখ্যা দিয়াছেন।

করিতে থাকিলেন। সকলে বেড়িয়া বেড়িয়া গাহিতেছেন আর নৃত্য করিতেছেন। সঙ্গে খোল-করতাল বাজিতেছে। কেহ বাদ পড়েন নাই —সকলে একত্রিত। একতানে প্রাণ মাতাইয়া এবং নিজেরাও মাতিয়া গাহিতেছেন—

"বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে।
আয় সবাই মিলে, ডাকি 'জয় মা' বলে॥
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলী মেয়ে,
কত রাঙ্গা মা ওরে দেখরে চেয়ে,
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছিরে, আমরা মায়ের ছেলে।"

স্বামীজী এতক্ষণ উপরে নিজ কক্ষে ছিলেন। নৃত্যগীত শুনিয়া আর থাকিতে না পারিয়া নিচে আসিয়া দলে ভিড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলের ভিতর অমানুষিক শক্তি জাগিয়া উঠিল; সকলে আত্মহারা হইয়া 'বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে' ইত্যাদি আখর দিয়া দিয়া গাহিতে লাগিলেন। স্বামীজী উৎসাহ দিয়া বলিলেন ঃ "গা, গা।" যাঁহারা নাচিতেছেন তাঁহাদের অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া নাচিতে উৎসাহ দিলেন। এইবার নিজেই খোল লইয়া বাজাইতেছেন, আর গাহিতেছেন আর নাচিতেছেন। এ এক অপূর্ব দৃশ্য—ইহা যে দেখিয়াছে, সে-ই ধন্য! অনেকক্ষণ ঐভাবে চলিয়া শেষে খোলধ্বনি ঠায়ে হইল। গীতও সেই অনুপাতে ঠায়ে হইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে সমবেত কণ্ঠে গীত হইতে থাকিল—

"বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে। ..."

প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পূজার পর শ্রীমা বস্ত্রাঞ্চল গলদেশে জড়াইয়া ভূমিতে মস্তক ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন আর সেই কম্পিত হস্তে আত্মারামকে প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিলেন। প্রকোষ্ঠে চাবি পড়িয়া গেল।

বৈকালে ভগিনী নিবেদিতা আসিলেন। শ্রীমা যখন বসুপাড়া লেনে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার নৌকার সঙ্গে অপর একখানি

নৌকায় স্বামীজী, রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজকে নিবেদিতা লইয়া গেলেন এবং উক্ত ১৬ নং বসুপাড়া লেনের বাটীতে তাঁহাদের উপস্থিতিতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন।[৮]

কিছুদিন পরে যোগীন মহারাজের অসুখ করিল। অসুখ ক্রমে বৃদ্ধির দিকে গেল। নিত্যের আহার ত্যাগ হইল, ডাক্তার দেখিতে থাকিল। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এবং শশিভূষণ ঘোষ [রোগী] দেখিয়া ব্যাধিকে গ্রহণী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। বড় বড় কবিরাজ আসিলেন। কিছুতেই উপসম হইল না।

কৃষ্ণলাল একাকী সেবা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। মঠ হইতে লেখক আসিল—তাঁহার সাহায্যে। দিবাভাগে কৃষ্ণলাল ও লেখক এবং রাত্রে সারদা মহারাজ সেবায় রত হইলেন। সারদা মহারাজ দিনে কম্বুলিয়াটোলায় উদ্বোধন প্রেসের পরিচালনা করেন আর রাত্রে আমাদিগকে আরাম দিবার উদ্দেশ্যে যোগীন মহারাজের সেবায় থাকেন। কৃষ্ণলাল শ্রীমায়ের [দীক্ষিত] সন্তান হইলেও যোগীন মহারাজের বিশেষ অনুরক্ত। মলমূত্র পরিষ্কারের কার্য অপর কাহাকেও না দিয়া নিজেই করেন। লেখক বেঞ্জর্স ফুড তৈয়ার, রোগীকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য দেওয়া এবং অপর সাধারণ পরিচর্যার কার্যে লাগিল। কার্য হইতে অবসর পাইলেই উপরে শ্রীমার নিকটে যাই এবং রোগীর অবস্থা তাঁহাকে জানাই। তিনি আগ্রহ-সহকারে শুনেন। তিনি নানা কথা কহিতে থাকেন। চলিয়া আসিবার সময় খাইতে দেন। তখন শ্রীমার নিকটে স্ত্রী বা পুরুষ ভক্ত খুব কমই আসিতেন। শ্রীমায়ের সংসারের আয়ও খুব কম ছিল—কোনরূপে ব্যয় নির্বাহ হইত। একদিন উপরে গিয়া দেখি একটি স্ত্রীভক্ত বসিয়া আছেন। [আমাকে] দেখিবামাত্র তিনি শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "এটি কি আমাদের মহারাজের ভাই ?" শ্রীমা তাঁহাকে "হ্যাঁ" বলিয়া [লেখকের

---

৮ স্বামী গম্ভীরানন্দ-কৃত জীবনী (পৃঃ ১৪৪) অনুসারে এটি শ্যামাপূজার দিনের (১৩ নভেম্বর ১৮৯৮) ঘটনা। (৫ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য)—সম্পাদক

সহিত] তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। বলিলেন ঃ "এটি মেনির মা, বড় ভক্তিমতী।" উত্তরকালে আমাদের দিনকয়েক মেনির মার কিল খাইতে হইয়াছে।

যোগীন মহারাজের অসুখ ক্রমশঃ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। কথা কহিবার শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। অতি ক্ষীণস্বরে কথা কহিতে থাকিলেন। সকলে উৎকণ্ঠিত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীমা অতিমাত্র ভাবিতা হইলেন। মঠ হইতে গুরুভাইয়েরা আসিয়া [যোগীন মহারাজকে] দেখিয়া যাইতে থাকিলেন। একদিন তাঁহার পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও দেখিয়া গেলেন। আমরা প্রাণপণে সেবা করিতে থাকিলাম।

এইসময় একদিন পূর্ব-পূর্ব দিনের মতো প্রাতে শ্রীমার পূজার নিমিত্ত মালীর দেওয়া ফুল লইয়া উপরে গিয়া দেখি, শ্রীমা নিজঘরে পশ্চিমাস্যা হইয়া পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন আর তাঁহার গণ্ডযুগল বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাঁহাকে ঐভাবে দেখিয়া মনে হইল, তিনি রোগীর জন্য কাঁদিতেছেন। যাহা কিছু ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আসিল, তাহা দিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম। তিনি শুনিলেন কিনা জানি না। কিছুক্ষণ পরে অধীর হইয়া বলিলেন ঃ "আমার ছেলে-যোগেনের কি হবে, বাবা?" উত্তর দিলাম ঃ "ভাবছেন কেন মা, সেরে যাবে বইকি।" তিনি বলিলেন ঃ "আমি যে দেখিছি, বাবা।" "কি দেখেছেন?" তিনি বলিলেন ঃ "ভোরবেলা দেখলুম, ঠাকুর নিতে এসেছেন।"—বলিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া আমারও চক্ষে জল আসিল। পরক্ষণে আবার সতর্ক করিয়া দিলেন ঃ "কাউকে বলো না—বলতে নেই।" উত্তর করিলাম ঃ "আচ্ছা মা, বলব না।" প্রতিশ্রুত হইলাম বটে এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে

---

৯ রাজবালা ঘোষ। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। তাঁর পুত্র নরেশচন্দ্র ঘোষও (ডাকনাম গৌর) ছিলেন শ্রীশ্রীমার শিষ্য। তাঁর দিদির নাম মেনি।—সম্পাদক

এপর্যন্ত কাহাকেও বলিও নাই সত্য, কিন্তু আজ কেন জানি না, লেখনী দ্বারা বাহির হইয়া গেল। আবার বলিতে লাগিলেন ঃ "যোগেন যে আমার ছেলে—সারদা যেমনটি, যোগেনও তেমনটি"[১০] ইত্যাদি।

অনেক বুঝাইতে শ্রীমা পূজায় বসিলেন দেখিয়া নামিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, রোগীর অবস্থা অতীব খারাপ হইয়াছে। সারদা মহারাজ সেদিন আর উদ্বোধনের কার্যে গেলেন না। ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ সারদা মহারাজকে আলাদা লইয়া গিয়া কি যেন বলিলেন। দ্বিপ্রহর হইতে অবস্থা ভীষণাকার ধারণ করিতে থাকিল। তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি।[১১] অপরাহ্ণে দেখা গেল, রোগী সত্যসত্যই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। মঠে খবর গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রোগীর মুখ এক অপূর্ব জ্যোতিতে ভরিয়া উঠিল। কৃষ্ণলাল শিয়রে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহার শব্দে উপরে শ্রীমা চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে কখনও শ্রীমাকে চেঁচাইয়া কথা কহিতেও শুনি নাই। আজ তাহার ব্যতিক্রম হইল। তাঁহার আর্তনাদে ব্যথিত হইয়া গিয়া শ্রীচরণ দুইটি জড়াইয়া চুপ করিতে অনুনয়-বিনয় করিলাম। কোন ফল ফলিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ "তুমি যাও, যাও, আমার যোগেন আমায় ফেলে চলে গেল!"

মঠ হইতে সাধুরা আসিয়া পৌঁছিলেন। খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) স্বহস্তে যোগীন মহারাজের শরীরে বিভূতি লেপন করিয়া পূজান্তে আরতি করিলেন। ক্রমে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের[১২] কতিপয় সভ্য আসিয়া যোগদান করিলেন। শবদেহ পুষ্পে,

১০ ইতিপূর্বে শ্রীমার নিকট শুনিয়াছি যে, যোগীন মহারাজ ও সারদা মহারাজ শ্রীঠাকুরের সন্তান হইলেও শ্রীমায়ের নিকট দীক্ষিত।

১১ স্বামী যোগানন্দ দেহত্যাগ করেন ১৫ চৈত্র ১৩০৬ তারিখে (২৮ মার্চ ১৮৯৯)।—সম্পাদক

১২ কিছু পূর্বে স্বামীজী কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার অধিবেশন ধারাবাহিকরূপে রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরামবাবুর বাটীর উপরের হলঘরে প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে হইয়া আসিতেছে। যোগীন মহারাজ একবার একটি [অধিবেশনে] ছোটখাট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অন্যান্য বক্তাদের নাম—নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ইত্যাদি। সভ্যগণের মধ্যে অগ্রণী শরৎ সরকার, চূণিলাল বসু, অসীমকুমার বসু ও শৈলেন্দ্র।

গন্ধে ও মাল্যে ভূষিত হইয়া খট্টোপরি স্থাপিত হইল। সারদা মহারাজকে শ্রীমার বাটীতে রাখিয়া বাকি সকলেই শবদেহের অনুগমন করিলেন।

রাত্রি তখন আন্দাজ নয়টা, যখন স্বামী যোগানন্দের নশ্বর দেহ শোভাযাত্রা সহকারে কাশী মিত্রের ঘাট অভিমুখে গুরুগম্ভীর "হরি ওঁ তৎ সৎ" ধ্বনিতে কলিকাতার বাগবাজার পল্লী বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ কর্তৃক প্লাবিত করিয়া নীত হইতে লাগিল। সেই অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যে এবং অশ্রুতপূর্ব ধ্বনিতে পল্লীস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আকৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিতে থাকিল আর সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল ইহা কলিকাতার পক্ষে এক অভিনব দৃশ্য।

যথাসময়ে শবদেহ চিতোপরি স্থাপিত হইয়া সন্ন্যাসিবৃন্দ কর্তৃক অগ্নিসংযুক্ত হইয়া [তাঁহাদের] সমবেত কণ্ঠে

"বায়ুরনিলমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং।
ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর ॥"

ইত্যাদি দেবমন্ত্রে শ্মশানভূমি মুখরিত হইতে থাকিল আর দেখিতে দেখিতে স্থানটি চিতাভস্মে পরিপূর্ণ হইল।

ভস্মস্তূপ পবিত্র ভাগীরথী-জলে ধৌত হইতেছে, এমন সময় নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র থিয়েটার হইতে তথায় আসিলেন আর দুই বিন্দু শ্রদ্ধাশ্রু দ্বারা সেই ধৌতকার্যে সহায়তা করিলেন।

সব শেষ হইলে খোকা মহারাজ কতিপয় অস্থি সংগ্রহ করিয়া লইলেন এবং সযত্নে বহন করিয়া আনিলেন। উহা একটি কৌটায় রক্ষিত হয়। পরে যোগীন মহারাজের একখানি তৈলচিত্র করাইয়া ঠাকুরঘরের বাহিরের দালানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়।

পরদিন শ্রীমাকে দুঃখের সহিত বলিতে শুনিয়াছি—"বাড়ির একখানা ইট খসল।"

যোগীন মহারাজের দেহত্যাগ হইতে শ্রীমার বাটীতে কৃষ্ণলালই রহিলেন এবং সারদা মহারাজ নিত্য রাত্রে উদ্বোধন হইতে ফিরিয়া থাকিতে লাগিলেন।

পরে আবশ্যক হইবে বলিয়া শ্রীমার ভ্রাতাদের বিষয় কিছু এখানে দিতেছি। তাঁহারা, বিশেষতঃ বড় ও সেজ—পূজারী ব্রাহ্মণ। ঐ দুই ভাই পালা করিয়া কলিকাতায় পূজা করিয়া থাকেন এবং নিজেদের থাকিবার জন্য চোরবাগানে একটি বাসা ভাড়া করিয়াছেন। ঐ বাসায় শ্রীমার ছোট ভাই অভয়কুমারও[১৩] থাকেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্যাম্বেলে ডাক্তারি শিক্ষা লাভ করেন।

যোগীন মহারাজের দেহত্যাগের পর অভয়কুমার বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার অসুখে শ্রীমা পালকি করিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। রোগীর সেবা শরৎ মহারাজ ও সুশীল মহারাজ করেন। শ্রীমার মুখে শুনিয়াছি, "এত ঘন ঘন বাহ্যে হয়, সরা আনবার তর সয়নি, শরৎ ও সুশীলকে কতবারই না হাতে করে বাহ্যে ধরতে হয়েছে।" এই ভাইটিকে শ্রীমা খুব ভালবাসিতেন। অতএব তাঁহার মৃত্যুতেও শ্রীমাকে ব্যথিতা হইতে হইয়াছিল।[১৪]

যোগীন মহারাজের দেহত্যাগে, অর্থাৎ শ্রীমায়ের একটি অন্তরঙ্গের তিরোধানে এবং তৎপরে [কিঞ্চিদধিক চারমাস পরে] ভ্রাতা অভয়কুমারের মৃত্যুতে তিনি এতদূর ব্যথিতা হইয়া পড়েন যে, আর কলিকাতায়, বিশেষতঃ ঐ বাটীতে, থাকিতে পারিলেন না। অগত্যা সারদা মহারাজ তাঁহাকে জয়রামবাটীতে (শ্রীমার জন্মভূমিতে) লইয়া গেলেন।

বর্ধমান হইয়া তাঁহারা যাইতেছেন—পথিমধ্যে যে ঘটনা ঘটে, তাহা শ্রীমার মুখে যেমনটি পরে শুনিয়াছি, তেমনটি এখানে নিজের ভাষায় লিখিলাম।

দামোদর পার হইয়া শ্রীমা পালকির অভাবে গরুর গাড়িতে চলিয়াছেন আর সারদা মহারাজ লাঠি কাঁধে গাড়ির আগে হাঁটিয়া

---

১৩ প্রকৃত নাম—অভয়চরণ। (দ্রঃ 'শ্রীমা সারদা দেবী', পৃঃ ১৬)—সম্পাদক

১৪ অভয়চরণের মৃত্যু হয় ২ আগস্ট ১৮৯৯ (১৮ শ্রাবণ ১৩০৬)। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছিলেন।—সম্পাদক

চলিয়াছেন। রাত্রিকাল—অর্ধরাত্রির উপর—প্রায় তৃতীয় প্রহর—শ্রীমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সারদা মহারাজ চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন, রাস্তার খানিকটা একস্থানে বানের জলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সেখানে এমন একটা খানা পড়িয়াছে যে, সেখান দিয়া গাড়ি যাইবার আদৌ উপায় নাই। যাইতে গেলে গাড়ির চাকা সেখানে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঝাঁকানিতে শ্রীমার নিদ্রা তো ভাঙ্গিয়া যাইবেই অধিকন্তু তাঁহার আহত হইবারও সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে গাড়িখানি অনায়াসে যায় এবং শ্রীমার নিদ্রাও না ভঙ্গ হয়, এরূপ একটি উপায়স্বরূপ মতলব আঁটিয়া [সারদা মহারাজ] নিজে উপুড় হইয়া ঐ খানায় শুইয়া পড়িলেন। কেহই জানিতে পারিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁহার স্থূল শরীরের উপর দিয়া গাড়িখানি চলিয়া যাইবে। উদ্দেশ্য অবশ্য তাঁহার মহৎ ছিল, কিন্তু একবার ভাবিলেন না যে, ঐরূপ করায় তাঁহার মৃত্যু তো অনিবার্য—অধিকন্তু সেই জনমানবহীন স্থানে এবং গভীর নিশাকালে তিনি ব্যতীত শ্রীমাকে কে দেখিবে—কে শ্রীমার রক্ষণাবেক্ষণে মোতায়েন হইবে?—তিনি যে সে-ভার লইয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।

একটা কথা আছে—ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গাড়িখানি খানার নিকটবর্তী হইলে শ্রীমার অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় চন্দ্রালোকে তিনি দেখিতে পাইয়া ব্যাপারটা সব বুঝিলেন। চিৎকার করিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিয়া স্বয়ং অবতরণ করিলেন এবং সারদা মহারাজকে তাঁহার কৃতকর্মের জন্য যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া হাঁটিয়া খানাটি পার হইলেন। গাড়িও খালি হওয়ায় উহা নির্বিঘ্নে পার হইয়া আসিল—অবশ্য সারদা মহারাজকে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। পরবর্তী কালে শ্রীমা সারদা মহারাজের নিষ্ঠা ও গুরুভক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়া এই গল্পটি আমাদের নিকট করেন।

শ্রীমার জয়রামবাটী অবস্থানকালে একবার আমাদের সাধ হয় তথায় যাইতে। ঐ উদ্দেশে সারদা মহারাজের নিকট গিয়া প্রস্তাব

করিলে তিনি উৎসাহ দেন এবং স্বয়ং আটা, ময়দা, চিনি, মিছরি, নারিকেল তৈল, আম, মিষ্ট ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া একটি বড় ঝুড়িতে প্যাক করিয়া দিলেন। বর্ধমানের পথে চটিগুলির নাম ও তাহাদের দূরত্ব হিসাবে ব্যবধান, কোথায় আহার্য কি পাওয়া যায় সে-সমস্তের একটি তালিকাও লিখিয়া দিলেন। লেখকের সঙ্গে বন্ধুবর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীও চলিলেন।

বর্ধমানে বন্ধুবরের এক আত্মীয় রাজ কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার বাসায় প্রথম রাত্রি যাপন করি। পরদিন প্রাতে দামোদর পার হইয়া একখানি গরুর গাড়ি ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর পর্যন্ত ভাড়া করিয়া মধ্যাহ্নে উচালন নামে চটিতে অধ্যাপক-প্রদত্ত সামগ্রীতে দ্বিপ্রহরের ভোজন সারিয়া লই। সেদিন রাত্রি কাটাই দ্বারকেশ্বর-তীরে একলখী নামক চটিতে। তৎপরদিন মধ্যাহ্নের পূর্বে কামারপুকুর পৌঁছি।

কামারপুকুরে শ্রীঠাকুরের বাটীতেই গিয়া উঠিলাম। তখন সেখানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাম ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ঠাকুরের বাল্যলীলাস্থলগুলি সব দেখিলাম। রঘুবীরের মন্দির, হালদারপুকুর, ভূতির খাল, শিবের মন্দির ইত্যাদি সবই দেখিলাম। সেদিন এখানে হাট ছিল। হাট হইতে শ্রীমায়ের বাটীর জন্য বাজার করিয়া একটি মুটের মাথায় চাপাইয়া বৈকালে জয়রামবাটীর জন্য যাত্রা করিলাম। পথে আমোদর নদী পার হইয়া হলদি ও পুকুরে গ্রাম ছাড়াইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীমার নিকট পৌঁছিলাম। ধূলাপায়ে প্রণাম করিলাম। তাঁহার খুব আনন্দ আমাদের পাইয়া। আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি ময়দায় জল দিয়া কুটনা কুটিতে বসিলেন। অচিরে লুচি, ছোলার ডাল, আলুর দম, কুমড়ার অম্বল এবং দুধ খাইতে পাইলাম। নিজে বসিয়া খাওয়াইলেন এবং পরিবেশনও করিলেন। [শ্রীমার] শ্রীহস্তের রান্না জীবনে এই প্রথম খাইলাম ঃ উপাদেয় লাগিল—ঠিক কলিকাতার রান্নার মতো। উপাদেয় লাগিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে দুঃখ হইল [এই] ভাবিয়া [যে], শ্রীমাকে আমাদের জন্য কত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। অতএব খাইতে খাইতে তাঁহার

সহিত [মধুর] বাদানুবাদ হইতে থাকিল। বলিলাম ঃ "আমরা চাইনা যে আমাদের জন্য আপনাকে পরিশ্রম করতে বা উদ্বিগ্ন হতে হয়—আপনাকে এসব কিছুই করতে হবে না। আমাদের ভাত খাওয়া অভ্যেস আছে—সকলের মতো ভাতই খাব।" তিনি বলিলেন ঃ "ছেলের জন্য মা করবে না তো করবে কে?" আরও কত কি ঐ রকমের বলিতে থাকিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন আমরা অটল, তখন অগত্যা চুপ হইয়া গেলেন। পরদিন হইতে মামীদের রান্না-ভাত খাইতে লাগিলাম।

ঠিক এই রকমের তর্ক আর একবার শ্রীমায়ের সঙ্গে করিতে হয়। সেবার কালীকৃষ্ণ মহারাজ (স্বামী বিরজানন্দ) সঙ্গে ছিলেন। সেদিনও প্রথম রাত্রে [শ্রীমা] শ্রীহস্তে রন্ধন করিয়া পুরি ইত্যাদি খাইতে দেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে শ্রীমা নিজ কক্ষে বিশ্রাম করিতে করিতে কথা কহিতেছিলেন। সময় বুঝিয়া তাঁহার এক সন্তানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "—কেন আপনাকে প্রণাম করিতে আসিতে পাইতেন না?" পূর্বে এবিষয় সবই মঠে শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহার শ্রীমুখে শুনিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম। ঘরে শ্রীমা ও লেখক ব্যতীত তখন আর কেহই ছিলেন না। তিনি উত্তর দিলেন ঃ "আমায় পেন্নাম করতে এসে একখানা ছুরি বার করে নিজের গলায় বসিয়ে দিতে গিয়েছিল যে!" তর্ক করিতে লাগিলাম ঃ "মা, আপনি বুঝুন, কাজটা তাঁর খারাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ আদৌ ছিল না। সাধনার বিঘ্ন হচ্ছিল, মন ধ্যানে-জপে বসছিল না, তাই না তিনি আপনার সৃষ্ট প্রাণ আপনারই পাদপদ্মে আহুতি দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন!" শ্রীমা বলিলেন ঃ "তুমি আর বকো না। আমায় কি পাষাণ পেয়েছিল, না কালীঘাটের কালী পেয়েছিল, যে বলি দিতে এয়েছিল! সেই থেকে তার আসা বন্ধ করে দিয়েছিলুম।"

"সেসময় আপনি খুব কঠোর হয়েছিলেন। পরে কিন্তু আপনাকে আবার নরম হতে হয়েছিল; অর্থাৎ তখন নিজের ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়েছিলেন, পরে আবার এই স্নেহময়ী মূর্তিতে প্রকট হতে হয়েছে!"

শ্রীমা (হাসিতে হাসিতে)—"তুমি আর বকো না। ছেলেরা অনেক বলায় আসতে দিই—একা আসতে পায় না—কোন না কোন ছেলে সঙ্গে থাকে আর পেন্নাম করেই চলে যায়।"

যাইহোক, প্রথমবার জয়রামবাটীতে আমাদের থাকিতে থাকিতে শ্রীমার ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীর বিবাহ হয়। পাত্রটি হুগলী জিলার গোহাট গ্রামনিবাসী। নাম—প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। এই প্রমথনাথের বিষয় আমাদের পরে বলিতে হইবে বলিয়া নামটা এখানে করিয়া রাখিলাম। মামারা (শ্রীমার ভ্রাতৃবর্গ) শ্রীমাকে দিয়া আমাদের উভয়কে (আমাকে ও মোক্ষদাচরণকে) আদেশ করাইলেন, যাহাতে আমরা বিবাহ-আসরে বরযাত্রীদের সহিত তর্ক করি। এসময়ও পল্লীগ্রামে বিবাহ-আসরে বর ও কন্যাপক্ষে তর্কাতর্কি করার প্রথা বলবৎ ছিল। বিবাহরাত্রে আমাদের শয়নের জন্য নিকটে ভানি-পিসির ঘরে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ভানি-পিসি সেরাত্রে শ্রীমার বাটীতে থাকিল এবং সেহেতু তার ঘর শূন্য থাকায় আমরা সেখানে শয়ন করিলাম। অর্ধরাত্রে বর আসিলে ভানি-পিসি প্রদীপহস্তে গিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া আনিল।

আমরা আসিয়া আসরে বসিয়া বরযাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ইংরেজীতে তর্ক করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা? উত্তরে জানা গেল, তাঁহাদের কেহই ইংরেজী জানেন না। সংস্কৃতের বিষয় মোক্ষদাচরণের পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ একই উত্তর পাওয়া যায়। অগত্যা তাঁহাদের অনুরোধে মোক্ষদাচরণ 'বিবাহ' অর্থে কি বুঝায়, শাস্ত্রানুসারে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন।

নলিনীর বিবাহের পূর্বে ও পরে যে কয়দিন জয়রামবাটীতে ছিলাম, প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে শ্রীমার ভোজনের পর বিশ্রামকালে তাঁহার ঘরে যাইতাম এবং অনেক কথা তিনি কহিতেন। তন্মধ্যে তথ্যপূর্ণ চিত্তাকর্ষক কথাগুলির উল্লেখ এখানে করিতেছি। কথাগুলির অধিকাংশ পূর্ব হইতে জানা ছিল, কিন্তু তাঁহার মুখে শুনিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করি, আর তিনি উত্তর দিতে থাকেন।

শ্রীমা—হ্যাঁ, সারদাকে নহবতখানায় ঠাকুর পাঠান। আমার কাছেই

মন্ত্র নেয়। ছেলে-যোগেনও নেয়। তবে সে বড় নাজুক ছিল কিনা—ভুলে গিয়েছিল—আবার বৃন্দাবনে দিতে হয়।

"সারদাকে পয়সা দেবার কথা বলছ ?—আমার যে প্রাণ ঠাকুরের কাছে পড়ে থাকত ! তাঁর ঘরে কি হচ্ছে, তিনি সেখানে কাকে কি বলছেন—আমি নহবতে বসে সব জানতে শুনতে পেতুম। সারদা বাড়ি যাবে—তাকে গাড়িভাড়া[১৫] নহবত থেকে নিতে বলেছেন—আমি তখনই চারটি পয়সা নহবতের দরজার গোড়ায় রেখে দিয়েছি, আর সরে গেছি—তাই সারদা এসে পয়সা দেখতে পেয়ে নিয়ে যায়।

"নরেনেরও তাই। তাকে যখনই বলেছেন, 'তুই আজ এখানে থাকবি', অমনি তাই শুনে ছোলার ডাল চড়িয়ে দিয়েছি। তিনি বাহ্যে যাবার সময় নরেনের খাবার কথা বলতে এসে দেখেন, ডাল সেদ্ধ হচ্ছে আর ময়দায় জল পড়ে গেছে। আমায় যে বলে রেখেছিলেন, নরেন যেদিন খাবে [সেদিন] তার জন্যে মোটা মোটা রুটি আর ছোলার ডাল রাঁধতে। সে সব হজম করতে পারে—মুগের ডাল আর পাতলা পাতলা রুটি যেন না হয়।

"হ্যাঁ বাবা, নহবতে যে কি করে কাটিয়েছি, তা কে বুঝবে ! নটীর মা[১৬], মেয়ে-যোগেন, গোলাপ, যে-যে দেখেছে, সব্বাই বলত, 'মা, এইটুকু ঘরে কি করে থাক ?' ঘর তো দেখেছ ?—ঐটুকু ঘরে মাথার ওপরে সব সিকে ঝুলছে—গেরস্থ ঘরে মানুষের যা-যা দরকার—মসলা-টসলা সব—এমনকি ঠাকুরের জন্যে মাছ পর্যন্ত জিয়োনো থাকত, সিধে হয়ে দাঁড়াবার যো ছিল না—দাঁড়াতে গেলেই মাথায় লাগত—মাথাটা আমার লেগে লেগে ফুলে গিয়েছিল। মেজেয় আবার চাল, ডাল, হাঁড়ি-কুঁড়ি, শিল, নোড়া, চাকি, বেলুন, উনুন সবই

---

১৫ বরাহনগর বাজার হইতে বিডন স্কোয়ার পর্যন্ত শেয়ারের ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া তখন ছিল এক আনা। সারদা মহারাজকে ঠাকুর ঐ পয়সা শ্রীমার নিকট [হইতে] লইতে বলেন।

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা শ্রীম'র ধর্মপত্নী। নটী উঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ডাকনাম।

আছে—বাকি কতটুকুই বা জায়গা থাকে—তাতেই উঠতুম বসতুম, আবার কোন মেয়েকে ঠাকুর যদি বললেন থাকতে—সেও আমার সঙ্গে সেইটুকুর ভেতর শুত, হয়তো তাকে শুইয়ে আমায় বসে রাত কাটাতে হয়েছে!

"হ্যাঁ। মন্দিরের কারুর ওঠবার আগে উঠতুম। তখন বেশ রাত্তির থাকত। কেউ আমায় কখনো দেখতে পায়নি। সব কাজ সেরে নিয়ে গঙ্গায় নেয়ে নিতুম। প্রথম প্রথম বড় ভয় করত, কিন্তু পরে দেখি কি—আমার নাইবার সময় নহবত থেকে একটা আলো সিধে গঙ্গা পর্যন্ত দেখা দিত আর সেই আলোয় আমি নেয়ে আসতুম—আমারও নেয়ে ফিরে আসা আর আলোও নিবে যাওয়া।

"বাগদী আর বাগদী-বৌএর কথা বলতে বলছ? [জয়রামবাটীর] ভূষণ মোড়লকে তো দেখেছ? ওর মা আর কতকগুলো মেয়ে সব গঙ্গা নাইতে যাবে। আমি ধরে বসলুম—আমাকেও সঙ্গে নিতে। আমি মনে করলুম, ওরা সব গঙ্গা নেয়ে ফিরে আসবে, আর আমি ঠাকুরের কাছে রয়ে যাব। আমায় যেতে দেখে লক্ষ্মী (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী) আর শিবু (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) আমার সঙ্গ নিলে। কামারপুকুর থেকে জাহানাবাদ [বর্তমান আরামবাগ] পর্যন্ত গেলুম। সাথীরা তখন দিন আছে দেখে সেখানে রইল না—এগিয়ে চলল। বললে, তেলো-ভেলোর মাঠ সন্ধ্যের আগে পেরিয়ে যাবে। আমি কিন্তু আর চলতে পারলুম না। কষ্ট হতে লাগল। পেছিয়ে পড়লুম—কখনো তো ওদের মতো চলা অভ্যেস নেই। তবুও ধিকিধিকি চলতে লাগলুম। একা সেই তেপান্তরের মাঠে চলেছি। ওখানে বড় ডাকাতের ভয়। অনেক গল্প ছেলেবেলায় শুনেছি। সন্ধ্যে হয়ে গেল, তবু চলেছি; গা ছমছম করছে, এমন সময় দেখতে পেলুম, সামনে থেকে একটা লোক—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, হাতে রূপোর কড়া—খুব ঢেঙ্গা—লাঠি হাতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালুম। গোটা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। লোকটা জাতে বাগদী—ডাকাতের মতো রুক্ষ কথায় জিজ্ঞেস করলে, 'তুই

কে ?' আর আমার পানে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। বউটাও এসে পড়ল। তাকে মেয়েমানুষ দেখে তবু আমার সাহস হলো। বললুম—'বাবা, আমি সারদা—তোমাদের মেয়ে—তোমাদের জামায়ের কাছে যাচ্ছি—সাথীরা সব এগিয়ে পড়েছে—আমায় দয়া করে পৌঁছে দাও।'"

শ্রীমা আরও বলিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়ে বলিলাম ঃ "ডাকাত-বাবার গল্প আর করতে হবে না, মা—যে-কেউ ঠাকুরের জীবনী পড়েছে, সে-ই ওসব জানে। আমি যা জানতে চাই, তা-ই বলুন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কি ?"

"ডাকাত আপনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখেছিল ?"

শ্রীমা—পরে বলেছিল—কালীরূপ নাকি দেখেছিল।

"তাহলে আপনি তাকে কালীরূপে দেখা দিয়েছিলেন ? লুকোবেন না মা, বলুন।"

শ্রীমা—আমি কেন দেখাতে যাব ? সে বললে, সে দেখেছে।

"তাহলেই হলো—আপনি দেখিয়েছিলেন। তা না হলে সে আর কোন স্ত্রীলোককে দেখলে না—আপনাতেই দেখলে ? আপনি স্বীকার করুন আর না করুন, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আপনি দেখিয়েছিলেন।"

শ্রীমা (সহাস্যে)—তা তুমি যা-ই বল না কেন।

লেখক বুঝিল, "ছাইচাপা বিড়ালে"র অর্থ কি ! আর বলিল, আমি কিন্তু মা, ঐ কালী-টালীরূপে আপনাকে দেখতে চাই না। আমি আপনাকে এইরূপেই দেখতে চাই—আপনি মা আর আমি ছেলে।

শ্রীমা (সহাস্যে)—তা বেশ তো বাবা। আমিও বাঁচলুম। জিব বার করে আর দাঁড়াতে হবেনি।

ভগিনী নিবেদিতা ১৬ নং বসুপাড়া লেনের বাড়ি ছাড়িয়া ১৭ নং বাটীতে তাঁহার বালিকা বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করায় শ্রীমার জন্য ঐ বাড়ি ভাড়া লওয়া হয় এবং তিনি ছোটমামী (অভয়কুমারের বিধবা) ও তাঁহার শিশুকন্যা রাধুকে লইয়া জয়রামবাটী হইতে [সেখানে] আসেন।

অভয়কুমারের মৃত্যুর সময় তাঁহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। ইনি চিরদুঃখিনী। শৈশবে মাতৃহারা হইয়া পরপালিতা হইতে থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পালনকর্তৃরও মৃত্যু হয়।

এখন আবার যৌবনের প্রারম্ভেই বিধবা হইয়াছেন। তাঁহার বিষয়ে শ্রীমাকে একদিন বলিতে শুনিয়াছি ঃ "ও পাগল হবেনা তো হবে কে? একে তো ঐ কাঁচা বয়সে শোকতাপ পেয়েছে, তায় আবার কলকাতার বাড়িতে (১৬ বসুপাড়া লেনে) ভোরবেলা একটা চোরকে দেখে আঁতকে উঠে পড়ে যায়। সেই থেকে ঐরকম হয়ে গেছে।"

ছোটমামীর মাথা খারাপ হওয়ায় এবং শিশু রাধুর পালনের জন্য শ্রীমাকে জয়রামবাটী যাইতে হয়। এবার বেশিদিন কলিকাতায় থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় যখন কলিকাতায় আসিলেন, তখন রাধু শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিয়াছে এবং সে বালিকাবস্থায় পদার্পণ করিয়াছে বলিলেই হয়। এবার আসিয়া [শ্রীমা] ২/১ বাগবাজার স্ট্রীটে অবস্থান করেন।

আমরা ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে পশ্চিম হইতে আসিয়া শ্রীমাকে এই বাটীতে পাই। তাঁহার এই বাটীতে শরৎ মহারাজ, দীন মহারাজ (স্বামী সচ্চিদানন্দ নং ১) এবং একটি নূতন ছোকরাকে দেখি। ছোকরাটি শ্রীমার এবার কলিকাতায় আসিবার পূর্ব হইতে বলরামবাবুর বাটীতে শরৎ মহারাজের নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। এখন শ্রীমা আসায় [তিনি] তাঁহার বাটীর বাজার-হাট এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য করিতে লাগেন, আর [ওদিকে] রাজবল্লভপাড়ায় নিজ পিতার নিকট দুইবেলা খাইতেন আর রাত্রে সেখানেই শুইতেন। পরে শ্রীমার বাটীতেই ব্রহ্মচারিরূপে রহিয়া যান। উঁহার নাম গণেন্দ্রনাথ। একদিন গণেন্দ্রনাথ নিজের দীক্ষার বিষয় আমাদের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করেন যে, তিনি শ্রীমার নিকটই [দীক্ষা] লইবেন। ইঁহার পূর্বোপার্জিত সামান্য কিছু অর্থ শরৎ মহারাজের কাছে জমা ছিল। উহা হইতে দীক্ষার জন্য একখানি কাপড়, কয়েকটি আম এবং কিছু মিষ্টান্ন ক্রয় করিলেন। কাপড়খানি পূর্বদিনে কাচিয়া শুকাইয়া

রাখিলেন। পরদিন তাঁহার দীক্ষা হইল। শ্রীমা কাপড়খানি পরিয়াছিলেন। গণেন্দ্রনাথ ফটো তুলিতে জানিতেন—এই বাটীতে শ্রীমার দুই-একখানি ফটো তুলেন।

এখন হইতে শ্রীমার নিকট থাকিয়া যাই। উপরে তাঁহার কাছে গেলে তিনি হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ-আদি স্থানের গল্প শুনিয়া বালিকার ন্যায় খুশি হইতেন।

একবার এক দুশ্চরিত্রা নারী এক চরিত্রবান পুরুষের চরিত্রে দোষারোপ করে। শ্রীমা তাহার অভিযোগ বিশ্বাস করিয়াছেন জানিতে পারিয়া মঠবাসীদিগের কেহ কেহ আসিয়া শ্রীমাকে অনেক বুঝাইয়াও কৃতকার্য হইলেন না। সকলকেই শ্রীমা একই উত্তর দিয়াছেন : "তুমি জান না, সে ঐ রকমই।" অবশেষে রাখাল মহারাজের আদেশে শ্রীমাকে অনেক বুঝাইলাম—বলিলাম : "আমার নিজের কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে—যে কয়েক বৎসর তাকে দেখেছি তাতে বেশ জানি, সে ওরকম নয়। আর আপনি যদি তার বিষয়ে এরকম মত পোষণ করেন, তাহলে তার অকল্যাণ হয়।" ইহাতেও শ্রীমার মত পরিবর্তিত হইল না— তাঁহার সেই একই উত্তর পাইলাম; অথচ তিনি কখনও তাহাকে দেখেন নাই এবং সে-ও তাঁহার কাছে আসে নাই।

শ্রীমার নীলমাধব[১৭] নামে এক খুল্লতাত ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং পাইকপাড়ার রাজবাটীতে পাচকের কার্য করিয়া শেষ বয়সে পেনসন লয়েন। দেশে শ্রীমা ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার ভার না লওয়ায় [শ্রীমা তাঁহাকে] এবার নিজের সঙ্গে আনিয়াছেন। আমরা দেখিতাম শ্রীমাকে স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিতে। আমরা প্রায়ই ম্যাঙ্গোস্টিন ও আম, অসময় হইলেও, শ্রীমা ভালবাসেন বলিয়া হগমার্কেট হইতে আনিতাম আর দেখিয়া ব্যথিত হইতাম যে, তিনি স্বয়ং অল্পমাত্র খাইয়া অথবা একেবারে না খাইয়া ঐ খুড়াকে

---

১৭ নীলমাধব মুখোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীমায়ের পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা।—সম্পাদক

খাওয়াইতেছেন। একদিন আর থাকিতে না পারিয়া মাকে ঐ বিষয়ে অভিযোগ করিলে তিনি উত্তর দেন ঃ "বাবা, খুড়ো আর কদিন ?—এখন ওর সাধ মিটিয়ে দেওয়াই ভাল। আমরা তো অনেক দিন বাঁচব, অনেক খাব।"—মায়ের ঐ কথাগুলি লিখিলাম বটে, কিন্তু যেভাবে তিনি ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আদৌ ফুটাইতে পারিলাম না। তিনি এমন একটা ভাব ঐ কথাগুলিতে দিয়াছিলেন এবং সেই ভাব আমাদের হৃদয়ে এতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, আর কখনও—এমনকি, রাধুর ক্ষেত্রেও—ঐ প্রকার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের মনে ব্যথার উদ্রেক হয় নাই।

নিবেদিতা স্কুলের একখানি ঘোড়ার গাড়ি ছিল। শ্রীমা ঐ গাড়িতে গঙ্গাস্নানে যাইতেন, আর সপ্তাহে একদিন স্কুল বন্ধ থাকিলে ঐ গাড়িতে আমরা তাঁহাকে লইয়া কখনও গড়ের মাঠে, কখনও মিউজিয়মে, কখনও আলিপুর চিড়িয়াখানায়, কখনও শিবপুর বোট্যানিকাল বাগানে, কখনও কালীঘাটে, কখনও আবার কালীপূজায় দেওয়ালির আলো দেখাইতে বড়বাজারে লইয়া যাইতাম। অধিকাংশস্থলে শ্রীমা গাড়ি হইতে নামিয়া পায়ে হাঁটিয়া দেখিয়া বেড়াইতেন আর সরলা বালিকার ন্যায় উপভোগ করিতেন। আমাদের কিন্তু তাঁহাকে ঐপ্রকারে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ ঃ প্রথম—তিনি ঘরের ভিতর একভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতেন, বাহিরের হাওয়ায় স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে; দ্বিতীয়—দক্ষিণেশ্বরের নহবতখানায় পায়ে যে-বাতের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং যাহার দরুন তাঁহাকে একটু খুঁড়াইয়া চলিতে হইত, সেই বাতটা যদি একটু আধটু হাঁটায় সারিয়া যায় [—তাহার চেষ্টা করা]।

একদিন প্রাতে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের অধ্যক্ষ স্বামী যোগবিনোদ আসিয়া আমাদের নিকট শ্রীমাকে প্রণাম করিবার অভিপ্রায় জানাইলে আমরা তাঁহাকে উপরে লইয়া যাই। উপরে গিয়া তিনি শ্রীমাকে জন্মাষ্টমীর উৎসবে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি লয়েন। অতএব জন্মাষ্টমীর দিনে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের গাড়িতে শ্রীমা, লক্ষ্মী-দিদি, গোলাপ-মা, নলিনী এবং রাধুকে লইয়া

যাই। উৎসব ভাল হইল। অনেক লোক সমবেত দেখিলাম। গিরিশচন্দ্র ও মাস্টার মহাশয় ছিলেন। দলে দলে সঙ্কীর্তন সমাবেশ। কিন্তু মাঝে মাঝে গোলাপ-মা আসিয়া বলেন ঃ "মাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।" আমরা যোগবিনোদকে বলায় তিনি ছাড়িতে চাহেন না। এই প্রকার অনেক বলার পর যখন ছাড়িলেন, তখন অপরাহ্ণ প্রায় ছটা।

বাটীতে ফিরিয়া গোলাপ-মা ও লক্ষ্মী-দিদির নিকট শুনা যায়, শ্রীমার সেখানে বড়ই কষ্ট হইয়াছে—সারাদিন ধরিয়া চাদর মুড়ি দিয়া থাকিতে হয়—হুদো হুদো লোক প্রণাম করিতে আসিতেছে, একটু বিরাম নাই। এই পচা গরমে তাঁহাকে কাঠের পুতুলের মতো একভাবে থাকিতে হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা কষ্ট তাঁহার হইয়াছে, শ্রীঠাকুরের সমাধি [তিরোধানের পরে শ্রীঠাকুরের পূতাস্থি যেখানে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল, সেইস্থান] দেখিয়া।

একদিন গিরিশচন্দ্র শ্রীমাকে থিয়েটার দেখাইতে লইয়া যান এবং রয়েল বক্সটি তাঁহার জন্য ছাড়িয়া দেন। বড় হাতপাখার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' অভিনয় হইতে থাকে। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং 'ভণ্ড সাধক'রূপে দেখা দিলেন। যখন থাকমণিকে কৃষ্ণপ্রেম শিখাইবেনই শিখাইবেন বলিলেন, শ্রীমা হাসিতে হাসিতে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন ঃ "এ-বয়সে আর কেন ?" আবার বিল্বমঙ্গলের একনিষ্ঠ প্রেম দৃষ্টে "আহা ! আহা !" করিলেন।

এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী গঙ্গার তীরে কামারহাটি সাগর দত্তের ঠাকুরবাটীর একটি ঘরে থাকিতেন। তিনি ঠাকুরকে গোপালরূপে দেখিয়াছিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়াছিলেন। শ্রীমা তাঁহাকে শাশুড়ির মতো দেখিতেন। ভক্তেরা তাঁহাকে 'গোপালের মা' বলিতেন।

ইনি অতি বৃদ্ধ হওয়ায় এবং ইহার পরিচর্যার অভাব হওয়ায় ভগিনী নিবেদিতা [ইহাকে] ১৭ বসুপাড়া লেনে তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়বাটীর একটি ঘরে আনিয়া রাখেন এবং পরিচর্যার জন্য একটি স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করেন। গোপালের মা-র খাবার দুইবেলা শ্রীমার বাটী হইতে যাইত। শ্রীমা মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিতেন।

গোপালের মা-র শরীরে কোন ব্যাধি দেখা দেয় নাই। কেবল অতি-বার্ধক্যের ভার শরীর বহন করিতে পারিত না। তাই শেষাশেষি তাঁহার হুঁশ থাকিত না—হয়তো শৌচ-প্রস্রাব অসাড়ে হইয়া যাইত। কিন্তু দুইটি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান কখনও লোপ পায় নাই। একটি, তাঁহার জপের মালা—মালাটি তাঁহার হাতের নিকট সদাই চাই, নইলে ছটফট করিতেন—চিৎকার করিতেন। ফলতঃ হাতে সর্বদা মালা থাকিত। দ্বিতীয়—কাহাকেও চিনিতে পারিতেন না, কিন্তু শ্রীমা গেলেই জানি না কি করিয়া বুঝিতে পারিতেন। অমনি সেই অস্ফুটস্বরে বলিতেন ঃ "কে, বউমা ? এস।"

যাহা হউক, ক্রমে [তাঁহার] নাড়ির স্পন্দন হ্রাস পাইল। হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিল। কবিরাজ 'বিলম্ব নাই' বলায় ভগিনী নিবেদিতা বলিলেন ঃ "বরাবর গঙ্গার তীরে তীরে কাটিয়েছেন, এখন গঙ্গাযাত্রা করাই উচিত।" তখন রাত্রি প্রথম প্রহর। তাঁহাকে কুমারটুলি গঙ্গাযাত্রীদের বাড়ির একটি স্বতন্ত্র ঘরে লইয়া গেলাম। সেখানে যাইয়া প্রায় চারদিন রহিলেন। প্রত্যহ শ্রীমা দেখিতে যাইতেন। তিনি গেলেই গোপালের মা-র চক্ষু দুইটি ক্ষণিকের তরে উন্মীলিত হইয়া আবার বন্ধ হইয়া যাইত। বাকি সারাদিন ও রাত্রি বন্ধই থাকিত। হাতে মালাটিও থাকিত—মাঝে মাঝে অঙ্গুলি মালার উপর নড়িত।

এইভাবে চতুর্থদিন রাত্রি প্রায় একটার সময় তাঁহার শেষনিঃশ্বাস [আগতপ্রায়] দেখিয়া কবিরাজের আদেশে তাঁহাকে গঙ্গার জলে নামানো হইল। দেখিতে দেখিতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীমাকে স্থানে-স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত। একদিন চিৎপুর রোডে বি. দত্ত নামক ফটোগ্রাফারের স্টুডিওতে লইয়া যাওয়া হয় এবং পূর্ব ব্যবস্থানুসারে চারখানি ফটো লওয়া হয়।

শ্রীমার দেশের বাটীতে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া থাকে। ১৩১১ সালের পূজায় শ্রীমা যান নাই। না যাইবার কারণ, তাঁহার এবার কলিকাতায় আসা এক বৎসরও হয় নাই—ইহারই মধ্যে

আবার যাইবেন এবং আসিবেন—যাওয়া আসার খরচও তো কম নহে—তিনি তো একা নহেন—তাঁহার সঙ্গে খুড়া, রাধু ও তাহার মা, মাকু (শ্রীমায়ের অপর ভ্রাতুষ্পুত্রী) নলিনী, ভানি-পিসি—এতগুলি লোক। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শরীরও দেশে বিশেষ খারাপ হইয়াছিল—এবার কলিকাতায় কিছুদিন থাকিলে সারিয়া যাইবে—ভক্তদের [এইরূপ] একান্ত অনুরোধে তাঁহার যাওয়া হইল না। লেখককে পাঠাইলেন। শ্রীমার তৃতীয় ভ্রাতা[১৮] বরদাকুমার[১৯] সঙ্গে গেলেন। পূজার কয়দিন সেখানে থাকিয়া ফিরিয়া আসি। এবার তারকেশ্বরের পথে যাই এবং ঘাটালের পথে ফিরি।

এই জগদ্ধাত্রী পূজার একটু ইতিহাস আছে—উহা এখানে দিতেছি। অন্যান্য স্থানের ন্যায় শ্রীমার বাটীর জগদ্ধাত্রী পূজা একদিনের পূজা নহে। এখানে তিনদিন পূজা হইয়া চতুর্থ দিনে দুর্গাপূজার মতো বিসর্জন হইয়া থাকে। ঐরূপ হইবার কারণ বিবৃত হইতেছে।

পূর্বে একবার সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) ও স্বামী সোমানন্দের সঙ্গে ঘাটাল হইতে হাঁটাপথে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের মধ্য দিয়া জয়রামবাটী যাই। তখন জগদ্ধাত্রী পূজা ঐপ্রকারে হইতে দেখিয়া একদিন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া [তাঁহার শ্রীমুখে] জানিতে পারি—

"প্রথমবার মায়ের পূজো হলো। পরের দিন কালী (শ্রীমায়ের মধ্যম ভ্রাতা—কালীকুমার) জিজ্ঞাসা করলে, 'দিদি, দই-করমার [দধিকর্মের] উদ্যুগ করি?' আমার মনে পড়ল, সেদিন বিষ্যুদ্‌বার। আমি অনুমতি দিতে পারলুম না। আমি বললুম, 'আজ যে বিষ্যুদ্‌বার।' সে বুঝে নিলে আর সেদিন মায়ের পূজো করালে। পরের দিন আবার মাস-পয়লা—সেদিনও বলতে পারলুমনি দই করমা

১৮ প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ ভ্রাতা। মায়ের দ্বিতীয় ভ্রাতা উমেশচন্দ্র অল্পবয়সে মারা যান, ফলে চতুর্থ ভ্রাতাই তৃতীয় ভ্রাতা হিসাবে গণ্য হন।—সম্পাদক

১৯ প্রকৃত নাম—বরদাপ্রসাদ।—সম্পাদক

করতে—অগস্ত্যযাত্রা বলে। তার পরের দিন নিরঞ্জন হলো। সেই থেকে মা এখানে তিনদিন পূজো নিয়ে আসছেন।"

এবার জয়রামবাটী হইতে ফিরিলে শ্রীমা উদ্‌গ্রীব হইয়া পূজার বিষয়ে সমস্ত কথা শুনিলেন।

ইহার দিনকয়েক পরে শ্রীমার পুরীধাম যাইবার কথা হইতে থাকে। যাওয়া স্থির হইলে দুইদিন যাবৎ দিনের বেলা জিনিসপত্র কেনা এবং রাতে সেইগুলি প্যাক করা হয়।

শ্রীমার সঙ্গে তাঁহার খুড়া, রাধু, ছোটমামী, নটীর মা, চুনীবাবুর স্ত্রী (বলরামবাবুর বাটীর পশ্চিমে চুনীলাল বসু—ঠাকুরের ভক্ত; তাঁহার স্ত্রী), কুসুম[২০], গোলাপ-মা ও লক্ষ্মী-দিদি চলিলেন। পুরুষদের মধ্যে বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) ও লেখক। একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি রিজার্ভ করা হইলে মায়েরা তাহাতে উঠিলেন। আমরা পুরুষ তিনজন ইন্টারক্লাসে চলিলাম। বাবুরাম মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিরামবাবু এবং গণেন্দ্রনাথ আমাদিগকে হাওড়া স্টেশনে [ট্রেনে] উঠাইয়া দিলেন। সারারাত্রি গাড়িতে থাকিয়া পরদিন প্রাতে পুরীধাম পৌঁছি। সেখানে আমাদের থাকিবার জন্য বড় রাস্তায়, অর্থাৎ শ্রীমন্দিরের রাস্তায় 'ক্ষেত্রবাসীর মঠ' (বলরামবাবুদের বাড়ি) খুলিয়া দেওয়া হইল। বাবুরাম মহারাজ সমুদ্রতীরে বলরামবাবুদের অন্য বাটী 'শশীনিকেতনে' রহিলেন।

পুরীতে পৌঁছিয়া শ্রীমা ধূলাপায়ে শ্রীমন্দিরে ঠাকুরদর্শনে যান। পূর্ব হইতেই বলরামবাবুর সুযোগ্য পুত্র রামকৃষ্ণ বসু (আমরা ইহাকে 'রাম' বলিয়া ডাকিতাম) সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহারা ঐ দেশের জমিদার। [শ্রীমা] শ্রীমন্দিরে যাইবামাত্র রত্নবেদিস্থান খালি

---

২০ কুসুমকুমারী দেবী। স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল। বালবিধবা। কাশীতে থাকতেন। স্বামী অচলানন্দের (কেদারবাবার) সঙ্গে তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসেন। পরে শ্রীশ্রীমায়ের সেবাও করেছেন। তিনি ছিলেন 'গোপালের মা'র মন্ত্রশিষ্যা। গোপালের মা-র পাদমূলে ভগিনী নিবেদিতার যে সুপরিচিত ছবি আছে, তাতে পাখা হাতে গোপালের মা-র শিয়রে উপবিষ্টা মহিলাই কুসুমকুমারী দেবী।—সম্পাদক

করিয়া দেওয়া হইল। শ্রীমা প্রবেশ করিয়া অগ্রে সন্তানের এবং পরে নিজ খুড়ার মস্তক রত্নবেদীতে স্বহস্তে স্পর্শ করাইয়া দিয়া সন্তানকে বলিলেন ঃ "গুরু-ইষ্ট একত্রে দেখতে হয়।" পরে বাকি সকলে দর্শন করিলেন। নিত্য মন্দির হইতে আমাদের সকলের জন্য মহাপ্রসাদ আসিতে থাকিল।

ক্ষেত্রবাসীর মঠের বাহিরের ঘরে শ্রীমার খুড়ার, লেখকের এবং একটি চাকরের আর ভিতর বাটীতে মায়েদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলাম। সদরে একজন দরোয়ানও রহিল। তিনদিন অত্যধিক পরিশ্রমে এবং তিনরাত্রি জাগরণে এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সেখানে প্রথম রাত্রে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি আর কখন যে চোর আসিয়া আমাদের ঘর হইতে খুড়ার ও আমার কাপড়চোপড় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই। খুড়া একটু অহিফেন সেবন করিতেন। ভোরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় ঘরের দ্বার খোলা এবং আলনায় কাপড় নাই দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। তাঁহার চিৎকারে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাড়াতাড়ি ভিতর-বাটী গিয়া ঘরগুলি ভিতর হইতে সবই বন্ধ দেখি। সেখানে কিছুই হয় নাই—কেবল আমাদের উপর দিয়া গিয়াছে। চুরির খবর শশীনিকেতনে গিয়া বাবুরাম মহারাজ ও রামকে দেওয়ায় তাঁহারা সঙ্গে আসিলেন এবং থানায় ডায়েরী লিখাইলাম। থানাদারের অনুসন্ধানের ফলে চারি ক্রোশ দূরে মাল সহিত চোর ধরা পড়ে এবং যথাসময়ে আদালতে সাক্ষ্য দিয়া কাপড়গুলি সনাক্ত করিয়া ফিরাইয়া আনি।

প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমার সহিত আমরা শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতাম এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক দেখিতাম। একদিন শ্রীমার ইচ্ছায় ক্ষেত্রবাসীর মঠে কথা দেওয়া হয়। পাণ্ডা আসিয়া পুঁথি হইতে শ্রীজগন্নাথের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য পাঠ করিলেন। সেইদিন প্রায় পঞ্চাশজন পাণ্ডাভোজন হইল।

এখানে শ্রীমায়ের পায়ে একটি ফোড়া হয়। সেটি তাঁহাকে অতিশয় কষ্ট দিতেছিল। বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে, অথচ শ্রীমা

উস্কাইতে দিবেন না। একদিন ঐ অবস্থায় মন্দিরে আরতি দেখিতেছেন, এমন সময় পিছন হইতে যাত্রীদের ভিড়ের এত চাপ পড়িল যে, আমাদের বেষ্টন খুলিয়া গেল। শ্রীমা ব্যথার জায়গায় চোট লাগার ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

ঐ ঘটনার বিষয় শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ পরদিন প্রাতে এক যুবক ডাক্তারকে আনিলেন। সে আমাদের পূর্ব নির্দেশানুসারে প্রণাম করিতে করিতে ফোড়াটি চিড়িয়া দিয়াই "মা আমার অপরাধ নেবেন না" বলিয়া চলিয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গে [আমরা] দুই হাতে পা-টি টিপিয়া ধরিতে পুঁজ বাহির হইয়া গেল। শ্রীমা চাদরে আবৃতা ছিলেন—ডাক্তারের কার্যকলাপ দেখিতে পান নাই। বাবুরাম মহারাজ নিকটে আসেন নাই—বহির্বাটীতে দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং ডাক্তারকে লইয়াই চলিয়া গেলেন।

শ্রীমা রাগিয়া গেলেন এবং খুব ভর্ৎসনা করিতে থাকিলেন দেখিয়া বলিলাম ঃ "মা, আমারই অপরাধ, অভিসম্পাত দিতে হয় তো আমায়ই দিন।" তিনি খুব বকিলেন, কিন্তু অভিসম্পাত দিলেন না। পূর্ব-সংগৃহীত নিমপাতার জলে ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়ায় আরাম বোধ করিলেন। চাদর খুলিয়া ফেলিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া বলিলেন ঃ "আঃ, আরাম হলো।" আবার কি মনে হইল—পূর্বক্ষণে যে-সন্তানকে বকিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন। সে-ভর্ৎসনা এবং সে-আদর সন্তানের জীবনে ভুলিবার নহে।

নিত্য পা ধোয়ানো এবং ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা চলিতে থাকিল। দুই-চারিদিনে আরাম হইয়া আসিল, ব্যাণ্ডেজ বা ধোয়ানোর আবশ্যকতাও রহিল না; এমন সময় একদিন [শ্রীমা] নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "জয়রামবাটী যেতে পারবে ?" উত্তর করিলাম ঃ "কেন পারব না, মা ?" দিদিমা ও কালী-মামাকে আনিতে বলিয়া দিলেন। ঠিক হইল, পরদিন রাত্রের গাড়িতে যাইব।

পরদিন সন্ধ্যায় মন্দিরের আরতি দর্শনের পর ফিরিয়া শ্রীমা শুইয়া বিশ্রাম করিতেছেন—সন্তানকে পদসেবা করিতে ডাকিলেন আর সেই

অবসরে চুপিচুপি বলিলেন ঃ "তুলসীতলায় নির্মাল্য আছে, নিয়ে যেও", আর প্রকাশ্যে গোলাপ-মাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ "আশুর খিদে পেয়েছে—খেতে দাও।" আহারান্তে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে যাত্রা করিলাম।

শ্রীমার ঐরূপ গোপনভাবে কার্য করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র ছোটমামী যাহাতে জানিতে না পারেন। তিনি পাগল হওয়া অবধি চাহিতেন না যে, শ্রীমা তাঁহাকে ব্যতীত অপর কোন ভাই বা ভাজকে ভালবাসেন আর তাহাদের কিছু করেন। দিদিমা প্রভৃতিকে আনিতে যাইবার চারিদিন পূর্বে গৌরী-মা (ঠাকুরের সন্ন্যাসিনী-ভক্ত; উত্তরকালে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী) পুরীতে আসেন এবং আমাদের দলভুক্ত হয়েন।

বিষ্ণুপুরের টিকিট কিনিয়া গাড়িতে [ট্রেনে] যথাসময়ে চড়িয়া বসিলাম। বিষ্ণুপুরে নামিয়া শেয়ারে উটের গাড়িতে কোতুলপুর গেলাম। তথা হইতে পদব্রজে জয়রামবাটী গিয়া দিদিমা এবং কালী-মামাকে শ্রীমার আদেশে পুরীতে লইয়া যাইতে আসিয়াছি বলিলাম। পরদিন যাত্রার দিন স্থির হইলে কালী-মামা তাঁহার শ্বশুরবাড়ি মড়াগেড়ে গ্রামে চলিয়া গেলেন, তাঁহার পরিবারবর্গকে খবর দিবার জন্য। পরিবারবর্গ তখন তথায় ছিল। যাইবার সময় কালী-মামা পরদিন প্রাতে দিদিমাকে তথায় লইয়া যাইতে বলিয়া গেলেন। তিনি সেখানে গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিবেন এবং গড়বেতার পথে যাওয়া হইবে [স্থির হইল]।

এদিকে সীতারাম ঘোষ নামে এক বৃদ্ধ সদ্‌গোপ আসিয়া দিদিমাকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে লইয়া যাইতে। অবশ্য তাহার খরচ সে দিবে। দিদিমা সম্মত হইলেন।

পরদিন দিদিমা ও সীতারামকে লইয়া মড়াগেড়ে গিয়া দেখি, কালী-মামা একটি দল সৃষ্টি করিয়াছেন পুরী যাইবার জন্য। ইহাতে আমাদের কিছু বলা উচিৎ নয় বলিয়া নীরব রহিলাম। যাত্রার সময় দুইখানি গরুর গাড়ি আসিল। একখানিতে দিদিমা, কালী-মামার স্ত্রী

তাঁহার দুইটি ছেলে লইয়া এবং গাড়োয়ানের নিকট সীতারাম উঠিলেন। অপর গাড়িখানিতে কালী-মামা, তাঁহার শ্বশুর এবং লেখক। সারারাত্রি গাড়ি-দুইখানি চলিয়া পরদিন প্রাতে গড়বেতা স্টেশনের নিকটে গ্রামে গিয়া পৌঁছিল। দ্বিপ্রহরের ভোজন একটি চটিতে করিয়া ট্রেন ধরিলাম এবং পরদিন প্রত্যূষে পুরী আসিয়া পৌঁছিলাম।

মড়াগেড়ে হইতে গড়বেতার পথে রাত্রিকালে শালবনের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে একটা মোড় ফিরিবার সময় হঠাৎ দিদিমার গাড়ি উল্টাইয়া যায়। ফলে সীতারামের উপর দিদিমা আর দিদিমার উপর মেজমামী ও তাঁহার পুত্রদ্বয় আসিয়া পড়েন। তাঁহাদের, বিশেষতঃ দিদিমার, "মরেছি, মরেছি" শব্দে তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাকে টানিয়া অক্ষত শরীরে উদ্ধার করিয়া বলি ঃ "দিদিমা, আপনাকে মরতে দোব না—মা যে কাঁদবেন।"

আমাদের ক্ষেত্রবাসীর মঠে পৌঁছিতে দেখিয়া ছোটমামী, যিনি লেখকের আকস্মিক অন্তর্ধান হইতে এতাবৎকাল শ্রীমাকে নানাভাবে আক্রমণ করিয়া আসিতেছিলেন, ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন এবং শ্রীমার সম্মুখে গিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া নিজ গ্রাম্যছড়া কাটিয়া কত কি বলিতে লাগিলেন। উত্তরে শ্রীমাকে বলিতে শুনা গেল ঃ "আমি কি একা তোকে নিয়েই থাকব ? এরা কি আমার কেউ নয় ?"[২১]

অগ্রহায়ণ মাসে পুরীতে শ্রীবলরামের বিশেষ ভোগ হইয়া থাকে—অতি উপাদেয় এবং নানাপ্রকারের। নিত্য উহা আমরা খাইতাম। আচণ্ডালের মুখে পঁকাল (পান্তা) মহাপ্রসাদ শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে বসিয়া দেওয়া এবং তাহাদের হাতে খাওয়া শ্রীমন্দিরের রীতি। এই রীত্যনুসারে একদিন শ্রীমা একচত্বারে বসিয়া আমাদের সকলের মুখে দিতেছিলেন এবং স্বয়ংও খাইতেছিলেন; এমন সময় হঠাৎ মাস্টার

---

২১ এসম্পর্কে অধিক তথ্যের জন্য দ্রঃ শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ১০ম সং, ১৩৯৩, পৃঃ ৭০ এবং শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ২৬২-২৬৩।—সম্পাদক

মহাশয় ও বসন্তকুমার [illegible] কলিকাতা হইতে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখা পাইলেন।

জয়রামবাটী হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, দিদিমা ব্যতীত তাঁহারা সকলে দিনকয়েক পরে ফিরিয়া গেলেন।

পুরীতে আসা অবধি শ্রীমা পায়ে ফোড়ার দরুন এবং কালী-মামারা আসায় মন্দির ব্যতীত অন্য কোথাও এতদিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহারা চলিয়া যাওয়ায় প্রায় বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। রামের মা[22] ও নিতাইয়ের মা[23] (রামের কাকীমা) শশীনিকেতনে থাকিতেন। প্রায়ই শ্রীমার দর্শনে ক্ষেত্রবাসীর মঠে আসিতেন এবং কোন কোন দিন অপরাহ্ণে শ্রীমার সঙ্গে বেড়াইতেও যাইতেন।

[পুরীতে অবস্থানকালে] দুইবার শ্রীমা সমুদ্রে স্নান করেন। একদিন স্বর্গদ্বারে বেড়াইতে যান। শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণও প্রায়ই করিতেন। একদিন শ্রীজগন্নাথের রন্ধনশালা দেখেন। একদিন গুণ্ডিচাবাড়ি যান। সে-সুবৃহৎ মন্দির সমস্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন। সেইদিন লক্ষ্মীজলায়ও যাওয়া হয়। লক্ষ্মীজলার বিশেষত্ব এই যে, সেই জলা শ্রীমহাপ্রভুর দৈনন্দিন ভোগের নিমিত্ত বারমাস নিত্য নবধান প্রসব করে। নিত্য ঐ ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করতঃ ভোগ রান্না হয়।

অপর একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সমাধি দেখিতে নরেন্দ্রসরোবরে যাওয়া হয়। গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র অভ্যর্থনা করেন। সরোবর ও তৎসংলগ্ন মঠটি রমণীয়। শ্রীশঙ্করাচার্যের গোবর্ধন মঠও দেখা হয়।

---

২২ বলরাম বসুর স্ত্রী—কৃষ্ণভাবিনী বসু।—সম্পাদক

২৩ নিত্যানন্দ বসুর মা এবং সাধুপ্রসাদ বসুর স্ত্রী—শরৎকুমারী। সাধুপ্রসাদ বলরাম বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সাধুপ্রসাদের পুত্র নিত্যানন্দ বসুর স্ত্রীর নামও ছিল শরৎকুমারী। কিন্তু শাশুড়ির নামের সঙ্গে মিল হওয়ায় বসু পরিবারে তাঁর নতুন নাম হয় 'কমলবালা', সংক্ষেপে 'কমলা'। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর সম্পর্কে বলতেন—'দেবী'। অল্পবয়সে তিনি মারা যান।—সম্পাদক

পূর্ব অবস্থানের শেষাশেষি শ্রীমার শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল হয় এবং সম্ভবতঃ সেইজন্য তিনি খুব বেশি গল্পগাছা, আমোদ-আহ্লাদ ও ঠাট্টা-রসিকতা করিতে থাকেন।

একদিন গল্প করিতে করিতে স্বামীজীর দুর্গাপূজার কথা পাড়িয়া বলেন : "নরেনের কি গুরুভক্তি ! আমার নামে সঙ্কল্প করালে। বললে, 'মা-র নামে সঙ্কল্প হবে। আমরা তো কপ্‌নিধারী—আমাদের নামে হবে না।' কেষ্টলাল[২৪] আমার কাছে ছিল—তাকে দিয়ে পূজো করালে। শশীর (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের) বাপ তন্ত্রধারক হলেন। আমায় কদিন নীলাম্বরের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল।"

আর একবার বলেন : "কালাপাহাড়ের কথা তো শুনলে ? বামুনের ছেলে কি না করলে ! দেবদেবী হিঁদুর কিছুই রাখলে না—সব ভেঙে চুরমার !"

একদিন শ্রীমাকে ঠাট্টা করিতে দেখিয়া নটীর মা বলেন : "মা তুমি অত ঠাট্টাও জান !" শ্রীমা বলিলেন : "আমায় আর কি দেখছ ? ঠাকুরকে তো দেখেছ ? তাঁর কথা আর ফুরুতে চাইত না—এত কথাও জানতেন !"

মাঘ মাসে শ্রীমা কলিকাতায় বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরিয়া আসেন। দিদিমাও আমাদের সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। দিদিমা নাতি সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন—আমরাও বাদ দিতাম না। একদিন তাঁহাকে বাগবাজারের নবীন ময়রার রসগোল্লা ও সন্দেশ খাওয়াইয়া কেমন খাইলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দেন : "ভাই, ওতে কি মিষ্টি আছে ছাই ? একটুকু কাঁচা গুড় দিতে তো খেয়ে বাঁচতুম।"

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া প্রসন্নকুমারের সেঙ্গাত (বন্ধু) রামনাথ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দিদিমা জয়রামবাটী চলিয়া যান।

শ্রীমার খুড়া নীলমাধব বহুদিন যাবৎ হাঁপানি রোগে

---

২৪ কৃষ্ণলাল মহারাজ—স্বামী ধীরানন্দ।—সম্পাদক

ভুগিতেছিলেন—কখনও ভাল থাকিতেন, কখনও বা বাড়িত। এক্ষণে উহা তাঁহাকে শয্যাশায়ী করে। নানা চিকিৎসায়ও ব্যাধির উপসম হইল না। ক্রমে শেষদিন দেখা দিল। শ্রীমা স্বয়ং কত সেবা করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। শেষদিনে সকাল হইতেই মৃত্যুর লক্ষণ মুখে ফুটিয়া উঠিল। খালি টান হইতে লাগিল। আমাদের বারংবার বলায় শ্রীমা এক-একবার উঠিয়া ঠাকুরপূজা, ভোগাদি সারিয়া আসেন; কিন্তু খুড়াকে ছাড়িতে চাহেন না—ঘিরিয়া বসিয়া থাকেন আর খালি জিজ্ঞাসা করেন ঃ "এখন কেমন দেখছ ?" আমাদের একই উত্তর ঃ "ভাল হয়ে যাবেন, বোধহয়—ভাবনা নেই।" আমাদের উত্তরটি সত্য নহে—কেবল তাঁহাকে স্তোকবাক্যে ভুলানো।

অবশেষে শ্রীমায়ের আহারের সময় আসিল; তিনি যাইতে অনিচ্ছুক। পুনরায় অছিলা ও স্তোকবাক্যে তাঁহাকে ভুলাইয়া পাঠান গেল, কিন্তু তাঁহারও যাওয়া আর এদিকে খুড়ার শেষ হওয়া। সেসময়ে খুড়ার নিকট লেখক ব্যতীত জনৈকা স্ত্রীভক্ত ছিলেন। তাঁহাকে শ্রীমায়ের আহার শেষ হওয়া পর্যন্ত তুষ্ণীভাব ধারণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি শ্রীমায়ের আহার অগ্রে প্রয়োজন বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহাকে আরও বলিলাম ঃ "মা-র কালীমূর্তি কেবল ডাকাত-বাবা যে দেখেছিল, তা নয়, আজ আমাদেরও দেখতে হবে। খড়্গ পড়ে পড়ুক আমার মাথায়"—[এই কথা] বলিতে বলিতেই শ্রীমা কোন প্রকারে হাতেমুখে করিয়াই চলিয়া আসিলেন। আমাদের নীরবে অবনতমস্তক দেখিয়া বুঝিয়া লইলেন। বলিলেন ঃ "তবে কি খুড়ো নেই !" মায়ের পূর্বের সৌম্যমূর্তি আর নাই—চক্ষুদুইটি যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে।—অবনতমস্তকেই রহিলাম। বলিতে থাকিলেন ঃ "ও ছাই-পাঁশ খেতে কেন আমায় পাঠালে ? খাওয়াটাই কি বড় হলো ? খুড়োকে একবার শেষ দেখা দেখতে পেলুম না ?" [বলিয়াই] কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। স্ত্রীভক্তটি ইতিমধ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। একাকী মাথা পাতিয়া রহিলাম। কত কি ভৎর্সনা করিতে থাকিলেন—কিছুই কর্ণে প্রবেশ করিলে না।

তখন কেবল খড়োর প্রতীক্ষায় আছি। আর এক-একবার সেই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া লইতেছি।

কিন্তু কি জানি কেন, সে-মূর্তি অন্তর্হিত হইল আর পূর্ব সৌম্যমূর্তিতে দেখা দিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেনঃ "বাবা আশু, একটু খুড়োর কাছে বসো, আমি আসছি।" [বলিয়া] নিজ কক্ষে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া শবদেহের মস্তকে ও বক্ষস্থলে করজপ করিয়া দিলেন এবং ঐ দুই স্থানে নির্মাল্য রাখিয়া দিলেন। তখন সুযোগ বুঝিয়া বলিলামঃ "দোষ যদি হয়ে থাকে সে কেবল আমারই, মা, আর কারুর নয়"—মুখপানে তাকাইলাম—দেখিলাম, সেই করুণ দৃষ্টি। তখন তাঁহাকে বসাইয়া নিচে আসিয়া শরৎ মহারাজকে সময়োচিত বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া পুনরায় উপরে গেলাম। নিচে ললিত[২৫] ও তাঁহার গাড়ি দেখিতে পাইলাম।

প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে ললিত প্রস্তুত হইয়া উপরে আসিলে দুইজনে শবদেহ নিচে নামাইয়া লইয়া আসিলাম। শ্রীমা অত্যধিক কাঁদিতে থাকিলেন। প্রসন্ন-মামা ললিতের নিকট খবর পাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গণেন্দ্রনাথ যোগদান করিলেন। চারিজনে খুড়ার মৃতদেহ শ্মশানে (কাশী মিত্রের ঘাটে) লইয়া গিয়া যথারীতি সৎকার করা হইল। প্রসন্ন-মামা মুখাগ্নি করিলেন।

ললিত আর লেখক যখন খুড়ার শবদেহ উপর হইতে নামাইতেছিল, তখন গোলাপ-মাকে অভিযোগ করিতে শোনা গিয়াছিলঃ "মা, আশু শুদ্দুর হয়ে বামুনের মড়া ছুঁলে?" শ্রীমার উত্তরও কর্ণে আসিয়াছিলঃ "শুদ্দুর কে?—ছেলে। ভক্তের জাত আছে কি, গোলাপ?"

খুড়ার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে শ্রীমা চতুর্থী উপলক্ষে আমাদের তিনজন কাঁধিকে (প্রসন্ন-মামার অশৌচ বলিয়া তাঁহাকে বাদ দেওয়া হয়) ভোজন করান ও প্রত্যেককে একখানি করিয়া বস্ত্র দেন।

---

২৫ ইহার নাম ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। জন ডিকিন্‌সন কোম্পানীর সেল্‌সম্যান। গ্রন্থমধ্যে কয়েক স্থলেই ইহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রসন্ন-মামা সিমলা স্ট্রীটে একখানি ছোট খোলার বাড়ি ভাড়া লইয়া দেশ হইতে বড়মামী (নলিনীর গর্ভধারিণী), কন্যাদ্বয়—নলিনী ও মাকু এবং জামাতা প্রমথকে (নলিনীর স্বামী) আনিয়া রাখিয়াছেন। প্রমথের নাম গ্রন্থমধ্যে তাঁহার বিবাহে একবার পাইয়াছি। এক্ষণে শ্বশুরালয়ে আসিয়া তাঁহার অসুখ করিয়াছিল। খবর পাইয়া শ্রীমার আদেশে দেখিতে গেলাম। অসুখ সামান্য নহে। কাশিসহ জ্বর—জ্বরের বিরাম নাই। শরৎ মহারাজ ও মাস্টার মহাশয়ের পরামর্শে দুইজন খ্যাতনামা ডাক্তারকে আনা স্থির হয়। তাঁহারা দুইজনে একত্র হইয়া পরস্পর পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিবেন। ডাক্তারদের আসিবার নির্ধারিত সময়ের দুইঘণ্টা পূর্বে সিমলা স্ট্রীট ধরিয়া প্রসন্ন-মামার বাড়ির উদ্দেশে যাইতে যাইতে একটি বাটীর দ্বারদেশে এক ডাক্তারের প্রস্তরখণ্ডে খোদিত নাম দৃষ্টিপথে পড়ে। নাম দেখিয়া মনে পড়িল, তাঁহার সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ আছে। এখনও যথেষ্ট সময় থাকায় ভিতরে প্রবেশ করিয়া বৈঠকখানায় সেই যুবক ডাক্তারকে দেখিতে পাই—হাতে একটি হাইপোডার্মিক পিচকারি। তাঁহার অভ্যর্থনায় উপবেশন করিয়া দেখিলাম—তিনি নিজেই ইঞ্জেকসন লইলেন। উহা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: "আপনার কি কোন অসুখ করেছে?" উত্তরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজে একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল, কিছু ভাবিতেছেন। পরে হঠাৎ বেগে তাকিয়াটা ফেলিয়া দিয়া নিকটে আসিয়া বসিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন: "হ্যা বলব—সব বলব—নইলে আপনিই বা এসময়ে আসবেন কেন? আপনাকে বলতে হবে।" আরও বলিতে যেন উদ্যত হইতেছিলেন; আবার চুপ করিয়া গেলেন। লেখকের মনে হইল—ইঞ্জেকসনের ফলে মস্তিষ্কবিকার ঘটিতেছে। আবার যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন: "তুমি আমার বন্ধু—হিতৈষী—নইলে এসময়ে আসবে কেন? আমি ভাবলুম—তোমায় সব বলতে হবে।"

উহা শুনিয়া মনে হইল—বোধহয় কিছু নিজস্ব অথচ গোপনীয় কথা আছে, তাহাই বলিতে চাহেন; আর সেকথা আরম্ভ হইলে শেষ হইতে

বিলম্ব ঘটিতে পারে, অথচ যে-কার্যে আসিয়াছি, তাহার সময় আর বেশি নাই। আর অপেক্ষা করা ঠিক নহে ভাবিয়া তাঁহাকে বলিলাম: "আপনার কথা এসে শুনব—নিকটেই একটা বিশেষ কাজ আছে—সেটা সেরে এসে সব শুনব আর আলোচনাও হবে। আমায় এখনই যেতে হবে।" আমাদের কাজ কি এবং কোথায় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়া [তিনি] তখনই আমাদের সঙ্গে ঐ বাটীতে চলিলেন।

পথে বলিলাম: "আপনার কি কিন্তু দিতে পারব না।" উত্তর করিলেন: "আমায় তো কেউ ডাকেনি, নিজেই যাচ্ছি।" তখনও পূর্বোক্ত ডাক্তারদ্বয় আসেন নাই। ইনি রোগীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা আসিলে ইঁহাকেও যেন ডাকা হয়—[এই] বলিয়া চলিয়া আসিলেন।

যথাসময়ে ডাক্তারদ্বয় আসিলে নববন্ধুটিকে ডাকিয়া লইলাম। বন্ধু উঁহাদের অপেক্ষা অনেক আধুনিক (জুনিয়র)। আসিয়া ছাত্রের ন্যায় এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিজ্ঞ ডাক্তারদ্বয় পরীক্ষান্তে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন: "টাইফয়েড। তবে চিকিৎসার পূর্বে রক্তপরীক্ষা হওয়া উচিত। রক্তপরীক্ষার ফল আসিলে চিকিৎসা আরম্ভ হইবে।" বন্ধু এতক্ষণ নীরব ছিলেন; এক্ষণে নিকটস্থ হইয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন: "রক্তপরীক্ষা করা উচিত, কিন্তু তার সঙ্গে থুতুরও পরীক্ষা হওয়া ভাল। আমি যা দেখেছি, তাতে মনে হয়—নিউমোনিয়া এবং ভারি।" বিজ্ঞেরা পুনরায় পরীক্ষা করিয়া থুতুও লইয়া চলিয়া গেলেন। মাস্টার মহাশয় বরাবর উপস্থিত ছিলেন। তিনি নবীন ডাক্তারটিকে চিনিতেন না।

বন্ধু লেখককে লইয়া নিজ বাটীতে আসিলেন। রোগীর বিষয়ে প্রথমে বলিলেন: "যদি আমার সিদ্ধান্ত ঠিক হয় আর যদি আমার হাতে চিকিৎসার ভার দেওয়া উচিৎ বিবেচিত হয়, তাহলে আমায় বোলো—চিকিৎসা করব—কিছু দিতে হবে না। একটা কথা কিন্তু আগেই বলি: যেমনটি বলব, ঠিক তেমনটি করতে হবে। ঐসব

পাড়াগেঁয়ে মুখ্যুদের ওপর সেবার ভার দিলে চলবে না—তোমায় সেবা করতে হবে—তাহলে আমি আছি।"

অতবড় ডাক্তারদের সম্মুখে বন্ধুর নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া বন্ধুর উপর একটা শ্রদ্ধা মনে জাগিল আর মনে মনে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতার (যদি সত্যে পরিণত হয়) প্রশংসা করিলাম।

বন্ধু চা আনিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। উভয়ে চা পান করিতে করিতে কথা হইতে থাকিল। প্রথমেই ভূমিকা করিলেন: "আমি নিজেই জানি না, কেন তোমায় এসব কথা বলছি—কিন্তু বলব—এপর্যন্ত কারুকে বলিনি—তোমায়ই বলব ঠিক করেছি আর তোমায়ও শুনতে হবে।" তারপর বলিতে লাগিলেন: "আমায় ইঞ্জেকসন নিতে দেখেছ। এ কি, তা জান?—মর্ফিয়া! আমি মদ খেতে লেগেছি—আফিম খেতে শুরু করেছি—আবার মর্ফিয়া! একমিনিট সাদা চোখে থাকতে চাই না—খালি নেশায় ডুবে থাকতে চাই।" বন্ধু উঠিলেন—দেরাজ খুলিয়া মদের বোতল এবং আফিমের গুলি দেখাইলেন।

না থাকিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: "কেন ভাই এরকম করছ?"

উত্তর করিলেন: "কেন? কেন করছি জানলেই তো হয়ে গেল।"

"এ যে আত্মঘাতী হওয়া—বুঝতে তো পারছ, ভাই।"

"হ্যাঁ, তা বুঝি আর জেনেশুনেই তা করছি। আমার বেঁচে থাকবার দরকার নেই—বাঁচবার সাধও নেই; তাই শেষ করছি।"

তাঁর মর্মান্তিক কথায় এতটা অভিভূত হইয়া পড়িলাম যে, আর থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অনুনয় করিয়া বলিলাম: "বল ভাই, আমায় নিজের জেনে বল—তোমার মনোবেদনা কি, যাতে এতটা অগ্রসর হয়েছ? আমার নিজস্ব কিছুই নেই; তবে একটা জিনিস জানা আছে, যার শরণ নিলে সকল মনোবেদনার শান্তি হয়—সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়—হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়!"

তিনি বসাইয়া হৃদয়পট খুলিয়া দিলেন। বুঝিলাম—তাঁহার স্ত্রীর অকৃতজ্ঞতাই সকল অনর্থের মূল।

বন্ধুর নিকট আপাততঃ বিদায় লইয়া মেডিকেল কলেজে গেলাম এবং সেখান হইতে রক্ত ও পিকের রিপোর্ট লইয়া আসিলে তিনি দেখিয়া বলিলেন ঃ "আমার diagnosis (রোগনির্ণয়) ঠিক। এখন তোমাদের ইচ্ছা।" সেদিনের জন্য বিদায় লইলাম।

শ্রীমার নিকট ফিবিয়া রোগী ও বন্ধুর বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলে তিনি বন্ধুরই হাতে প্রমথকে রাখিতে আদেশ করিলেন এবং পরদিন হইতে তাঁহারই চিকিৎসা চলিতে থাকিল। তিনি যে কেবল চিকিৎসা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, তাহা নহে; অধিকন্তু নিজের হিসাবে এক ডাক্তারখানা হইতে যাবতীয় ঔষধ দিতে থাকিলেন, যতদিন না রোগী নীরোগ হয়।

প্রায় সারাদিন রোগীর পরিচর্যায় থাকিতে হইত, কেবল দ্বিপ্রহরে দুই ঘণ্টার নিমিত্ত বন্ধু নিজের বৈঠকখানায় ডাকিয়া লইয়া যাইতেন আর আমাদের মেলামেশায় উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে থাকে। ফলে তিনি যেসব উৎকট ঔষধ নিজের উপর প্রয়োগ করিতেছিলেন, সেসবের ব্যবহার একে একে পরিহার করিয়া হৃদয়কে স্বচ্ছ কাচের ন্যায় নির্মল করিয়া তুলেন। শ্রীমা দৈনন্দিন খবরাখবর পাইতেছিলেন, কিন্তু বন্ধুবর শ্রীমার বিষয়ে এযাবৎকাল বিশেষ কিছুই জানিতে পারেন নাই—জানিতে দেওয়াও হয় নাই।

মাঝে মাঝে শ্রীমা প্রমথকে দেখিতে যাইতেন। ক্রমে প্রমথ সারিয়া উঠিল। পোড়ের ভাত খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় একদিন মাস্টার মহাশয় নিজ ঝামাপুকুরের বাটীতে শ্রীমাকে লইয়া আসিলেন। এই উপলক্ষে মাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে একটি ছোটখাট উৎসব সেদিন হইল। শ্রীমার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীভক্তেরা ও আমরা প্রায় সকলেই আসিয়াছি।

শ্রীমা সেখানে পূজায় বসিয়াছেন। ভোগের বিলম্ব আছে দেখিয়া বন্ধুর বাটীতে গেলাম। তাঁহাকে তখনই সঙ্গে আসিতে বলায় তিনি

একবস্ত্রে সঙ্গী হইলেন। তিনি হয়তো মনে করিলেন, প্রমথের কিছু হইয়াছে, তাই জামা না পরিয়া কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়াই বাহির হইলেন। কিন্তু ভিন্নপথে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : "কোথা যেতে হবে, ভাই ?" উত্তর পাইলেন : "দীক্ষা নেবে, চল। তাহলে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হবে।" বলিলেন : "আমি যে খেয়েছি।" উত্তর পাইলেন : "মা যা বলবেন, তা-ই হবে।" "আমায় তাহলে মার কাছে নিয়ে চলেছ ?"—"হ্যাঁ, তাঁরই শ্রীচরণ সেই দুর্লভ জিনিস, যার কথা তোমায় প্রথম দিনই বলেছি।"

বন্ধু নিরুত্তর হইয়া চলিলেন। মাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে নিচে বসাইয়া উপরে গিয়া দেখি, শ্রীমার পূজা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও পূজার আসনে বসিয়া আছেন। বন্ধুর উপস্থিতির কথা বলায় তিনি [তাঁহাকে] উপরে আনিতে আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে বন্ধু মাতৃসন্তানমধ্যে পরিগণিত হইলে তাঁহার মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত দেখা গেল। চক্ষুদ্বয়ের কোলে আর সে পূর্ব কালিমা নাই—পরিবর্তে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় এক অপার্থিব জ্যোতিতে ভাসমান—স্পষ্টই দেখা গেল। এখন তাঁহাকে দেখিলে দর্শকের মনে স্বতঃই সেই শ্রুতিবাণী জাগে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষিয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"[২৬]

মাস্টার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে বন্ধু আমাদের সঙ্গে আহারে বসিলেন। গোলাপ-মা বন্ধুকে সর্বাগ্রে শ্রীমায়ের প্রসাদ দিয়া গেলেন। লক্ষ্য করিলাম, বন্ধু ভক্তিসহকারে তাহা খাইলেন। আহারান্তে নিজের অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলি ত্যাগ করিয়া [তিনি] শ্রীমায়ের বাগবাজারে প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। শ্রীমা গাড়িতে উঠিবার সময় [বন্ধু তাঁহার] পদধূলি লইলেন—মা-ও তাঁহাকে বাগবাজারে যাইতে বলিয়া দিলেন।

---

২৬ মুণ্ডক উপনিষদ, ২। ২। ৮—সম্পাদক

পরে বরাবরই শ্রীমার পক্ষ হইতে একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি যে, বন্ধুকে দেখিলে তিনি তিলমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। আমাদের নিকট যেভাবে থাকিতেন, ঠিক সেই খোলাখুলিভাবে বন্ধুর নিকটও থাকিতেন। বলা বাহুল্য, বন্ধুর দীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার সহিত যেসব কথাবার্তা হইয়াছে, সমস্তই মাতৃ-আজ্ঞায়।

বন্ধুবর! তোমার বিষয় লিখিতে লিখিতে আজ অনেক কথা মনে পড়িতেছে। তুমি আজ আনন্দধাম নিবাসী!...

আজ মনে পড়ে ইংরাজী ১৯০৬-১৯০৭ সালে আমায় পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষমোচন কার্যে লিপ্ত জানিতে পারিয়া নিজ বৃত্তি ও উপার্জন অবহেলা করিয়া তোমার বড়বাজার অঞ্চলে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সহস্রাধিক [টাকার] অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ ও প্রেরণ।

আজ মনে পড়ে ভানু-পিসির চক্ষের দৃষ্টি ফিরাইয়া দেওয়া।

আজ মনে পড়ে রামময় বিশ্বাসের উপর অস্ত্রোপচার দ্বারা তাহার প্রাণ ফিরাইয়া দেওয়া।

আজ মনে পড়ে জয়রামবাটীর বড়-পুকুরে উভয়ের একত্রে কতদিন সন্তরণ দেওয়া।

আজ মনে পড়ে তথায় মাতৃসমীপে উভয়ের আহারকালে 'তুমি যে ব্রাহ্মণ আর আমি শূদ্র'—এ জাতিভেদ তাচ্ছিল্য করিয়া আমার পাত হইতে অন্ন কাড়িয়া লওয়া—যাহা দেখিয়া শ্রীমাকে বলিতে হইয়াছিল: "তোমরা দুজনে যেন এক মার পেটের ভাই!" তাহার উত্তরে তুমি বলিয়াছিলে: "তাতো ঠিকই মা! আমরা দুজনেই আপনার সন্তান—ও বড়, আমি ছোট"—ইত্যাদি ইত্যাদি [এইসব] কত কথাই না আজ মনে পড়িতেছে!...

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভগিনী নিবেদিতার স্কুলের গাড়ি পাইলেই উহাতে শ্রীমাকে লইয়া বেড়াইতে যাওয়া হইত। একবার শ্রীমার ফটো তুলিবার বাসনা কালীকৃষ্ণ মহারাজের[২৭] হওয়ায় তাঁহার ব্যয়ে [ও

২৭ স্বামী বিরজানন্দের।—সম্পাদক

বন্দোবস্তে] ঐ গাড়িতে শ্রীমাকে ভ্যান ডাইক কোম্পানীর চৌরঙ্গীস্থ স্টুডিওতে লইয়া যাইয়া তাঁহার ফটো তুলাই।...

[পূর্বোক্ত] ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের ভক্ত ছিলেন। ঘটনাক্রমে আমাদের সহিত আলাপ হওয়ার মাঝে মাঝে শ্রীমার বাটীতে আসিতে থাকেন।

[তাঁহার] এখানে আসিবার আর একটি কারণও আছে—বসুপাড়া লেনে ইহার শ্বশ্রূঠাকুরানী বাস করিতেন। ললিত অফিস যাইবার সময় তাঁহার স্ত্রীকে মাঝে মাঝে ঐখানে রাখিয়া যাইতেন এবং অফিস হইতে ফিরিয়া রাত্রিকালে লইয়া যাইতেন। ঐ উদ্দেশ্যে বসুপাড়ায় আসিলে তিনি শ্রীমার বাটীতে আসিতেন। ললিতের শাশুড়ি আবার যোগীন-মার গঙ্গাস্নানের বন্ধু ছিলেন। এইরূপে ললিতকে বসুপাড়ায় শ্রীমার বাটীতে তাঁহার খুড়ার মৃত্যুদিবসে দেখিয়াছি। সেইদিন শ্মশানঘাটে আমাদের সহিত কয়েকঘণ্টা কথাবার্তার ফলে তিনি ঘন ঘন শ্রীমায়ের বাটীতে আসিতে আরম্ভ করিলেন এবং আমাদের বন্ধুমধ্যে পরিগণিত হইলেন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা এত বৃদ্ধি পায় যে, দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায়ে শ্রীমাকে নিজ ছুতারপাড়া লেনের বাটীতে লইয়া যান এবং একটি ছোটখাট উৎসবের আয়োজন করেন। মাস্টার মহাশয়, ডাক্তার কাঞ্জিলাল[২৮] প্রভৃতি আমাদের কয়েকজনকেও বলেন। শ্রীমার সঙ্গে গোলাপ-মা, যোগীন-মা প্রভৃতি কয়েকজন স্ত্রীভক্তও যান।

আমরা গিয়া দেখি মাস্টার মহাশয় পূর্ব হইতেই আসীন। বন্ধুবর ডাক্তার কাঞ্জিলাল পরে আসিলেন। মহাসমারোহে শ্রীঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগাদি হইবার পর বন্ধু ললিত সস্ত্রীক দীক্ষা লইলেন। এইদিন হইতে তিনি শ্রীমার ও মঠের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীমাকেও লক্ষ্য করিতাম, ললিত ও ডাক্তার কাঞ্জিলালকে দেখিলে ভারি খুশি হইতেন। তাঁহাদের দুইজনকেই অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

একবার ললিত হঠাৎ জয়রামবাটী গিয়া উপস্থিত। যে-তিনদিন

---

২৮ ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল।—সম্পাদক

তথায় রহিলেন, শ্রীমা সদাই উৎসুক ও ব্যস্ত তাহাকে কোথায় বসাইবেন, কি খাইতে দিবেন ইত্যাদির জন্য। যখন তিনি ফিরেন, শ্রীমা কিয়দ্দূর পর্যন্ত আসিয়া আগাইয়া দেন।

একবার ললিতের সাঙ্ঘাতিক অসুখ করে। ডাক্তার কাঞ্জিলাল, ডাক্তার সর্বাধিকারী প্রমুখ বড় বড় ডাক্তার চিকিৎসা করিতে থাকেন। শ্রীমা নিত্যই সেবককে পাঠাইতেন তাঁহাকে দেখিতে। রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় শ্রীমা সেবকের হাতে নির্মাল্য দিয়া বলিয়া দেন ঃ "নির্মাল্যটি তার শিওরে রেখে দেবে আর বলবে, সে সেরে উঠবে—কবরেজি যেন করায়। আমি রোজ ঠাকুরকে তুলসী দিচ্ছি।" সত্যই সেযাত্রা ললিত কবিরাজি চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন।

কলিকাতায় গ্রামোফোন নূতন আমদানি হইলে ললিত উহা আনিয়া কয়েকবার শ্রীমাকে শুনাইয়াছেন। কীর্তনীয়া পান্নারানীর কীর্তন শ্রীমার খুব ভাল লাগে। শ্রীমার কীর্তন ভাল লাগায় পরে আমরা বন্ধু শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের বাটী হইতে গ্রামোফোন আনাইয়া কয়েকদিন উপর্যুপরি শ্রীমাকে শুনাইয়াছিলাম।

নিম্নলিখিত আখ্যায়িকায় শ্রীমার কার্য ও মন্তব্য লক্ষ্য করিবার বিষয় ঃ

মাস্টার মহাশয় তদীয় ছাত্র বিনোদবিহারী সোমকে শ্রীঠাকুরের নিকট লইয়া যান। বিনোদবিহারীর বয়স তখন খুব কম। তাঁহার নাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতেও দেখা যায়। তাঁহার বাটী রামকান্ত বোস স্ট্রীট[২৯]—বাগবাজার। ভক্তগণের নিকট তিনি 'পদ্মবিনোদ' নামে পরিচিত। বহুকাল পরে আমরা যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি, সেই সময় হইতে বর্ণনা করিব সত্য; কিন্তু ইহার পূর্বে তাঁহার জীবনে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে—সেগুলি না বলিলে তাঁহার অ-লৌকিক জীবনী সঠিক বুঝিতে পারা যাইবে না। যৌবনে তিনি থিয়েটারে যোগদান করিয়াছেন আর কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। সকল পার্টেই

২৯ এই রাস্তায় বলরাম মন্দির অবস্থিত।—সম্পাদক

তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র একটি পার্টের বিষয় আমরা উল্লেখ করিতেছি। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে 'মুল্লুকচাঁদ ধূধুরিয়া' পার্ট লইয়া তিনি নামিতেন। উহা এত ভালভাবে তিনি ফুটাইয়া দিয়াছেন যে, তাহার সমকক্ষ অদ্যাবধি কেহ হইতে পারেন নাই। একথা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও তৎপ্রণীত 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে একপ্রকার স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন।

সেকালে থিয়েটারে যাঁহারা যোগদান করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশের জীবনে গুণের সহিত দোষও আসিয়া জুটিত। আমাদের পদ্মবিনোদও প্রচুর মদ্যপায়ী হইয়া উঠেন। এমনকি, আমরা যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি, তখন ঐ আসক্তিতে তিনি একপ্রকার হৃতসর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। শুনিয়াছি, তিনি বলরামবাবুর বাটীতে মাঝে মাঝে শরৎ মহারাজের নিকট আসা যাওয়া করিতেন এবং তাঁহাকে 'দোস্ত' বলিয়া ডাকিতেন। ...

একদিন—রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহরের কম কিছুতেই নহে। আমরা বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে[৩০] সকলে ঘুমাইতেছি। হঠাৎ বদ্ধ জানালায় টোকা মারায় এবং 'দোস্ত, দোস্ত' শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। পদ্মবিনোদ আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া শরৎ মহারাজ আমাদের চুপিচুপি সতর্ক করাইয়া সাড়া দিতে বা দরজা খুলিতে নিষেধ করেন; কেননা, মত্তাবস্থায় তাঁহার চিৎকার করিবার সম্ভাবনা এবং তাহাতে উপরে শ্রীমার নিদ্রাভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। কয়েকবার ডাকিয়া পদ্মবিনোদ অবশেষে "আমি ব্যাটা এত রাত্তিরে এলাম আর তুমি দোস্ত, উঠলেও না, সাড়াও দিলে না!"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয়বার যেদিন আসিলেন, [সেদিন] তখন প্রায় রাত্রি তৃতীয় প্রহর। পূর্ববারের মতো আমাদের আজও সাড়া না পাইয়া তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া শ্রীমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন: "মা, ছেলে এয়েছে তোমার; ওঠ মা"; আর উহা বলিয়াই নেশার ঝোঁকে গান ধরেন (অবশ্য সুকণ্ঠে)—

---

৩০ ২/১ বাগবাজার স্ট্রীটের ভাড়াবাড়ি। শ্রীমা এখানে প্রায় দেড়বছর ছিলেন।—সম্পাদক

"উঠগো করুণাময়ি, খুলগো কুটিরদ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার ।।
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে।
(আমি) ডাকিতেছি মা মা বলে, নিদ্রা কি ভাঙ্গে না তোমার ?"

গানের প্রথম কলির সঙ্গে সঙ্গে উপরে শ্রীমার ঘরের খড়খড়ির একটি পাখি খুলিবার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; আর শরৎ মহারাজ বলেন ঃ "এইরে, মাকে তুলেছে !" গানের চতুর্থ কলির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমার জানালা সম্পূর্ণ খুলিয়া যায়। আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া একটি পাখির একটু নিঃশব্দে খুলিয়া গ্যাসের আলোকে দেখিতে থাকি। শ্রীমার জানালা খুলিবার শব্দে পদ্মবিনোদ "উঠেছ মা ? সন্তানের ডাক কানে গেছে ? উঠেছ তো পেন্নাম নাও"—বলিয়া রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে থাকেন। পরে উঠিয়া সেই স্থানের ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া চলিয়া গেলেন। নিঃশব্দে গেলেন না—পুনরায় তান ধরিয়া গাহিতে গাহিতে গেলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে দূর হইতেও আমাদের কানে আসিতে থাকিল—

"যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
(মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।।"
—"আমি দেখি, দোস্ত যে নাহি দেখে।"

শ্রীমার খড়খড়ি বন্ধ হইয়া গেল। আমরাও তাঁহার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে শ্রীমার নিকট গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "ছেলেটি কে ?" এবং সমস্ত শুনিয়া বলিলেন ঃ "দেখেছ ? জ্ঞানটুকু টনটনে আছে।"

আর একবার ঐপ্রকার গভীর রাত্রে পদ্মবিনোদ আসিয়াছেন। কখন আসিয়াছেন আমরা জানিতে পারি নাই—ঘুমাইতেছিলাম। তাঁহার গানে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আস্তে আস্তে খড়খড়ির একটি পাখি খুলিয়া দেখি—পূর্ব্ববৎ রাস্তায় দাঁড়াইয়া শ্রীমার ঘরের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন—

"শ্মশান ভালবাসিস বলে
তাই শ্মশান করেছি এ হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা, তুই নাচবি
বলে নিরবধি ।।
আর কিছু গো নাই মা চিতে,
দিবানিশি ধূধূ জ্বলছে চিতে।
চিতাভস্ম চারি ভিতে ছড়ায়ে
রেখেছি মা, আসিস যদি ।।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, ফেলে নিয়ে
মা পদতলে।
আয় মা নেচে তালে তালে, হেরব
(আমি) নয়ন মুদি ।।"

গানের প্রভাবে পূর্ব্ববৎ শ্রীমার খড়খড়ি খুলিবার শব্দ হইল। শ্রীমার দর্শন পাইয়া পূর্বের মতো রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়া পদ্মবিনোদ পূর্ব্ববারের মতো গানটি গাহিতে গাহিতে আর উৎপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে শ্রীমা বলিলেন ঃ "দেখেছ—জ্ঞান কি টনটনে ?" বলিলাম ঃ "আপনার যে ঘুমের ব্যাঘাত করেন।" শ্রীমা বলিলেন ঃ "তা হোকগে, বাবা। ওর ডাকে যে থাকতে পারিনে, তাই দেখা দিই।"

পদ্মবিনোদ আর আসেন না; আর শ্রীমার ঘুম ভাঙ্গান না—আর আমাদেরও কৌতূহলী হইয়া তাঁহার কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতে হয় না। এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটিল। পরে একদিন প্রাতে তাঁহার পুত্র (বয়স বার/তের হইবে) শরৎ মহারাজের নিকট আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

শরৎ মহারাজ যখন ফিরিলেন, তখন বন্ধুবর ডাক্তার কাঞ্জিলাল আমাদের নিকট বসিয়া। শরৎ মহারাজ আমাদিগকে সেবার জন্য

প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন; কেননা, পদ্মবিনোদের সাঙ্ঘাতিক অসুখ—শয্যাগত জলোদরে (উদরী—Dropsy)। শুনিয়া বন্ধুবর লাফাইয়া উঠিলেন—নিজ স্বভাবসুলভ সেবাধর্ম দ্বারা পরিচালিত হইয়া চলিলেন আমাদের সঙ্গে রোগশয্যার পার্শ্বে।

রোগীকে দেখিয়া ডাক্তার প্রাণধন বসুর দ্বারা ছিদ্র ('ট্যাপ'—tap) করাইয়া উদরস্থ জল বাহির করাইয়া দিলেন। রোগী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু "লিখিতমিহ ললাটে প্রোজ্ঝিতুম্ কঃ সমর্থঃ ?" —ললাটের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে ? রোগী শয্যাশায়ী হইয়াও অসদুপায়ে মদ্য সংগ্রহ করিতে ছাড়িলেন না। ফলে, পক্ষকালের মধ্যে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। পুনরায় বন্ধুবরের কৃপায় 'ট্যাপ' করা হইল। এবার সপ্তাহকালের মধ্যেই পূর্বাবস্থা প্রাপ্তি। আর 'ট্যাপ' করা চলে না। ডাক্তাররা অস্ত্রোপচার বিনা গতি নাই বলিলেন। রোগীও অত্যধিক ব্যস্ত হইলেন হাসপাতালে যাইতে।

যেসময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তখন জলোদরের অস্ত্রোপচারে কলিকাতায় ব্রাউন সাহেব সর্বাপেক্ষা পারদর্শী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি ভবানীপুরে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাসপাতালে রোগী দেখিতেন। আমাদের রোগীকে তথায় একটি স্বতন্ত্র কামরা লইয়া স্থানান্তরিত করা হইল। সাহেব নিত্য দেখিতে থাকেন আর আমাদের কিছুই বলেন না। বন্ধুবরকে জনান্তিকে বলেন আর আমাদের বলিতে নিষেধ করেন। এইরূপে দুইদিন কাটে। ওদিকে রোগী ব্যস্ত হইয়া পড়েন অস্ত্রোপচারের জন্য। তৃতীয় দিন সাহেব দেখিতে আসিলে রোগী কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সাহেবকে বলেন ঃ "আমি অপারেশন করিতে বলিতেছি; আপনি কেন ইতস্ততঃ করিতেছেন ? শুনিয়াছিলাম, ইংরাজ সাহসী; কিন্তু দেখিতেছি, অন্যরূপ।" সাহেব রোগীর কথা, বিশেষতঃ শেষ কথাগুলি সহ্য করিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতে অস্ত্রোপচারের আদেশ দিলেন।

যথাসময়ে অস্ত্রোপচারের ঘরে রোগীকে লইয়া যাওয়া হইল। বন্ধুবরের বন্দোবস্তে আমরাও ডাক্তার না হইয়াও প্রবেশাধিকার

পাইলাম। ডাক্তার হাজরা আর কলিকাতা হইতে কয়েকজন নবীন ডাক্তার উপস্থিত হইলেন সাহেবের অস্ত্রচালনা দেখিবার উদ্দেশ্যে। ডাক্তার হাজরা রোগীকে অজ্ঞান করিয়া নাড়ি ধরিয়া বসিলেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল সাহেবের সাহায্যে থাকিলেন। উদর চিরিয়াই সাহেব বলিলেন ঃ "এইটা আমার হাতে এখানে এই রোগের ২২ নং রোগী—২১টি আরোগ্য হইয়াছে কিন্তু এইটি বিপরীত হইবে। নলিগুলি পচিয়া গিয়াছে।"

অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে তাঁহার পূর্বকক্ষে আনা হইল এবং কম্বলে ঢাকিয়া চারিধারে গরম জলের বোতল রাখা হইল। হস্তপদ বাঁধিবার উপক্রম দেখিয়া বলিলাম ঃ "ভয় নাই; উঁহাকে বাঁধিবেন না। আমি ভার লইতেছি, উঁহাকে আদৌ নড়িতে দিব না।" নার্সরা ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর ডাক্তার হাজরা আসিয়া বলিলেন ঃ "আপনি যদি রোগীকে তিলমাত্র খাইতে না দিবার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলে আপনাকে রোগীর কাছে থাকিতে দিতে পারি। চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত একটু একটু গরম জল মাত্র দেওয়া যাইবে এবং তাহাও নার্সরা দিবে—আপনি নহেন।" প্রতিশ্রুতি দিলাম।

কিন্তু রোগী জ্ঞান ফিরিয়া পাওয়া হইতে আমাদের পিছনে পড়িলেন, আঙ্গুর খাইবার জন্য। আমরাও দিব না, তিনিও ছাড়িবেন না। শেষে মর্মস্পর্শী স্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা—মাত্র একটি আঙ্গুরের জন্য। সে কাতর স্বর, সে করুণ হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা আজ এই শেষ বয়সেও প্রস্তরে অঙ্কিত রেখার ন্যায় হৃদয়ে জ্বলজ্বল করিতেছে আর নিজেকে ধিক্কার দিতেছি, কেন দিই নাই বলিয়া। হায়! কতবারই না বলিয়াছেন ঃ "এ-ই কি দোস্তি? একটা আঙ্গুর চাইলুম—আর যে কখনো চাইতে আসব না—তবুও দিলিনি?" কি নির্দয় আমি! দিই নাই ডাক্তারের আদেশ পালন করিয়া।

সেদিন ভয়ানক দিন! রোগীকে ছাড়িয়া শ্রীমার বাটীতে খাইতে আসিতে পারিলাম না। বেলা প্রায় চারিটায় রোগীর শ্যালিকার স্বামী দেখিতে আসিয়া আমাকে কিছু খাবার এবং একাকী চুপ করিয়া থাকা

অসহ্য হইতে পারে ভাবিয়া একখানি কথামৃত দিয়া যান। কোন প্রকারে দিন কাটিল—রাত্রি একপ্রহরও কাটিল।

রাত্রি একটার সময় রোগী বলিলেন ঃ "আর বাঁচব না। একটা আঙ্গুর চেয়েছিলুম—দিলিনি। তা না দিয়েছিস, বেশ করেছিস—আর চাইব না। এখন একটা কাজ কর্, দোস্ত! ঠাকুরের কথা শোনা —আমার শেষ হয়ে এসেছে।"

হাতেই কথামৃতখানি বন্ধ করা ছিল। খুলিলাম—খুলিবামাত্র এমন দৃশ্য আসিল, যাহাতে তাঁহারই নাম আছে। পড়িতে লাগিলাম। শুনিতে শুনিতে রোগীর চক্ষুর্দ্বয়ের দুইটি কোণে দুই ফোঁটা জল দেখা দিল আর মুখে একবার মাত্র 'রামকৃষ্ণ' উচ্চারিত হইল—ইহলীলা সংবরণ করিলেন। পদ্মবিনোদ নাম ধরা হইতে মুছিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে আত্মীয়স্বজনেরা খবর পাইয়া আসিয়া জুটিলেন। কেওড়াতলার ঘাটে শেষকৃত্য হইল।

দ্বিপ্রহরে শ্রীমার বাটীতে আসিলাম। সকলের আহার হইয়া গিয়াছিল। নিজের জন্য ঢাকা ভাত শ্রীমার আদেশে উপরে লইয়া গিয়া খাইতে বসিলাম।

খাইতে খাইতে তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন ঃ "তা হবে না?—ঠাকুরের ছেলে যে! কাদা মেখেছিল, তা হয়েছে কি? যাঁর ছেলে, তাঁরই কোলে গেছে।"

শুনিয়া বলিলাম ঃ "যা জানি না—তা মানি না।"

শ্রীমা (সহাস্যে)—"তবে তুমি আবার কি বল?"

"আমি যা দেখেছি, যা জানি, তা-ই বলি। আমি জানি—আপনার দর্শন পেয়েছেন—আপনি তাঁর প্রণামরূপ অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন, তাতে তাঁর এই পরিবর্তন হলো, আর আমিও ঐ দৃশ্য দেখে ধন্য হলাম।"

একদিন প্রাতে উপরে গিয়া দেখি, গোলাপ-মা শ্রীমার নিকট আছেন। আমাদের দেখিয়া শ্রীমা বলিতে লাগিলেন ঃ "গোলাপের অলবড্ডেমি আর গেল না। এই অলবড্ডেমির দোষে কত ধাক্কা দেখেছে, তবু যে অলবড্ডে, সেই অলবড্ডে! বলে, 'স্বভাব যায় না

মলে, ইল্লত [ইজ্জত] যায় না ধুলে'। অলবড্ডেমির দোষে গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে।" জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "সে আবার কবে, মা ?" শ্রীমা বলিলেন ঃ "সে আমার বড়-রাস্তায় কেদারের বাড়ির কাছে থাকতে।" "কোন্ কেদার ?—খোড়ো কেদার ?" শ্রীমা বলিলেন ঃ "হ্যাঁ। রাস্তা পার হচ্ছে—তা দেখেশুনে পার হ বাপু, তা নয়। একেবারে চলেছে। পড়বি তো পড় এক খ্যাপা ঘোড়ার গাড়ির সুমুখে। সামনের দুটো পা তুলে ঘোড়া; আর একটু হলেই তার পায়ের তলায় যেত। খপ্ করে একটা মিন্সে—'মোলো মাগী, মোলো' বলে ওকে টেনে হিড়হিড় করে নিয়ে এল—গোলাপ বেঁচে গেল।

"আর একদিন আমার জগন্নাথ ঘাটের বাড়িতে (গোলবাড়ির নিকট) থাকতে। ওর ঘড়া তো দেখেছ ? ঘড়া নিয়ে গঙ্গা নাইতে গেছে। জলের কাছে ঘড়া রেখে নাইছে। জোয়ার এসেছে। ঘড়া ভেসে চলেছে। ঘড়াও যায় আর গোলাপও তার পেছু পেছু যায়। লোকে হাসছে। শেষে একটা লোক ঘড়াটা ধরে দিলে।

"তাই ওকে বলছিলুম, সংসারে থাকতে গেলে বুঝেসুঝে চলতে হয়। অলবড্ডেমি ছেড়ে দিতে হয়। হুঁসিয়ার হতে হয়। তবে তো লোকের কাছে থাকতে পারা যায়। আমার কাছে এসে হাউহাউ করে কাঁদলে হবে কি ?"

আমরা গোলাপ-মার কি হইয়াছে কিছুই বুঝিলাম না—কেবল শ্রীমায়ের উপদেশগুলি শুনিলাম।

শ্রীমা, অনেক দিন হইল, কলিকাতায় আসিয়াছেন। এক্ষণে দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। মাঝে মাঝে যাইবার কথা হইতেছে, এমন সময় একদিন প্রত্যূষে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "মঠে এখন কে ঠাকুরপূজো করে ?" উত্তরে বলিলাম ঃ "বাবুরাম মহারাজ।" তাঁহাকে ডাকিতে বলিলে, গণেন্দ্রনাথ তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। বাবুরাম মহারাজের হাতে শ্রীমা ঠাকুরের কবচখানি দিয়া নিত্যপূজা করিতে আদেশ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ তৎক্ষণাৎ একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া মঠে উহা লইয়া যান। বাবুরাম মহারাজের যাইবার পর শ্রীমা

বলিলেন ঃ "ঠাকুরের কবচখানি এতদিন আমার কাছে ছিল, মঠে দিলুম,—কি জানি—শরীরের ভদ্দর-অভদ্দর আছে,—কখন কি হয় বলা তো যায় না। হয়তো জ্বরে পরে আছি, হুঁস নেই—কেউ সময় পেয়ে চুরি করে নিলে। দেশ তো দেখেছ। কাউকে বিশ্বেস নেই।"

শ্রীমার দেশে যাওয়া স্থির হইল। এবার নূতন পথে বিষ্ণুপুর হইয়া যাওয়া হইবে। এপথে জয়রামবাটীর নিকট আমোদর নদী ছাড়া আর নদী নাই যে, পার হইতে হইবে। পূর্বে একবার মাত্র পুরী হইতে দিদিমাদিগকে আনিতে এই পথে গিয়াছি; কিন্তু তখন একাকী যাই এবং কোথাও না থামিয়া বিষ্ণুপুর হইতে কোতুলপুর পর্যন্ত শেয়ারের উটের গাড়িতে যাই। কিন্তু এক্ষণে শ্রীমাকে লইয়া যাইতে হইলে পথে চটি, আহারাদি, গরুর গাড়ি ইত্যাদির ব্যবস্থা তাঁহার পৌঁছিবার পূর্বেই করা একান্ত আবশ্যক; সেই হেতু তাঁহার যাত্রার পূর্বদিন রাত্রের গাড়িতে একাকী যাত্রা করিলাম। যাইবার পূর্বে যোগীন-মার আত্মীয় ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর শশীভূষণ দে-র দুইখানি পত্র—একখানি বিষ্ণুপুর থানার উপর এবং অপরখানি কোতুলপুর থানার উপর—সঙ্গে লইলাম।

পরদিন প্রত্যূষে বিষ্ণুপুর পৌঁছিয়া দারোগার সাহায্যে চটি, পাচক ও গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। চটিটি নিকাইয়া শ্রীমার ঠাকুরপূজার জন্য আয়োজন, স্নানের জল এবং আহারাদির বন্দোবস্ত করা হইলে, বেলা দেড়টার সময় গাড়িগুলি লইয়া স্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

পূর্ব বন্দোবস্তমত কৃষ্ণলাল ও গণেন্দ্রনাথ শ্রীমাকে লইয়া প্রাতের গাড়িতে রওনা হইয়াছিলেন এবং বেলা দেড়টার সময় আসিয়া পৌঁছিলেন।

চটিতে উঠিয়া শ্রীমা সকল বন্দোবস্ত পাইয়া খুব খুশি হইলেন। কৃষ্ণলাল ও গণেন্দ্রনাথ রাত্রের গাড়িতে কলিকাতায় ফিরিলেন। খাইতে বসিয়া কৃষ্ণলাল বলিলেন ঃ "এত রকমারি রান্না করেছে—শুক্তুনি থেকে অম্বলটি পর্যন্ত!"

চারিখানি গরুর গাড়িতে শ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ এবং জিনিসপত্র লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোতুলপুর অভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে জয়পুরের নিকট একটা জঙ্গল পড়ে। সারারাত্রি গাড়িগুলি চলিয়া প্রত্যূষে কোতুলপুর পৌঁছে। সেখানে দারোগার সাহায্যে চটি ও ব্রাহ্মণের নিয়োগ করিয়া তাড়াতাড়ি রান্না চড়াইয়া দেওয়া হইল। শ্রীমার জন্য একখানি পালকিরও ব্যবস্থা হইল। আহারের পর পালকিতে শ্রীমা ও রাধু ঠাকুর লইয়া রওনা হইলেন। জ্যৈষ্ঠমাস —বড় গরম—একখানি পাখা ও এক কুঁজো জলও পালকিতে দেওয়া হইল। আমরা বাকি সকলে গরুর গাড়িতে ঘুরপথে গিয়া সন্ধ্যার পর জয়রামবাটী পৌঁছিলাম।

এবার জয়রামবাটীতে একমাসের উপর থাকি। নিত্য নানাপ্রকারের কথা শ্রীমার সঙ্গে হয়। তন্মধ্যে প্রকাশের উপযুক্তগুলি নিম্নে দিতেছি—

কথাপৃষ্ঠে একদিন বলেন ঃ "প্রথম প্রথম যখন শ্বশুরঘর করতে কামারপুকুর যাই, হালদারপুকুরে নাইতে যেতে হবে, একে নতুন বউ, তায় ছেলেমানুষ—ভয়ে জড়সড়, কি করে লোকেদের সুমুখ দিয়ে যাব-আসব? ভয়েভয়ে তো বাড়ি থেকে বেরুলুম—দেখি কিনা আটটি মেয়ে—সমবয়সী, এসে জুটল আর আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'নাইতে যাবে? চল; আমরা তোমায় ঘিরে নিয়ে যাব—কেউ দেখতে পাবে না।' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমরা কে গা?' তারা বললে, 'তুমি নতুন বউ কিনা! আমরা তোমার বন্ধু—তোমার এই কাছেই থাকি।' আমি বুঝলুম, পাড়ার মেয়েরা হবে। তারা আমায় নিয়ে চলল—চারটি মেয়ে আগে আর চারটি আমার পেছনে। নাওয়া হয়ে গেলে আবার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'আমরা রোজ তোমায় খুঁজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, আবার রেখে যাব। তুমি বন্ধু কিনা।' সেই দিন থেকে রোজ আমায় নিয়ে যেত আবার রেখে যেত।"

শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "ওরা কি মহামায়ারূপী আপনার অষ্টসখী?" শ্রীমা বলিলেন ঃ "কে জানে বাপু! তোমার খালি ঐসব

কথা !" বলিলাম ঃ "আপনি ভাঙ্গছেন না। ছাইচাপা বেড়াল কিনা !" তিনি মৃদু হাসিলেন।

একবার জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "মা, শুনতে পাই, ঠাকুরের ভক্ত হরিশ আপনাকে আক্রমণ করেছিলেন—এটা কি সত্য ?" শ্রীমা বলিতে লাগিলেন—"হ্যাঁ বাবা, হরিশ খুব ভাল—ঈশ্বরকোটি। তার বউ তাকে ওষুধ করেছিল। সেই থেকে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। সেদিন কামারপুকুরের বাড়িতে আমি ছাড়া কেউ ছিল না। তার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে সাত-সাত বার ধানের মরাই-এর চারদিকে ঘুরে হাঁপিয়ে পড়লুম। আর যখন পারি না, তখন কি জানি কি ভাব এল, তাকে না ফেলে বুকের ওপর হাঁটুগেড়ে বসে, এক হাতে তার জিভটা টেনে বার করে আর একহাতে তার গালে এক চাপড় দিলুম। আমার হাত ফুলে উঠেছিল। সে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাঁপাতে লাগল। মনে করলুম, হয়ে যায় বুঝি—তখন ছেড়ে দিলুম। সেই থেকে সে আর আসেনি। নিরঞ্জনকে যমের মতো ভয় করত। সে খুব দিত কিনা !"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "সে-সময় বগলা মূর্তি ধারণ করেছিলেন কি ? মঠে তো এইরকমই শুনেছি।" শ্রীমা বলিলেন ঃ "কে জানে বাপু। তখন আমাতে আমি ছিলুম না।" বলিলাম ঃ "আপনি ধরা দেবেন না—ছাইচাপা বেড়াল কিনা !" আবার মৃদু হাসিলেন।

আর একবার ঠাকুরের জন্য শ্রীমার তারকেশ্বরে হত্যা দিবার কথায় বলেন ঃ "যখন কিছুতেই কিছু হলো না, তখন মনে হলো, বাবা তারকনাথের হত্যে দিলে হয়। ঠাকুর আপত্তি করলেন না। দুদিন হত্যে দিয়ে পড়ে আছি, মাঝরাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কুমোরঘরে হাঁড়ির গাদার ওপর এক ঘা লাঠি মারলে যেমন হয়, সেইরকম আওয়াজ মনে হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো—এইতো শরীর ! এ-শরীর থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি ? এই রকমে তো ভেঙ্গে যাবে। মনে হলো, সংসারে কে কার স্বামী—কে কার স্ত্রী ? এই রকম তো একদিন সব ভেঙ্গে যাবে ! কেউ কারুর নয়, মানুষ শরীর ধারণ করে আর ঐ রকমে ভেঙ্গে

যায়। তবে কার জন্যে হত্যে দেওয়া ! জগৎ আমার কাছে ফাঁক হয়ে গেল। আস্তে আস্তে রগুড়ে রগুড়ে মন্দিরের পেছনে গেলুম। নর্দমা থেকে স্নানজল নিয়ে মুখে চোখে দিলুম আর সকাল হতে ফিরে এলুম। ফিরতে দেখে ঠাকুর ইশারা করে জিজ্ঞেস করলেন, আর বুড়ো আঙ্গুলটি নেড়ে বোঝালেন, 'কলাটি হলো তো ?' "

কোন কোন দিন [শ্রীমা] ঠাকুর ও নিজের বিষয়ে অনেক তথ্যপূর্ণ কথা শুনাইতেন। একদিন ঐপ্রকারের কয়েকটি ঘটনা উপর্যুপরি শুনান। সেগুলির ভিতর যেগুলি আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এখানে দিতেছি—

"গোলাপ কি কম গা ? দক্ষিণেশ্বরে আমি ঠাকুরের কাছে যেতুম বলে ওর হিংসে হতো। একদিন বলেই ফেললে, 'তুমি ঠাকুরের কাছে যাও কেন ?' আমি আবার কারুর কথা সইতে পারিনে। কথা শোনবার মতো কাজ তো করিই না, তবে শুনব কেন ? আমি যাওয়া বন্ধ করে দিলুম। তখন কি দিনই গেছে ! দিনান্তে হয়তো একবার ঝাউতলায় যেতে ঠাকুরকে দেখতে পেতুম, নয়তো নয়।—তা-ও দূর থেকে। তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকতুম।

"মেয়েদের কাছে কামারপুকুরে আর এখানেও খালিখালি শুনতুম, ছেলের মা না হলে কোন কাজই সে-মেয়েমানুষ করতে পারে না। বাঁজা কোন শুভ কাজে এয়ো হতে পারে না। আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলুম। ঐসব কথা শুনতে শুনতে আমার মনে দুঃখু হতো—তাইতো, একটা ছেলেও আমার হবে না ? দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঐ কথাটা একবার মনে পড়ে। যেদিন মনে হওয়া—কারুকে কিছু বলিনি—ঠাকুর আপনা হতে বললেন, 'তোমার ভাবনা কিসের ? তোমায় এমন সব রত্ন ছেলে দিয়ে যাব—মাথা কেটে তপিস্যে করেও [যা] মানুষ পায় না। পরে দেখবে, এত ছেলে তোমায় 'মা' বলে ডাকবে, তোমার সামলান ভার হয়ে উঠবে।'

"গোলাপের ঐ কথা বলা থেকে কিছুদিন ঠাকুরের কাছে যাইনি।

"যেদিন প্রথম যেতে হলো—গিয়েই জিজ্ঞেস করলুম, 'আমি তোমার কে ?' তিনি তখনই কালীঘর দেখিয়ে বললেন, 'ওখানে

যে'—তারপর আমায় দেখিয়ে বললেন—'এখানেও সে।' "

শ্রীমার ঐ কথায় আমাদের মনে একটা প্রশ্নের উদয় হওয়ায় জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "মা, সুবোধ মহারাজের[৩১] কাছে শুনেছি, ঠাকুরের দেহত্যাগে আপনি নাকি 'আমার মা কালী কোথায় গেলে গো' বলে কেঁদে উঠেছিলেন ?" শ্রীমা উত্তর করিলেন ঃ "তা বাপু অতশত আমার মনে নেই।" ছাড়িলাম না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "আপনি নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে কিভাবে দেখতেন ?" প্রথমে সঠিক উত্তর পাইলাম না। অনেক ধরাধরির পর স্পষ্ট উত্তর পাইলাম ঃ "আমিও ঐ ভাবে দেখতুম।"

উপরোক্ত কথাবার্তায় কি জানি কেন শ্রীমার মন ঠাকুরের দেহত্যাগের দিকে গেল। তিনি আরও বলিতে থাকিলেন ঃ "যেদিন ঐরকম হবে, [সেদিন] সকাল থেকেই ওলটপালট হতে থাকল। ছেলেদের জন্য খিচুড়ি রাঁধছিলুম, ধরে গেল—ওপর ওপর তাদের দিয়ে তলারটা আমরা খেলুম। আমার একখানা লালপেড়ে কোঁচানো দিশি শাড়ি ছিল—কি জানি কোথায় গেল—কেই হয়তো চুরি করে নিয়ে গেল। জলের কুঁজোটা ছিল—তুলতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল !"

বিষয়টি আবার ঘুরাইয়া লইয়া শ্রীমা বলিতে থাকিলেন ঃ "একদিন খাবার হাতে তাঁর ঘরে (দক্ষিণেশ্বরে) ঢুকতে যাচ্ছি, একটি মেয়ে [এসে] বললে, 'আমায় দাও না মা, আমি নিয়ে যাচ্ছি'। তাকে অমনি দিলুম। ঠাকুর কিন্তু খেতে বসেন না। মেয়েটি থালা রেখেই চলে গেছে। জিজ্ঞেস করতে ঠাকুর বললেন, 'তুমি ওর হাতে দিলে কেন ? ওকে কি জান না ? এখন ওর ছোঁয়া খাই কি করে ?' অনেক মিনতি করায় এলেন বটে, তবে বলে দিলেন, আর যেন কখনো ওকে না দিই। হাত জোড় করে আমি বললুম, 'সেটি তো আমি পারব না,

৩১ স্বামী সুবোধানন্দের।—সম্পাদক

ঠাকুর। আমায় "মা" বললে আমি তো থাকতে পারব না। আর তুমি তো খালি আমার ঠাকুর নও—তুমি তো সক্কলের।' তবে খুশি হয়ে খেলেন।

"ঠাকুর যখন কথা কইতেন—বলছেন তো বলছেন—কথা ফুরোতে চাইত না। আমি শুনতে শুনতে মেজেয় আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়তুম। মেয়েরা আমায় ঠেলে তুলতে যেত, বলত—'অমন কথা সব শুনলে না ?' ঠাকুর তাদের বারণ করতেন—'ওকে তুলো না, ও যদি সব শোনে তো ও থাকবে না—চোঁচা দৌড় দেবে।' "

একবার শ্রীমাকে বলি, স্বামীজীর মুখে শুনেছি, "ঠাকুর বলরামবাবুর বাড়ির অন্ন খেতেন" ? মা বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, আমায় বলেছিলেন, 'আমার বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন। ওরা জগন্নাথের ভোগ দেয়। তুমি খাবে।' "

স্বামীজী ও বাবুরাম মহারাজের হাতের ছোঁয়া অন্ন তো ঠাকুর খেয়েছিলেন ?—এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমা বলিলেন ঃ "নরেনকে সবতাতে টেনে না। আর বাবুরাম ?—ঈশ্বরকোটি—তার শ্রীমতীর ভাব—ঠাকুর বলতেন !"

ইহার পর জয়রামবাটীতে কয়েকবার যাইতে হয়। কোনবারে একমাসের কম থাকি নাই। একবার তো আড়াইমাস ছিলাম। বেশিরভাগই একাকী গিয়াছি। একবার নিত্যগোপালের শিষ্য ভব এবং নাদু (ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ)[৩২] সঙ্গে যান। একবার কালীকৃষ্ণ মহারাজ, একবার ডাক্তার কাঞ্জিলাল এবং একবার শ্রীমার সহিত গোলাপ-মা ও কুসুম যান। জয়রামবাটী অবস্থানকালে কখনও কোতুলপুর হাট হইতে, কখনও বা কামারপুকুরের হাট হইতে বাজার করিয়া আনিতাম। কামারপুকুরে আবলুস কাঠের জিনিস—হুঁকার এবং গড়গড়ার নল, বেলন ইত্যাদি অতি সুন্দর ও মজবুত তৈয়ারি হয়। এখান হইতে অল্পদূরে গড় ও পরিখাবেষ্টিত মান্দারণ[৩৩] গ্রাম।

৩২ স্বামীজীর ভাগ্নে।—সম্পাদক

৩৩ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র লীলাস্থল—গড় মান্দারণ। এখান হইতে অত্যল্পদূরে উত্তরে কাঁটালী নামক গ্রামের শিবমন্দিরে দুর্গেশনন্দিনীর সহিত জগৎ সিংহের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

এখানকার মশারির থান ও গামছা প্রসিদ্ধ। কলিকাতার ভক্তমণ্ডলীর জন্য ঐসব দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। এসব হইল অবান্তর কথা। এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে পুনরায় আসা যাক।

১৩১২ সালের জগদ্ধাত্রী পূজার উপকরণাদি লইয়া কলিকাতা হইতে গেলে শ্রীমা পূর্ণোদ্যমে পূজায় যোগদান করিলেন, কারণ, পূর্ববৎসর তিনি কলিকাতায় ছিলেন বলিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতেই পূজা হইয়াছিল। এবার পূজার প্রথম দিন বেলা প্রায় এগারটা পর্যন্ত অবিরাম পরিশ্রমহেতু শ্রীমা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখনও জল পর্যন্ত খান নাই। অনেক মিনতির পর ঠাকুরপূজায় বসিলেন। সেবককে দ্বারদেশে বসাইয়া রাখিলেন, যাহাতে পূজার সময় কেহ তাঁহাকে বিরক্ত না করে। সে ততক্ষণ বসিয়া তাঁহার জন্য মিছরির জল প্রস্তুত করিতে থাকিল।

পূজান্তে মিছরির জল খাইতে খাইতে বলিলেন ঃ "আর এখন (পূজামণ্ডপে) যাচ্ছি না—না-ডাকলে যাব না—একটু বসি।" সেবক[৩৪] বলিল ঃ "ঠাকুরকে আর আপনাকে আবার তো আসতে হবে—এবার বাউলরূপে।" শ্রীমা পান খাইতে খাইতে বলিলেন ঃ "তোমাদেরও কারুর নিস্তার নেই। যারা এবার এসেছে, সক্কলকে আসতে হবে—কেউ বাদ যাবে না। আকাশে চাঁদ দেখেছ তো ? চাঁদ কি একলা ওঠে ? চারিদিকে তারাগুলোকে নিয়ে তবে ওঠে।" সেবক বলিল ঃ "তাতে আমরা খুব তয়ের, আপনাকে তো পাব।"

এই ঘটনা লিখিতে লিখিতে যুগপৎ দুইটি ঘটনা মনে আসিতেছে। সে-দুইটি এখানে দিলে রসভঙ্গ হইবে না। প্রথম, শ্রীঠাকুরের শরীর হইতে যে বসা-অবস্থার ছবি তুলা হয়, শুনিয়াছি সেই নেগেটিভ হইতে প্রথমবারে বারখানি ছবি ছাপানো হয়। এই বারখানির হিসাব আমরা জানি না। যে-তিনখানির হিসাব আমরা জানি, সেই তিনখানির বিষয়ে এখানে বলিতেছি। একখানি যোগীন-মা নিত্যপূজা করিতেন—এখানি, যেসময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তখন বেশ ম্লান হইয়া আসিয়াছে।

৩৪ লেখক স্বয়ং।—সম্পাদক

দ্বিতীয়খানি বেলুড়মঠে পূজা হয়। এখানিও কথঞ্চিৎ ম্লান হইয়াছে। তৃতীয়খানি শ্রীমা পূজা করিতেন। এখানি ম্লান হওয়া দূরে থাকুক, দেখিলেই বোধ হইবে যেন সবেমাত্র তুলা হইয়াছে। আমাদের এই বৃত্তান্ত ১৩১৮ (বঙ্গাব্দ) পর্যন্তের।

দ্বিতীয়, শ্রীমার একটি বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি: কলিকাতায় অবস্থানকালে যেদিন পূজান্তে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমা বলিয়াছেন : "তোমার বুঝি কলকাতার সন্দেশ-রসগোলা ভাল লাগছে ? জয়রামবাটীর বড়পুকুরের জল আর তুলসী রোচে না বুঝি ?"—তখনই বুঝিতে হইবে, শ্রীমা দেশে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন—ভক্তদের শত অনুনয়-বিনয় বিফল হইবে।

শ্রীমার এক সেবক[৩৫] অপ্রত্যাশিতভাবে জয়রামবাটীতে আসিয়া উপস্থিত। শ্রীমা তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : "তুমি যে এলে; গেলে না ?" সেবক বলিল : "আপনাকে তো চিঠি দিয়েছিলাম।" শ্রীমা—"আমি তো তোমায় বদরিনারায়ণ হয়ে তারপর আসতে লিখে দিয়েছি।" সেবক—"ছয়দিন অপেক্ষা করে চিঠি না পেয়ে সিধে চলে এসেছি।" শ্রীমা—"বোকা ছেলে ! দুদিন আর থাকতে পারনি ? হৃষীকেশ থেকে চিঠি আসতে-যেতে কি মোটে ছদিন লাগে ? তা সকালবেলা কোত্থেকে এলে ? কোন্ পথে এসেছ ?" সেবক—"কাল সন্ধ্যার আগে বর্ধমানে নেমেছি; তারপর সিধে এখানে এলাম।"

শ্রীমা—"সারারাত হেঁটেছ ? বর্ধমান কি এখানে গা ? যাও, বেশ করে তেল মেখে নেয়ে এস—ঠাণ্ডা হও। সিংহবাহিনীর পূজোর পালা আজ বরদার। একটা পাঁঠা পড়েছে। মহাপ্রসাদ এনেছে। আমি এখন রাঁধতে হেঁসেলে চললুম। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা তোমার কথা শুনব।" নলিনীকে বলিলেন : "তোর দাদা নেয়ে এলে মুড়ি দিস।" নিকটস্থ কুঞ্জ নামক মনিষকে (ভৃত্য, যে কৃষিকার্য করে) বলিলেন : "তোর দাদাবাবু সারারাত ধরে হেঁটে এসেছে। ওকে বেশ করে তেল মাখিয়ে দে।"

---

৩৫ নাম প্রকাশে নিষেধ আছে।

দ্বিপ্রহরে শ্রীমা ও সেবকে যে-কথাবার্তা হইল, তাহার মর্ম এইপ্রকার ঃ

সেবক শ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া বদরিকাশ্রম ভ্রমণে বহির্গত হয়। তাহার সঙ্গী জনৈক সাধু, যিনি শ্রীমার সন্তান বা বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত নহেন। দুইজনে হৃষীকেশে গিয়া ধনরাজ গিরির 'কৈলাস' নামক আশ্রমে অতিথি হন। প্রত্যূষে উঠিয়া সঙ্গীকে নিদ্রিত দেখিয়া সেবক একাকী শৌচাদি সমাপন করিয়া ঝাড়িতে[৩৬] সাধু দেখিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিতে দেখিতে ঝাড়ির উত্তর সীমায় পৌঁছিলে [সে এক] করুণ আর্তনাদ শুনিতে পায়। উহা লক্ষ্য করিয়া এক কূপের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বুঝিতে পারে, সে ধ্বনি নারীকণ্ঠনিঃসৃত। তখন কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে, এক নেপালী সাধুনী মৃত্যুমুখে পতিতা—কেবল চিৎকার করিতেছেন ঃ "য়ে মাঈ, য়ে মাঈ,—অভী তক নেহি ভেজি ?" দণ্ডায়মান সেবকের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র হিন্দিতে বলিলেন ঃ "এসেছ ?—শীঘ্র এস—কাছে বস—যা বলি তা কর—আমার আর দেরি নেই।" শুনিয়া সেবক অবাক ! কি বকিতেছেন ! হয়তো বিহ্বল হইয়া বকিতেছেন। যাহা হউক, দেখা যাক—ভাবিয়া নিকটে গিয়া বসিল। নেপালী-মাঈর টনটনে জ্ঞান। বলিতে থাকিলেন ঃ "সন্দেহ করো না—মাকে জিজ্ঞাসা করো—তিনি একটি সন্তানকে আমার শেষ সময়ে পাঠাতে প্রতিশ্রুত আছেন।" সেবক হতভম্ব, অথচ এই অলৌকিক ব্যাপারের শেষ দেখিতে উৎসুক !

"এখন যা বলি তা কর" বলিয়া নেপালী-মাঈ নিজ উপাধানের তলদেশ নির্দেশ করিলেন। সেবক সেস্থান হইতে চল্লিশ টাকা এবং দেবনাগরী অক্ষরে লেখা একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি পাইল। মাঈ বলিলেন ঃ "আমি মরিয়া গেলে শরীরটা সাধুদের সাহায্যে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবে

৩৬ যেস্থানে সাধুরা ছোট-বড় 'কূপ' নির্মাণ করিয়া বাস করেন। ঝাড়ি দুইটি আছে—বড় এবং ছোট। 'কূপ' দেখিতে ধানের মরাইয়ের মতো—'ফুশ' নামে খড়বিশেষে প্রস্তুত।

আর চতুর্থ দিনে ঐ টাকায় সাধুদের ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করিবে। পুঁথিটি তিনদিনের মধ্যে মুখস্থ করিয়া লইবে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পূর্বে গঙ্গায় ফেলিয়া দিবে। মন্ত্রগুলি পরের হিতের জন্য অনুষ্ঠানে লাগাইবে —নিজের জন্য কদাপি নয়।"

মাঈর নিকট পাঁচ মিনিটের জন্য অবকাশ লইয়া সেবক ক্ষিপ্রগতিতে ধনরাজ গিরির আশ্রমে গিয়া সঙ্গীর দেখা না পাইয়া বলিয়া আসিল, সঙ্গী যেন একাকী বদরিকাশ্রমে যায়; তাহার যাওয়া হইবে না—সম্ভবতঃ বাঙ্গলাদেশে ফিরিতে হইবে।

ফিরিয়া দেখে, মাঈর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। "য়ে মাঈ, য়ে মাঈ" বলিতে বলিতে নেপালী-মাঈ শরীর ছাড়িয়া দিলেন। শেষ-কৃত্য সমাপন করিয়া সেবক কালী-কম্বলীবাবার ধর্মশালায় গিয়া অধ্যক্ষ নাথজীর সহিত দেখা করিল এবং টাকাগুলি জমা দিয়া ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করিল। পরে ধর্মশালার একখানি ঘর লইয়া পুঁথিটি মুখস্থ করিতে লাগিল। ঘর লইয়াই সর্বপ্রথমে শ্রীমাকে সংক্ষেপে এবং অপর কেহ না বুঝিতে পারে, এমনভাবে একখানি পত্র লিখিল—তাঁহার নিকট আসিবে কিনা জিজ্ঞাসাও করিল। অনুষ্ঠানপদ্ধতিসহ পুঁথিখানি মুখস্থ হইলে নির্দিষ্ট সময়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিল। নেপালী-মাঈর মৃত্যু দিবস হইতে সর্বশুদ্ধ ছয়দিন হৃষীকেশে শ্রীমার পত্রের অপেক্ষায় থাকিয়া উহা না পাওয়ায় এক্ষণে জয়রামবাটী আসিয়াছে।

সম্পূর্ণ কাহিনী শুনিয়া শ্রীমা বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিল, শেষ সময়ে একটি না একটি ছেলেকে পাঠাতে। মেয়েটি খুব ভাল। অনেক রকম অনুষ্ঠান জানত। কাশীতে আমার কাছে আসত, পঞ্চতপা করতে আমায় বলেছিল।" সেবক জিজ্ঞাসা করিল, ঐসব অনুষ্ঠান সে করিবে কিনা। শ্রীমা বলিলেন ঃ "করবে বইকি। যাতে লোকের উপকার হয়, তা করতে হয়। তবে, নিজের মন সায় দিলে করবে—নাহলে নয়।"

অপর একদিন শ্রীমা নিজের ঘরে বসিয়া গিরিশচন্দ্রের জয়রামবাটী আসিবার গল্প করিতেছিলেন। গ্রামের লোকেরা মূর্খ—গিরিশবাবু

থিয়েটার করেন শুনিয়া মনে করিয়াছে গান গাহিতে খুব পারেন। তাই তাঁহাকে গাহিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। গিরিশবাবু যত বলেন, তিনি গাহিতে জানেন না, তাহারা ততই তাঁহাকে গাহিতে জিদ করে। অগত্যা তাহাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য দুইখানি গান গাহেন। এই গল্প শ্রীমার মুখে শুনিয়া লেখকের সাধ হয়, শ্রীমাকে গাহিতে অনুরোধ করার। সে ধরিয়া বসে, দুইখানি গানের মধ্যে যেকোন একখানি গাহিতে। [শ্রীমা] প্রথমে ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। অবশেষে অনেক বলায় ঘরের বাহিরে কেহ নাই খবর লইয়া নিম্নলিখিত দুই ছত্রমাত্র গাহিলেন—

"হামা দে পালায় পাছু ফিরে চায় রানী পাছে তোলে কোলে,
রানী কুতূহলে ধর ধর বলে, হামা টেনে তত গোপাল চলে।"

—গান শুনিয়া লেখকের প্রতীতি জন্মিল, শ্রীমার গলা সুমিষ্ট বটে, তবে একটু গ্রাম্য টান উহাতে আছে।

শ্রীমা নিজের লেখাপড়ার বিষয় একবার বলিতেছিলেন। কি করিয়া ঘরের বউ হইয়া কামারপুকুরে লুকাইয়া লক্ষ্মী-দিদির নিকট পড়িতেন—লক্ষ্মী-দিদি পাঠশালায় পড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে পড়াইতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। উহা শুনিয়া লেখকের মনে তাঁহাকে দিয়া লিখাইবার বাসনা জাগে। অমনি সে ধরিয়া বসে। তিনিও লিখিবেন না, সে-ও ছাড়িবে না। অবশেষে "তবে তোমার নাম লিখি"—বলিয়া শ্রীমা, [লেখক] একখণ্ড কাগজ আনিয়া দিলে, উহার উপর লিখিলেন। অদ্যাবধি সেই লেখা আমাদের নিকট আছে।

একবার পাগলীমামীর তাস খেলিবার খেয়াল হইলে শ্রীমাকে খেলিবার জন্য জিদাজিদি করিতে থাকেন। অনেক পীড়াপীড়িতেও যখন শ্রীমা খেলিবেন না দেখেন, তখন তাঁহার দুইটি চরণ জড়াইয়া ধরিয়া সম্মতি প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীমা বলেন ঃ "আমায় নাহয় রাজি করালি, কিন্তু আরও তো দুজন চাই—কাকে ডাকতে যাবি ?" তিনি বলিলেন ঃ "কেন ? নলিনীকে আনছি আর আশুকে বাইরে থেকে ডেকে আনব।" তাহাই করিলেন। শ্রীমার কাছে গিয়া দেখি, তাঁহার

ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতা এবং তাস হাতে মামী ও নলিনী বসিয়া। শ্রীমা ভিতর হইতে বলিলেন ঃ "এস, তাস খেলতেই হবে—পাগলীর জেদ।" মামীকে বলিলাম ঃ "মা-তে আমাতে না হলে কিন্তু খেলব না।" তিনি সম্মতা হইলেন। খেলা আরম্ভ হইল। গ্রাবু খেলা। প্রথমেই একখানি ছক্কা। মামী রাগিতে শুরু করিলেন। তারপর পর পর পাঁচবারে একখানি পঞ্জা। মামীর রাগ ধাপে ধাপে চড়িতেছিল। পঞ্জা হওয়ায় তাস ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন ঃ "তোমরা খালি খালি জিতবে বুঝি, ঠাকুরঝি, আর আমরা হারব ?—না ?" শ্রীমা উত্তর করিলেন ঃ "আমরা সৎপথে, সাত্ত্বিক—আমরা জিতব না তো কি তোরা জিতবি ?" দূর হইতে মামীকে বলিতে শুনা গেল ঃ "হেঁ-গো-হেঁ!"

শ্রীঠাকুরের পাঠশালার সহপাঠী গণেশ ঘোষাল মহাশয়ের বাটী কামারপুকুরে। লেখক কামারপুকুর গেলেই [তিনি] তাহাকে খাওয়াইতেন এবং ভালবাসিয়া "হনুমান" বলিয়া ডাকিতেন। একদিন লেখকের সঙ্গে আনুড় ও তাজপুর হইয়া শ্রীমাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী আসেন। শ্রীমা গলবস্ত্রা হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে উদ্যতা হইলে তিনি "আপনি যে মা, আপনার কি ওরকম করতে আছে ? ছেলের যে অকল্যাণ হবে"—বলিয়া নতজানু হইয়া [শ্রীমাকে] প্রণাম করেন।

শ্রীমার হাতের রান্না—মহাপ্রসাদ (বলিপ্রদত্ত মাংস) হইতে আরম্ভ করিয়া সব রকমই খাইয়াছি। আমরা কলিকাতার ছেলে। বলিতে পারি, তিনি একজন পাকা রাঁধিয়ে—তাঁহার রান্না ঠিক কলিকাতার মতো।

জয়রামবাটীতে একদিন একটি কৌতুকজনক ঘটনা ঘটে। প্রাতঃকালে শৌচাদি হইতে ফিরিবার সময় শ্রীমার জন্মস্থানের নিকটে একটি জলপূর্ণ ডোবায় অনেকগুলি কুচকুচে কাল কচুশাক-ঝাড় দেখিতে পাই। ভাবি, এখানকার লোকগুলি কি বোকা—কচুশাক খাইতে জানে না। নতুবা এতগুলি শাক কি পড়িয়া থাকিত ? কেহ না

কেহ তুলিয়া লইয়া যাইত। ইহা ভাবিয়া অনেকগুলি শাক তুলিয়া পিঠে করিয়া লইয়া শ্রীমার নিকট উপস্থিত হই। তিনি তো দেখিয়া হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না, তবু (সম্ভবতঃ সন্তানকে মনঃকষ্ট না দিবার অভিপ্রায়ে) মুখে বলিলেন ঃ "এদেশের লোকে কচুশাক খেতে জানে না—রাঁধতে তো জানেই না। তা যাই হোক, আমি রাঁধব।" জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কোথা পেলে?" বলিলাম ঃ "বাঁড়ুয্যেদের ভিটের সামনে ডোবায় হয়েছিল।"

"জলের শাক? ও তো খুব কুটকুটে! বোকা ছেলে। জোলো শাক কুটকুটে হয় তা জান না?"—ইহা কহিয়া দেখেন, সন্তানের পিঠ ফুলিয়াছে—হাত দুইটিরও অবস্থা প্রায় তথৈবচ। তাড়াতাড়ি তৈল আনিয়া মালিশ করিতে বসিলেন। অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম ঃ "এরকম ফোলা বা কুটকুটুনিকে আমি কেয়ার না করলেও আপনাকে যে বিব্রত হতে হয়েছে তা আমার বরাবর মনে থাকবে—আর কখনো করব না।" মালিশ হইয়া গেলে বলিয়া দিলেন ঃ "এখন নাইতে যেও না; তেলটা আগে শুকুক। নাহলে জল লাগলে আবার কুটকুট করবে।"

তারপর বঁটি, কুরুনি ও নারিকেল আনিয়া নিজের দুই হাতে তৈল মাখিয়া শাক কুটিতে বসিয়া গেলেন। ততক্ষণ নারিকেলটা ভাঙ্গিয়া কুরিতে লাগিলাম। খাইবার সময় অনেকটা শাক দিলেন। অতি উপাদেয় রান্না—একটুও কুটকুট করে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনবার তেঁতুলসহ সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিয়া নিঙরাইয়াছেন এবং চতুর্থবারে রাঁধিয়াছেন।

মাঘ মাস। বেশ শীত। প্রাতঃকালে সদরে বসিয়া আমরা রৌদ্র পোহাইতেছি। পূর্বদিন শিরোমণিপুরে হাট হইয়া গিয়াছে। ঐ হাটের পরদিন প্রায় প্রত্যেকবারে একটি স্ত্রীলোক জয়রামবাটীতে তরকারি বিক্রয় করিতে আসে। শ্রীমা তাহার নিকট [হইতে] মূল্য দিয়া তরকারি খরিদ করিয়া থাকেন আর দিদিমা ধান, সরিষা ইত্যাদির বিনিময়ে [উহা লন]। আজও সে স্ত্রীলোকটি আসিয়াছে। দিদিমা কিছু কিনিলেন। কিনিয়া শৌচে গেলেন। আসিয়া ঢেঁকিশালে ধান

কুটা হইতেছিল, সাহায্য করিয়া শেষ করিলেন। আবার শৌচে গেলেন। ফিরিয়া কালী-মামার দাওয়ায় শুইয়া পড়িলেন। ডাকিয়া বলিলেন ঃ "ভাই, আর বাঁচব না—মাথা কিরকম করছে। ছেড়ে যেও না—কাছে থাক।" শ্রীমাকে ডাকিয়া লইলাম। তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কি কষ্ট হচ্ছে, মা ?" নাড়ি দেখিতে বলিলেন। দেখিয়া বলিলাম ঃ "বুড়ো হাড়, কিছু বলা যায় না।" এসময় দিদিমার কোন পুত্রসন্তান নিকটে নাই। আর একবার শৌচে গেলেন। শ্রীমা ধরিয়া কলুপুকুরের পাড়ে লইয়া গেলেন। [দিদিমা] ফিরিয়া বলিলেন ঃ "কুমড়োর ঘ্যাঁট খুব খানিকটা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।" শ্রীমা উত্তর করিলেন ঃ "কুমড়ো তো ভারি জিনিস। সেরে ওঠ, খাবে।" পুনরায় শুইয়া পড়িলেন।

বলিলেন ঃ "আর খেতে হবে না। লাতির (নাতির) হাতে জল খেতে হয়।" শ্রীমা তাড়াতাড়ি গঙ্গাজল লইয়া আসিলেন—তিনবার [তাঁহার] মুখে দিলাম। শ্রীমাকেও দিতে বলিলাম—তিনিও তিনবার দিলেন। নাড়ি দেখিলাম। পাইলাম না। শ্রীমাকে চুপিচুপি বলায় তিনি দিদিমার মস্তকে ও বুকে জপ করিয়া দিলেন। জপের সঙ্গে সঙ্গে দিদিমার চক্ষু দুইটি কপালে উঠিল—ইহলীলা সংবরণ করিলেন। বাড়িতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বেলা তখন আন্দাজ নয়টা।

বরদা-মামা মাঠে ছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল। কালী-মামা মড়াগেড়েয়। তাঁহাকে খবর পাঠানো হইল। খবর পাইয়া সকলে একত্র হইলেন। যথাসময়ে আমোদরতীরে দিদিমার শেষকৃত্য সমাপন হইল।

দিদিমার বিষয়ে যাহাকিছু শুনিয়াছি, এখানে দিলে মন্দ হইবে না। দিদিমা নিজ কন্যার (আমাদের শ্রীমার) বিবাহ দিয়া প্রথম প্রথম সুখী হন নাই। তিনি নাকি সর্বদা "একটা পাগলার সঙ্গে" [কন্যার] বিবাহ হওয়ায় আক্ষেপ করিতে করিতে বলিতেন ঃ "মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিইছি !" এ-অনুযোগ, এ-আক্ষেপ ততদিন তাঁহার মুখে স্থায়ী ছিল, যতদিন না শ্রীমার সাংসারিক অবস্থা ভাল হয় এবং

যতদিন না শ্রীমায়েরই জন্য দিদিমার সংসারে আয় হইতে থাকে। এখানে ইহাও বলা উচিত যে, তিনি কখনও শ্রীমাকে পতিসকাশে পাঠান নাই—শ্রীমা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই বরাবর গিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন দিদিমার সংসার ধনধান্যে ভরিয়া যাইতে থাকে, তখন হইতে তাঁহার নাতি-নাতনিদের উপর একটা মায়া দেখা দেয় এবং ঐরূপে ক্রমান্বয়ে তাঁহার একটা স্নেহও তাহাদের উপর পড়িয়া যায়। শেষে তাঁহার সংসার তাঁহার নিকট "লাতি-লাতনির" সংসার হইয়াই দাঁড়ায়। তখন তাঁহার সংসারে "শিব আছে, ব্রহ্মা আছে, বিষ্ণু আছে" বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হয়। আমরা যাহা এ বিষয়ে শুনিয়াছি বা জানি, তাহাই লিখিলাম।

শ্রীমার ভাই-ভাজেদের অযথা আবদারের মাত্রা সময়-সময় এতটা বৃদ্ধি পাইত যে, তাঁহার পৃথিবীর ন্যায় সহ্যগুণ থাকা সত্ত্বেও উহার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইত এবং বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কয়েকবার বলিতে শুনিয়াছিঃ "ওরে, আমি যে আঁস্তাকুড়ে পদ্ম ফুটেছি—ঠাকুরও তা-ই—গোবরবনে পদ্ম!"

দিদিমার মৃত্যুর পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীমা ভায়েদের এবং লেখককে ডাকিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শ্রাদ্ধে যেন কোন ত্রুটি না হয়। ফর্দ তৈয়ার হইল এবং দ্বিপ্রহরের ভোজনান্তে লেখক কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল।

কলিকাতায় তিনদিনের মধ্যে সমস্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া তিনখানি গরুর গাড়িভরা মালসহ চতুর্থদিনে [লেখক] জয়রামবাটী পৌঁছিল। শ্রাদ্ধে ঘটা হইল—পঁচিশটি পিতলের ঘড়া, ছাতা, আসন ও খড়ম দান হইল। দিদিমার শেষ বাসনামত শ্রাদ্ধে কুমড়োর ঘ্যাটও প্রচুর পরিমাণে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ-ভোজনে দেওয়া হইল।

শ্রাদ্ধে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে শ্রীমার শরীর সাতিশয় খারাপ হইয়া পড়ে এবং সে হৃতস্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিতে মাসাধিক কাল লাগিল।

শ্রীমার ঘরের দাওয়ায় একটি খাঁচা ঝুলিত। উহাতে 'গঙ্গারাম' নামে একটি টিয়াপাখি থাকিত। উহাকে বাড়িশুদ্ধ লোকে "পড় বাবা,

গঙ্গারাম" বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতেন, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার সুদীর্ঘকালের মধ্যে একবারও গঙ্গারামকে একটি অক্ষরও পড়িতে শুনিলাম না। তবে তাহাকে খাঁচার ভিতর এদিক হইতে ওদিকে করিতে এবং তাহার জাতিবুলি 'ট্যা ট্যা' শব্দ করিতে লক্ষাধিক বার দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। আর তিনি যে ভোজনে বিশেষ পটু, তাহার সাক্ষ্য দিতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। বরদা-মামা কোথাও হইতে তাহাকে আনিয়াছিলেন এবং খাদ্যের স্বচ্ছলতা হইবে ভাবিয়াই বোধহয় শ্রীমার এখানে রাখিয়াছিলেন।

বরদা-মামার একটি নেড়িকুত্তা ছিল। একদিন তিনি অকস্মাৎ অন্তর্ধান হন। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া শেষে শিহড় গ্রামের শেষ প্রান্তে এক গৃহস্থের বাটীতে [মামা] তাঁহার সন্ধান পান, কিন্তু সে-গৃহস্বামীর নিকট হইতে আনিতে পারেন না। ভাগ্যক্রমে বন্ধুবর ললিত সাহেবি পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া পালকি করিয়া জয়রামবাটী আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত। অমনি বরদা-মামা ললিতকে কুত্তা উদ্ধারার্থে পাঠাইবার জন্য শ্রীমাকে অনুনয়-বিনয় করিতে থাকেন। শ্রীমা বিরক্ত হইয়া লেখককে বলেন। যথাসময়ে কুত্তাটি ফিরিয়া আসিল; গৃহস্বামী ললিতকে ঐ পরিচ্ছদে দেখিয়া বোধহয় দারোগা ঠাওরাইয়াছিলেন।

শ্রীঠাকুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া যোগীন মহারাজ বড়বাজার হইতে একখানি কড়া কিনিয়া আনেন। জিজ্ঞাসা করিয়া ঠাকুর জানিতে পারেন যে, তিনি দুই-চারিটা দোকানে দর যাচাই না করিয়া, একটিমাত্র দোকান হইতে, দোকানদার যে দাম চাহিয়াছে, তাহাই দিয়া লইয়া আসিয়াছেন। উহা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ধমকাইয়া বলেন : "ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন ?—যা, নবতে মন্তর নিগে যা।" ইহাই হইল তাঁহার শ্রীমার নিকট দীক্ষিত হইবার সূত্রপাত।[৩৭]

---

৩৭ যোগীন মহারাজের (স্বামী যোগানন্দের) মন্ত্রদীক্ষা তখনই হয়নি, হয়েছিল অনেক পরে—শ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পর শ্রীমা যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন।—সম্পাদক

ঠাকুরের সন্তানেরা শ্রীমাকে আপাদমস্তক (শ্রীচরণদ্বয় ব্যতীত) চাদরে আবৃতা দেখিতে পাইতেন—ইহা বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। সারদা মহারাজ শ্রীমার নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণকালে বীজসহ মন্ত্রোচ্চারণ শুনিতে পান এবং করজপপ্রথা শিখিবার সময় দক্ষিণ করতলটি দেখিতে পান। যোগীন মহারাজের বেলায়ও তাহাই হইয়াছিল।

লেখকের অপেক্ষা প্রাচীন শ্রীমায়ের একটি সন্তানের নিবাস কলিকাতা সার্পেন্টাইন লেনে। দীক্ষিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত [তিনি] শ্রীভগবানের মূর্তিবিশেষের উপাসক ছিলেন। দীক্ষিত হইলেন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তিতে। ফলে উঁহার হৃদয়ে মহা অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—জীবন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে থাকে। একরূপ হতাশ হইয়া পড়েন। এইরূপে কিছুদিন কাটিবার পর অপর এক ভ্রাতার সাহায্যে মাতৃসমীপে নিবেদন করিবার সুযোগ পান। শ্রীমা বলিয়া দিলেন ঃ "মন্তর ঠিক হয়েছে।" শ্রীমায়ের এইটুকু বাণীর প্রভাবে ধীরে ধীরে মন বসিয়া অন্তে [তাঁহার] হৃদয়ে অশান্তির স্থানে মহাশান্তি বিরাজ করে!

শ্রীমাকে লিখিত ভক্তদের পত্রাদি পড়িবার ও সে-সকলের উত্তর লিখিবার ভার লেখকের উপর কয়েক বৎসরের জন্য ন্যস্ত হয়। এই কার্যকালের মধ্যে একবার এমন এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ তাহার হয় যে, আজও সে উহা ভুলিতে পারে নাই। শ্রীমার নামাঙ্কিত চিঠিগুলি সে পূর্বে খুলিত না বা পড়িত না। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহার সম্মুখে লইয়া গিয়া খুলিত বা পড়িত।

সেদিন পাঁচখানি চিঠি আসিয়াছে—তিনখানি পোস্টকার্ড এবং দুখানি খাম। লেখক প্রথমে একখানি খাম খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। পত্রখানি জনাই হইতে শ্রীশ—র লেখা। তিনি লিখিয়াছেন ঃ "মা, শ্রীচরণে শতকোটি প্রণামপূর্বক নিবেদন এই যে, দাস—" আর পড়া হইল না। ছয় পৃষ্ঠা চিঠি—মনে মনে পড়িতে কিছুক্ষণ লাগে।

ততক্ষণ শ্রীমা তাহার [লেখকের] দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। তাঁহার দিকে দেখিবামাত্র বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল। ভাবিল, জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবে সে? উত্তর ঠিক করিতে না পারিয়া চিঠিখানি আলাদা করিয়া রাখিয়া অপর চিঠিগুলি পড়িয়া শুনাইল। শ্রীমা চুপ করিয়া সব শুনিলেন। শ্রীমাও কি কি উত্তর লিখিতে হইবে, বলিয়া দিলেন। সব শেষ হইলে শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন: "ওখানা পড়লে না কেন?" আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল তাহার মাথায়। কি উত্তর দিবে? একে গুরু—তায় মাতৃরূপা—আবার মাতৃরূপা বলে মাতৃরূপা—স্বয়ং মা! কখনও যে মাকে অ-বলা তাহার কিছুই নাই। তথাপি এ-চিঠি সে কেমন করিয়া পড়িবে? ইহা যে অতীত জীবনের এমন সব কুকার্যের বর্ণনায় ভরা যাহা মনুষ্যে কি করিয়া সম্ভবপর হয়, তাহা মনুষ্যমাত্রেরই অগোচর। সঙ্গে সঙ্গে কি অকুতোভয়তা, কি অকপটতা সহকারে নিজ পাপকীর্তি ব্যক্ত করা!—ইহার যে প্রশংসা না করিয়াও থাকা যায় না।

যাহা হউক, শুষ্ক ওষ্ঠে কম্পিতস্বরে [লেখক] উত্তর করিল: "কি করে পড়ব মা? পারছি না যে।" শ্রীমা বলিলেন: "বুঝেছি, পড়তে হবে না। তাকে এরকম চিঠি লিখতে বারণ করে দাও। আমার চিঠি ছেলেরা-মেয়েরা পড়ে শোনায়। দেশে কেউ না থাকলে ভায়েরা পড়ে। আর লিখে দাও—'আগে ছিলে রাহুখেগো চাঁদ, এখন ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে হয়েছ পূর্ণিমার ষোলকলায় পূর্ণ!—ভাবনা কিসের? ঠাকুরই সব ঠিক করে দেবেন।'"

পাঠক-পাঠিকে! শ্রীমার ঐ উক্তিতে কিছু সাহিত্যানুরাগ দেখিতেছেন কি? যদি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভুলিয়া যাইবেন না যে, আপনাদের শ্রীমা আপনাদের ঠাকুরের ন্যায় একপ্রকার নিরক্ষরা।

শ্রীমা একবার মেজমামীকে বকিতেছিলেন: "তোরা একটা-আধটা ছেলে নিয়ে ন্যাতাজোবড়া হয়ে থাকিস—মানুষ করতে পারিস নে, আর আমি না-বিইয়ে কানাইয়ের মা—হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে

মানুষ করে দিতে হচ্ছে—কেউ সাধু, কেউ অসাধু—হয়তো মাথা খারাপ করে এসে বলছে—'মা, আমার কিনারা কর !'—এসব কথা তোরা বুঝবি কি ? তাদের তো আর সে আধার নেই। তোরা জানিস টাকা, ধান, মরাই, বাড়ি, ঘর, দোর। তোরা যেমনটি এসেছিস, তেমনটিই যাবি। বলে—ভাগ্যে মনুষ্যজন্ম হয়। সেই মনুষ্যজন্ম পেয়ে তোরা করলি কি ?"

জয়রামবাটীতে আমার একবার জ্বর হয় এবং কিছুদিন ভুগি। সেই জ্বরে শ্রীমার উদ্বেগ ও পরিশ্রমের কথা এক্ষণে মনে হইলে দারুণ কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি; আবার সময় সময় মনে হয়, অতি ভাগ্যের কথা—তাঁহার শ্রীহস্তের সেবা লাভ করা ! তাঁহার শুশ্রূষা জীবনে ভুলিবার নহে ! যে-উদ্যমে তিনি শুশ্রূষা করিয়াছিলেন এবং যে-পারদর্শিতা উহাতে দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি একজন শিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণীর অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিলেন না।... তাঁহার ঐরূপ করায় তখন মনে ধিক্কার আসিত—কোথায় সন্তান মায়ের সেবা করিবে, না মা সন্তানের করিতেছেন দেখিয়া। তাঁহাকে রোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু ফলে ধমক খাইয়া নিরস্ত হইতে হইয়াছে। তাঁহার একই উত্তর ঃ "মা করবে না তো কি ও-পাড়ার লোকে করবে ?"

জ্বর বাড়িলে যখন মাথায় হাত বুলাইতেন, তখন তাঁহাকে না-শুনাইয়া মনে মনে গাহিতাম—

"যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে পদ না ধ্যানে পায়।
নির্গুণেরই কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।"

ঐ প্রকার একদিন জ্বর আসিয়াছে আর তিনি মাথায় হাত বুলাইতেছেন। বেশ মনে আছে, জ্বরের দমকে দুইটি চরণ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি—"বলতে হবে, আপনি কে ? আজ আর ছাড়ছি না।" তৎক্ষণাৎই উত্তর পাই ঃ "ওসবে তোমার কি ? তোমার কাছে আমি মা !"—নিরস্ত হইয়া বর প্রার্থনা করিলাম ঃ "এই স্নেহ চিরকাল পাব তো ?" উত্তর হইল ঃ "হ্যাঁ, এখানে জোয়ার-ভাটা নেই।"...

একদিন ঠাকুরের দেহত্যাগের দিনের কথা পাড়িয়া বলিতে থাকেন —"যখন ঐরকম হলো, লোকাচার মানতে গিয়ে হাতের বালা খুলতে যাচ্ছি—ঠাকুর সুমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখতে পেলুম; বললেন, 'আমি কি কোথাও গেছি যে, বালা খুলছ ? এঘর থেকে ওঘরে গেছি যে।' হাতের বালা হাতেই রইল, আর খুলতে হলো না। ভাবলুম—লোকে যা বলে বলুক—লোক না পোক; খুলব না। আর একবার বৃন্দাবনে —র খোঁটায় খুলতে গিয়েও ঐ রকম দেখলুম।"

"ঠাকুর কি সদা সর্বদা আপনাকে দেখা দেন, আপনার হাতে খান, এখনও ?"

"আমরা কি আলাদা ?"—উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে জিভ কাটিয়া বলিলেন ঃ "কি বলে ফেললুম !"

ছোটমামীর কিছু অলঙ্কার ছিল। পিতা গচ্ছিত রাখিবেন বলিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া সেগুলি লইয়া যান। পরে চাহিলেও দেন না। বন্ধুবর ললিত জয়রামবাটী গেলে গহনাগুলি উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীমা তাঁহাকে মাঝটিয়া গ্রামে পাঠান। ব্রাহ্মণ ললিতকে দারোগা ভাবিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকেন। ললিত তাঁহাকে মালসহ শ্রীমার নিকট হাজির করেন এবং নাক-কান মলাইয়া কন্যাকে [অলঙ্কার] ফেরত দেওয়াইয়া নিষ্কৃতি দেন।

১৩১০ সালে লেখক জয়রামবাটী অবস্থানকালে শরৎ মহারাজের একখানি চিঠি পায়। উহাতে লেখা থাকে, গিরিশচন্দ্রের শারদীয়া পূজা করিবার বাসনা এবং তাঁহার ও ন-দির (গিরিশচন্দ্রের দিদি, নাম—দক্ষিণা) উভয়ের একান্ত ইচ্ছা যাহাতে শ্রীমা সেসময় উপস্থিত থাকেন —প্রত্যুতঃ শ্রীমা না-উপস্থিত হইলে তাঁহাদের পূজা ব্যর্থ হইবে। অতএব তাঁহাকে আনিবার সাধ্যমত চেষ্টা যেন সে করে, আর আসা ঠিক হইলে, খরচের টাকা তাঁহারা পাঠাইবেন। তখন শ্রীমার শরীর অতিশয় খারাপ ছিল, তথাপি তাঁহাকে সম্মত করানো হইল। ছোটমামী ও রাধু তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

যথাসময়ে বিষ্ণুপুর পৌঁছিয়া একটি চটিতে মাস্টার মহাশয় এবং ললিতকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা যায়। তাঁহারা সকলের জন্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে শুনা যায়, কলিকাতায় মারদাঙ্গা হইতেছে—রাত্রে শহর অন্ধকার। সেজন্য তাঁহারা আগাইয়া আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিলে গণেন্দ্রনাথকে ও ললিতের ঘোড়ার গাড়ি দেখা যায়। গণেন্দ্রনাথের মুখে শুনা যায়, শরৎ মহারাজ এবং গিরিশচন্দ্রের মত—শ্রীমাকে হাওড়া হইতে একেবারে নৌকোযোগে বাগবাজারের ঘাটে লইয়া যাওয়া—উহাতে কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। কিন্তু শ্রীমা নৌকা চড়িতে ভয় পান। সেজন্য ললিতের কম্পাস গাড়িখানির ভিতরে শ্রীমা প্রভৃতিকে বসাইয়া একদিকের পাদানিতে ললিত, অপরদিকে লেখক; কোচবাক্সে গণেন্দ্রনাথ এবং চালে জিনিসপত্রসহিত মাস্টার মহাশয়কে রাখিয়া গঙ্গার ধার দিয়া কুমারটুলি ঘাটাভিমুখে গাড়ি চালানো হইল। পরে কুমারটুলির ভিতর দিয়া রাজবল্লভপাড়া হইয়া বলরামবাবুর বাটীতে আসা হয়। এখানেই শ্রীমার থাকিবার ব্যবস্থা হয়। পথিমধ্যে কোন হাঙ্গামা হয় নাই। কেবল একবার একদল ছেলে আসিয়া স্ত্রীলোক দেখিয়া ছাড়িয়া দেয়।

পরদিন প্রাতে গিরিশচন্দ্র এবং ন-দিদি আসিলেন শ্রীমাকে প্রণাম ও নিমন্ত্রণ করিতে। ন-দিদি বলিলেন ঃ "গিরিশ তো বেঁকে বসেছিল, মা। বলে, 'মা না-এলে পূজো করব কাকে নিয়ে ?—করবই না।' "

এখনও পূজার বিলম্ব আছে। শ্রীমাকে আনিয়া পুনরায় জ্বরে পড়িলাম। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ দেখিয়া ঔষধ ও সাগু পথ্যের ব্যবস্থা দেন। শরৎ মহারাজ ডাক্তারের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের পক্ষে। কিন্তু সাগু খাইতে যে পারি না। একমাত্র শ্রীমা ইহা জানেন; কিন্তু তিনি বাড়ির ভিতরে থাকেন, পরের বাড়ি—দেখা সাক্ষাৎ যখন-তখন হইবার নহে। চুপ করিয়া পড়িয়া আছি—হলঘরের এক পার্শ্বে। অপর পার্শ্বে শরৎ মহারাজ আছেন।

বেলা আন্দাজ নয়টার সময় শরৎ মহারাজের অলক্ষ্যে বাহির হইতে রাধু ইসারা করিয়া ডাকিল এবং কিছু ফল ও মিষ্টি হাতে দিয়া বলিল ঃ "মা দিয়েছে।" নিঃশব্দে খাইয়া আসিয়া শুইয়া পড়ি। ঐ প্রকারে শ্রীমা দ্বিপ্রহরে রুটি ও মিষ্টি, বৈকালে ফল ও মিষ্টি এবং রাত্রে শরৎ মহারাজের অনুপস্থিতিতে পেটভরা রুটি ও তরকারি পাঠাইয়া দেন। এদিকে বাড়ির ভিতর হইতে সাগুও আসিতে থাকে। সাগু ফেলিয়া দিয়া তরকারির বাটির উপর সাগুর বাটি—শরৎ মহারাজের ভয়ে রাখিয়া দিই। ঐপ্রকারে শ্রীমা গোপনভাবে খাওয়াইয়া আরোগ্য করেন।

গিরিশচন্দ্রের দুর্গাপূজা ধূমধামের সহিত আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমার সম্মুখে কল্পারম্ভ হইল। গিরিশচন্দ্র ও ন-দিদির মহা আনন্দ। গিরিশচন্দ্র লেখককে বলিলেন ঃ "তুই মাকে এনে আমায় কিনে রাখলি।" ন-দিদি পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এ-বৎসরেও একখানি নববস্ত্র দিলেন। মহাসপ্তমীর দিন প্রাতঃকাল হইতে বলরামবাবুর বাটীতে ভক্তসমাগম হইতে থাকে। শ্রীমার নিকট এত ভক্তসমাবেশ পূর্বে কখনও হইতে দেখা যায় নাই। লোকের পর লোক, দলের পর দল আসিয়া কেহ কেহ প্রণাম, কেহ বা পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, আর শ্রীমা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে দাঁড়াইয়া ভক্তের প্রণাম ও পূজা গ্রহণ করিতেছেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সপ্তমীপূজার সময় খবর আসিলে গিরিশভবনে গিয়া পূজার শেষ পর্যন্ত রহিলেন। সেখানেও তাঁহার বিশ্রাম নাই। ভক্তদের পূজার পর পূজা লইতে হইল। একই পূজার দালানে একদিকে প্রতিমার পাদমূলে স্তূপীকৃত পত্রপুষ্পরাশি, অপর দিকে সজীব প্রতিমা শ্রীমায়ের চরণতলে ভক্তদের ভক্তি-অর্ঘ্য-চিহ্ন-স্বরূপ বিল্বদল ও তুলসীসহ চন্দনে চর্চিত পদ্মজবাদি নানাবিধ পুষ্পরাশি। সে এক অভাবনীয় অপূর্ব শোভা!

শ্রীমা সকল ভক্তেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন—একজনও বাদ পড়িল না। কিন্তু তিনি তো আর মৃৎ-প্রতিমা নহেন—মানবশরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া মানবশরীরের চিরন্তন নিয়মাবলী তাঁহাতে তো

খাটিবে। একে তো জয়রামবাটী হইতে শরীর খারাপ ছিল—এক্ষণে সপ্তমীর রাত্রি হইতে আরও খারাপ হইল।

এইবার মহাষ্টমী। এদিন বিধিমতে পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। অতি প্রত্যূষ হইতে শ্রীমার নিকট ভক্তগণ আসিতে থাকিলেন—স্ত্রীভক্ত, পুরুষভক্ত, ত্যাগিভক্ত, গৃহিভক্তের বিরাম নাই। মধুমক্ষিকার ন্যায় তাঁহারা শ্রীমাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। সকলেরই বাসনা, সেই চরণসরোজে ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া মধু আহরণপূর্বক পান করেন। গিরিশভবনেও সেই প্রকার। শ্রীমাও অসুস্থ শরীরে তিলমাত্র কাতর হইলেন না, ভক্তসাধ পূরণ করিতে অচলভাবে চাদর মুড়ি দিয়া সকলের নিকট পূজা লইলেন। ফলে দিবসব্যাপী পরিশ্রমে তাঁহার শরীরে জ্বর দেখা দিল। তিনি শুইয়া পড়িলেন। একে জীর্ণ-শীর্ণ দেহ, তাহাতে অত পরিশ্রম। ঠিক হইল সন্ধিপূজায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। সেই মর্মে সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল ন-দিদি ও গিরিশচন্দ্রকে। উভয়েই মুহ্যমান হইয়া আক্ষেপ করিতে থাকিলেন।

সে-বৎসর আবার সন্ধিপূজা গভীর রাত্রে। আমরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। গোলাপ-মা ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলিলেন ঃ "মাকে নিয়ে যেতে হবে—মা যাবেন—এখন একটু ভাল বোধ করছেন।"

বলরামবাবুর বাটীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ সরু গলি দিয়া শ্রীমা ও স্ত্রীভক্তগণকে লইয়া গেলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, শরীর নিস্তেজ হইলেও [শ্রীমা] গিরিশের জন্য যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প—শরীর চলিতে পারিতেছে না, তথাপি জোর করিয়া যেন চালাইতেছেন। টলিতে টলিতে চলিতেছেন ঠাকুরের বীরভক্ত গিরিশচন্দ্রের মর্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত। গিরিশভবনের খিড়কিদ্বার তখন আবদ্ধ। তাঁহাদের অপেক্ষা করাইয়া খিড়কিদ্বার খুলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সদরদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দেখি, ইতিমধ্যে শ্রীমা দ্বারে আঘাত করিয়া বলিতেছেন ঃ "আমি এসেছি!" ব্যাকুল গিরিশ দরজা খুলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাটীতে রোল পড়িয়া গেল ঃ "মা এসেছেন, মা এসেছেন" বলিয়া। গিরিশচন্দ্র আনন্দে বিভোর হইলেন। সেই

রাত্রেও ভক্তগণের পূজা ও প্রণামের বিরাম রহিল না। ঐ প্রকারে নবমী ও দশমী কাটিল। মহাপূজা সাঙ্গ হইল। এদিকে ভক্তবৎসলা শ্রীমার শরীর ভক্তগণের জন্য তিলে তিলে ক্ষয় হইতে থাকিল। এপ্রকার ভক্তের ভিড়ে তিনি অভ্যস্তা নহেন। অতএব কলিকাতা ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছামাত্রই তো কার্য হইবে না। তিনি যে ভক্তদের। ভক্তদের সম্মতি চাই। সে-সম্মতি পাইতে কয়েকদিন লাগিল।

শ্যামাপূজার পরে যাইবার জন্য অব্যাহতি পাইলেন। শ্রীমার যাত্রার দিন স্থির হইলে, উপর্যুপরি দুইখানি পত্র প্রত্যহ একখানি হিসাবে কালী-মামাকে লেখা হয়, যাহাতে তিনি লোকজন লইয়া এবং পালকি পাইলে একখানি পালকিও লইয়া নির্ধারিত দিনে দেশড়া গ্রামে উপস্থিত থাকেন—যেন শ্রীমার যাইতে কোন প্রকার অসুবিধা বা কষ্ট না হয়—একথা বার বার পত্রদুইখানিতে লেখা হয়। একই মর্মের দুইখানি পত্র দুইদিনে ডাকে ছাড়িবার উদ্দেশ্যে ছিল যে, যদি কালী-মামা একখানি দৈববশে না পান, অপরখানি তো পাইবেনই।

যাহা হউক, যথাকালে যাত্রা করিয়া বিষ্ণুপুর ও কোতুলপুর হইয়া এবং দেশড়া গ্রাম পার হইয়া মাঠে যখন পড়ি, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। একে তো শ্রীমার শরীর অতি খারাপ, তায় ভায়েদের সংসারে থাকিলে তাঁহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়; এইসব কারণে তাঁহার সেবার্থে এবার গোলাপ-মা ও কুসুম আসিয়াছেন। বিষ্ণুপুর হইতে গরুর গাড়িতেই সকলে দেশড়া পর্যন্ত আসি।

দেশড়ার মাঠে পৌঁছিয়া দেখি, 'কা কস্য পরিবেদনা'। পালকির কথা দূরে থাকুক, কালী-মামারও দেখা নাই, অধিকন্তু মনিষ (যে-চাকর চাষবাস করে) ও বাগালের (রাখাল) মোট ছয়জনের মধ্যে একজনেরও চিহ্নমাত্র নাই। তথা হইতে গরুর গাড়িতে যাইতে হইলে শিহড় হইয়া ঘুরিয়া যাইতে হয় আর রাস্তা অতি কদর্য—ক্রমাগত ঝাঁকানি খাইতে হয়। ইহাতে শ্রীমাকে লইয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইবে। তিনিও সম্মত হইলেন না। অতএব

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করা হইল, গাড়িগুলিতে গোলাপ-মা এবং কুসুমের জিম্মায় মাল দিয়া শিহড়ের পথে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, আমরা বাটীতে পৌঁছিয়া চাকর পাঠাইয়া দিব, তাহারা শিহড়ে গিয়া গাড়িগুলিকে লইয়া আসিবে। আর দেশড়ার মাঠটুকু ও নদীর অপর পারে জয়রামবাটীর সামান্য একটু মাঠ শ্রীমা পদব্রজে যাইতে পারিবেন।

শ্রীমার ঠাকুরের জন্য একটি ছোট কালরঙের টিনের বাক্স ছিল—উহাতে কোথাও যাতায়াতের সময় ঠাকুর, গোপাল, সিংহবাহিনীর মাটির কৌটা, জপের মালা ইত্যাদি রাখিতেন আর ছেলেদের খেলাঘরের খাটের মতো একটি ছোট খাট ছিল, তাহাতে ঠাকুরের বিছানা লইতেন।

গাড়িগুলি পূর্বোক্তরূপে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীমার আদেশে ঠাকুর ও রাধুকে লইলাম। কিন্তু শ্রীমা একাকী চলিতে চলিতে পড়িয়া যাইতে পারেন ভাবিয়া রাধুকে পিঠে, ঠাকুরের বাক্স ও খাট একহাতে এবং অপর হাতে শ্রীমাকে ধরিয়া লইয়া চলিলাম। ছোটমামী পিছনে চলিতে থাকিলেন। রাস্তা সকলেরই বিশেষরূপে পরিচিত—ছোটমামীর সর্বাপেক্ষা বেশি, অল্পদূর যাইতে না যাইতে ছোটমামী বলিয়া উঠিলেন ঃ "ওবাগে কুত্থাকে যাচ্ছ ? এবাগে এস।" শ্রীমা মামার না-আসায় বা লোক না পাঠানোয় চটিয়া ছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেহেতু অন্যমনস্ক ছিলেন। বলিলেন ঃ "সত্যিই তো, এদিকে চল। ছোটবৌয়ের পথ সব জানা আছে। ও তো মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়।" রাস্তা ভালরূপে জানা ছিল, তথাপি তখন হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদের দর্শিত পথে চলিলাম। ফলে নদীর ধারে ঘাটের পরিবর্তে এক আঘাটায় আসিয়া উপনীত হইলাম। সঙ্গে আলোও ছিল না।—অন্ধকারে কোথায় আসিয়াছি জানিবার উপায়ও নাই!

শ্রীমা রাগিয়া বকিতে থাকিলেন। বলিলাম ঃ "এখানে আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, নদীর ধারে ধারে গিয়ে ঘাট দেখে আসি, তারপর নিয়ে যাব।" তিনি সম্মত না-হইয়া বলিলেন ঃ "কোথায় তেপান্তরের মাঠে আমরা দাঁড়াব—তোমায় যেতে হবে না।" ইহা বলিয়া বকিতে

থাকিলেন—সে বকুনি বাটী পৌঁছানো পর্যন্ত স্থায়ী রহিল। প্রত্যুতঃ, অতক্ষণ স্থায়ী বকুনি তাঁহার মুখে কখনও শুনি নাই।

যাহা হউক, সেই আঘাটায় নদী পার হওয়া গেল। নদীতে জল ছিল না বলিলেই হয়। পার হইয়া চলিতে থাকিলাম। কিন্তু বুঝা গেল না যে, আমরা জয়রামবাটীর দিকে অগ্রসর হইতেছি অথবা শিহড়ের দিকে। শ্রীমার চলিতে কষ্ট হইতেছে।... চলিতে চলিতে কত বকুনিই না খাইলাম—"তুমি বেটাছেলে হয়েছ কেন ? আমাদের কথা শুনলে কেন ! তোমার মেয়েমানুষ হওয়াই ভাল ছিল" ইত্যাদি। মায়ের বকুনিতে ছেলের কিছু আসে যায় না, বরং উহা ছেলের পক্ষে মঙ্গলকর। আর তখন মনোনিবেশ বকুনির দিকে ছিল না—ছিল কেবল তাঁহার কষ্টের দিকে।

যাহা হউক, ঐ প্রকারে চলিতে চলিতে দূরে একটি ক্ষীণ আলোকরেখা দেখা গেল। সকলে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম : "কেগা আলো নিয়ে যায় ? আমাদের এদিকে একটু ধর না—আমরা পথ ভুলে গেছি।" আলো আমাদের দিকেই আসিতে লাগিল। শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন : "কেগা তুমি ?" প্রদীপহস্তে স্ত্রীলোকটি শ্রীমার [গলার] শব্দ চিনিতে পারিয়া আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসিল : "কে, সারু ?" শ্রীমা বলিলেন : "কে, আশুর মা ?" আশুর মা প্রণাম করিয়া শ্রীমায়ের প্রশ্নের উত্তর দিল : "তোরা বাছা ঠিকই তো এসেছিস; তবে একটু আড় হয়ে এসেছিস, তাই গাঁয়ের বাইরে এসে পড়েছিস।" প্রদীপ হস্তে আশুর মা পথ দেখাইয়া চলিল। দুই তিন মিনিটের মধ্যে গ্রামে আসিলাম।

বাটীতে পৌঁছিয়াই শ্রীমা ভাজেদের নিকট জল চাহিলেন। দাওয়ায় বসিয়া একঘটি জল খাইলেন। চাকরগুলিকে গাড়ির অন্বেষণে পাঠাইয়া কালী-মামাকে বকিতে আরম্ভ করিলেন। কালী-মামা পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার করিলেন এবং চাকর না-পাঠাইবার কারণে নানা অজুহাত দেখাইলেন। পালকি পাওয়া যায় নাই। একঘণ্টার মধ্যে চাকরগুলি গাড়ি লইয়া ফিরিল। ইত্যবসরে শ্রীমা

একটু সুস্থ হইয়া সন্তানকে বকিয়াছেন বলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সে পদধূলি মস্তকে লইল।

গোলাপ-মা একদিন শ্রীমার সমক্ষে বসিয়া সারদা মহারাজের বিষয়ে গল্প করেন—"যোগেন (যোগীন-মা) একবার মার বাড়ির জন্যে সারদাকে বেশ ঝাল দেখে লঙ্কা আনতে বলেছে। সারদা বাগবাজার থেকে আরম্ভ করে সব দোকানে যায় আর লঙ্কা চাখে—ঝাল কি না? ঐ রকম চাখতে চাখতে ঝাল না পেয়ে বড়বাজারে গিয়ে হাজির। সেখানে ঝাল পেয়ে দু-পয়সার লঙ্কা কিনে নিয়ে আসে। ততক্ষণে তার জিভ ফুলে ঢোল।—বাবা, কি গুরুভক্তি!"

একদিন শ্রীমা স্নানান্তে কলসিপূর্ণ জল নিজ দাওয়ায় রাখিলে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি, তিনিও অন্যান্য বালিকার ন্যায় বালিকা-বয়সে কলসি ধরিয়া সাঁতার কাটিতে শিখিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে শ্রীমা একটি পিতল-নির্মিত গোপাল লইয়া আসিয়াছিলেন। আমরা এই গোপালকে শ্রীমার ঠাকুরের সিংহাসনে নিত্যই দেখিয়াছি। একদা এই গোপালের বিষয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"আগে ওকে এই রকম রেখে দিয়েছিলুম। একদিন শুয়ে আছি—দেখি না, হামা টেনে টেনে খাটের কাছে এসে বলছে, 'আমায় যে আনলে, এমনি ফেলে রেখেছ, আমার কি খিধে পায় না?—খেতে দেবে না?'—শুনে বললুম: 'না বাবা, খেতে দোব বই কি!' সেই থেকে ওকেও খেতে দিতে হয়।"

স্বামীজীর ভক্ত—তিনটি মার্কিন মহিলা আমেরিকা হইতে শ্রীমাকে পত্র লিখিতেন। খামের উপর [বর্তমান] লেখকের নাম ও ঠিকানা এবং ভিতরে শ্রীমাকে সম্বোধন করিয়া পত্র দিতেন। লেখক, অনুবাদ করিয়া, শ্রীমা দেশে থাকিলে সেখানে পাঠাইত আর কলিকাতায় থাকিলে পড়িয়া শুনাইত। উত্তর—শ্রীমা যেরূপ আদেশ করিতেন, সেইরূপ দিত।

শ্রীমার ঐরূপ একখানি পত্রের অংশবিশেষ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি। বলা প্রয়োজন যে, শ্রীমা তখন দেশে এবং লেখক কলিকাতায়ঃ

"বাবাজীবন আশু, তুমি দেবমাতাকে (মার্কিন মহিলা)[৩৮] আমার আশীর্বাদ জানাইবে আর জয়াকেও (মার্কিন মহিলা)[৩৯] আমার আশীর্বাদ দিবে। আর যিনি আমাকে চন্দনকাঠের বাক্স দিয়াছেন (মার্কিন মহিলা), তাঁহাকেও আমার আশীর্বাদ জানাইবে। বলিবে, মা তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। আর দেবমাতাকে এবং জয়াকে ও যিনি বাক্স দিয়াছেন, তাঁহাকে যাহা লিখিতে হয়, তুমি আমার নাম দিয়া লিখিয়া দিবে। ইতি তাঃ ৫ই মাঘ, ১৩১৬।

আশীর্বাদিকা—তোমার মা।"

শ্রীমার শরীরে বাতে মধ্যে মধ্যে এত কষ্ট দিয়াছে যে, যে যাহা বলিয়াছে, তিনি তাহাই করিয়াছেন—ঔষধ বা দৈব, কিছুই বাদ দেন নাই। নিম্নলিখিত পত্রটি তাহার একটি দৃষ্টান্ত। বাতে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন জানিতে পারিয়া লেখক তাঁহাকে দেশ হইতে কলিকাতায় আনিতে যাইবে বলিয়া লিখিয়াছিল। সেই পত্রের উত্তরে তিনি লিখিতেছেন—

"আমার পায়ের বাতটা কিছু কম বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ, এখানে সত্যনারায়ণের ঔষধ ধারণ করিয়াছি। সেইজন্য কিছু বিশেষ বলিয়া বোধ করি।"

ঐরূপে আর একবার বাত বৃদ্ধি পাওয়ায় শরৎ মহারাজ কলিকাতা হইতে লেখককে লিখিতেছেন। সে তখন জয়রামবাটীতে। "...শ্রীমার বাতের কথা শুনিয়া ভাবিত আছি। একটু কমিয়াছে কি না, লিখিয়া সুখী করিবে। আর একটি ছোট শিশিতে করিয়া বাঘের চর্বির তেল শীঘ্র পাঠাইব। শুনিলাম উহা বাতের পক্ষে খুব ভাল। মালিশ করিতে হয়। তাঁহার এখান হইতে যাওয়ায় সব শূন্য হইয়া রহিয়াছে। যদি ফাল্গুনে আনিতে পার তো বড় ভাল হয়। এখনই বাত বাড়িয়াছে—শীতকালে না জানি, কত কষ্ট হইবে!"—কলিকাতা, ২৭।১১।(১৯)০৯

৩৮ মিস লরা এফ. গ্লেন (Laura F. Glenn)।—সম্পাদক

৩৯ মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড (Josephine MacLeod)। শ্রীমা তাঁকে 'জয়া' বলতেন।—সম্পাদক

বন্ধুদ্বয় ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও ললিতকে শ্রীমার সাতিশয় স্নেহ করিবার আভাস ইতিপূর্বে যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক, উভয়েই শ্রীমার অতি প্রিয় সন্তান ছিলেন। ললিতের অসুখের সংবাদে শ্রীমা কিপ্রকার চঞ্চল হইয়াছিলেন, তাহা লেখককে লিখিত নিম্নোক্ত দুইখানি পত্রের অংশবিশেষে জানা যাইবে—

(১) "ললিতের অসুখ শুনিয়া আমার যে কতদূর মনঃকষ্ট তাহা লিখিবার নয়। উপস্থিত আমি তাহার জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া উঠে। এইটুকু আমার প্রার্থনা।" তাঃ ৬ই পৌষ, ১৩১৬

(২) "আর, ললিত কেমন আছে লিখিবে।" ৫ই মাঘ, ১৩১৬

বন্ধুবর ডাক্তার কাঞ্জিলালের সঙ্গে লেখকে একবার জয়রামবাটী যাইতে হয়। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত শ্রীমার অসুবিধা এবং ব্যস্ততা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে ডাক্তারের জন্য চা, বিলাতি দুগ্ধ, চিনি, ময়দা, ঘৃত, সুজি ইত্যাদি লইয়া যাওয়া হয়। ডাক্তার কিছু ঔষধ লইয়াছিলেন —গ্রামের দুঃস্থ লোকদের জন্য।

ডাক্তারকে পাইয়া শ্রীমার আনন্দ আর ধরে না। আবার, যখন কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার আসিয়াছে, লোকমুখে শুনিয়া দূর দূর গ্রাম হইতে বহু লোক আসিতে থাকে, তখন শ্রীমার মুখে শুনা যায়—"আমার গুণী ছেলে এসেছে—লোক আসবে না!" বহু লোকের উপকার হইল। একজন অবস্থাপন্ন সদ্গোপ অস্ত্রোপচারে বাঁচিয়া উঠিল এবং সিংহবাহিনীর মাড়োয় একটি মেষ বলি দিয়া মুড়ি ব্যতীত সমগ্র মাংস ডাক্তারকে দিয়া গেল। মামারা কাটিয়া দিলেন এবং শ্রীমা স্বহস্তে উহা রন্ধন করিলেন। একদিন কামারপুকুর হইতে গণেশ ঘোষাল মহাশয় নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন এবং মাংস খাওয়াইলেন। অপর দিন আনুড়ের নগেন ডাক্তার লইয়া গিয়া তালশাঁস, ডাব ও মটন খাওয়াইলেন। এইরূপে গুরুগৃহে কয়েকদিন আমোদ-প্রমোদে এবং পরোপকারে কাটাইয়া [ডাক্তার] কলিকাতায়

ফিরিলেন। যাইবার সময় কয়েকটি বিলাতি পেটেন্ট ঔষধের নমুনা রাখিয়া গেলেন, যাহাতে লোকের উপকারে আসে। বিদায়কালে শ্রীমা গ্রামের বাহির পর্যন্ত [তাঁহাকে] আগাইয়া দিয়া আসেন।

বন্ধুবর ডাক্তার কাঞ্জিলাল কলিকাতা যাত্রার পূর্বদিন দ্বিপ্রহরে লেখককে "চল ভাই, মাকে ধরা যাক" বলিয়া টানিয়া শ্রীমার কক্ষে লইয়া গেলেন।...বন্ধু বলিতে থাকিলেন—"মা, ঠাকুর বুড়ি ছোঁবার কথা বলেছেন—"। তিনি আরও বলিতেছিলেন, কিন্তু শ্রীমা বলিয়া উঠিলেন ঃ "হ্যাঁ, বাবা, তাতো তোমাদের হয়েছে। তোমাদের আবার ভাবনা কি ?"

ডাক্তার—"মা, আপনারা যেমন দয়া করে থাকেন, তেমনি আবার ফাঁকি দেন। এই আপনাকে ছুঁয়ে আছি—এইবার বলুন, আমাদের কোন ভাবনা নেই ?—উদ্ধার হয়ে যাব ?"

শ্রীমা—(সহাস্যে) "হ্যাঁ, বাবা, তোমাদের তো ভার ঠাকুর নিয়েছেন—তবে আবার ভাবনা কি ?"

ডাক্তার—"আর আমরা যদি খুব খারাপ হই, তাহলে ?"

শ্রীমা—"ছেলে হেগেমুতে থাকলে মা ধুয়েপুঁছে নেয়।"

ডাক্তার—"তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত ?"

শ্রীমা—"হ্যাঁ, বাবা। দেখে নিও।"

ডাক্তার শ্রীমাকে তিনসত্য করাইয়া ছাড়িলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ (ডাঃ কাঞ্জিলাল) চলিয়া যাইবার দিনকয়েক পরে শ্রীমার জ্বর হইল। প্রথম দুইদিনের জ্বর ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং সেবিষয়ে কাহাকেও বলেন নাই। তৃতীয় দিন সকালে দেখিতে না-পাইয়া ঘরে গিয়া দেখি, লেপ গায়ে শুইয়া আছেন। গাত্র ঈষৎ গরম। নাড়ি চঞ্চল। শীত করিতেছে।... রাধুকে বলিলেন ঃ "আমার কাছে থাকলে তোরও জ্বর হবে। যা, তোর নেড়ি-মার[৪০] কাছে থাক্‌গে।"

---

৪০ রাধু তার মাকে (সুরবালা) নেড়ি-মা বলত। বালবিধবা সুরবালা সমাজের প্রথা অনুসারে চুল ছোট করে কাটতেন। সেজন্যই ঐভাবে।—সম্পাদক

রাধুর বিষয় আমরা এযাবৎ বিশেষ কিছুই বলি নাই। রাধু শ্রীমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়কুমারের এবং পাগলী (ছোট) মামীর কন্যা। পিতার মৃত্যুসময়ে সে তাহার মাতৃগর্ভে; অতএব পিতৃদর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। শৈশবাবস্থায় অর্থাৎ ছোটমামীর মাথা খারাপ হওয়া অবধি শ্রীমা উহার প্রতিপালনের ভার নিজ হস্তে বাধ্য হইয়া লইয়াছেন। উহার ভাল নাম রাধারানী। শ্রীমা এবং ছোটমামী উহাকে 'রাধু' বা 'রাধি' বলিয়া ডাকিতেন। শরৎ মহারাজের নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুর বা শ্রীমার একটা কিছু অবলম্বন বিনা শরীর থাকিবার নহে। শ্রীমার পক্ষে ঐ রাধু না হইলে শ্রীমা এ মরজগতে এতদিন থাকিতেন না। রাধুও আশৈশব শ্রীমার দ্বারা লালিত পালিত হওয়ায় তাঁহাকে 'মা' এবং নিজ গর্ভধারিণীকে 'নেড়ি-মা' বলিয়া ডাকিত।

সেদিন শ্রীমার জ্বর দিনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে, সন্ধ্যা পর্যন্ত লেপ গায়ে। তখনও শীত যায় নাই। সারাদিন বহুবার বলা সত্ত্বেও কিছুই খাইলেন না। একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেদিন কি তিথি। উত্তরে 'একাদশী' জানিয়া বলিয়াছিলেন, "একাদশীর জ্বর ভোগাবে।"...

প্রায় অর্ধরাত্রে জ্বর ভীষণাকার ধারণ করিল। নাড়ি লাফাইতেছে। গায়ে হাত রাখা যায় না—এত উত্তাপ।... বড়ই চিন্তিত হইলাম। শ্রীমার জ্বর ইতিপূর্বে কয়েকবার দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ ভীষণাকারে তো কখনও দেখি নাই। ভীত হইলাম। মনে মনে কাঞ্জিলালের চলিয়া যাওয়ায় আক্ষেপ করিতে থাকিলাম। এমন স্থান যে, ডাক্তার নাই। আনুড়ের নগেন ডাক্তার ক্যাম্বেলের পাশ হইলেও ডাক্তার তো বটে। তবে তাঁহার তো দুই-চারিটি ফিভার ও কুইনিন মিক্শ্চার ছাড়া আর ঔষধ নাই। নিকটে কোন ডাক্তারখানাও নাই যে, তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া ঔষধ আনিতে পারা যায়। তবে কি শরৎ মহারাজকে তার করিব ?—সে-তারও যাইতে এবং তাঁহার ডাক্তার লইয়া আসিতে কয়দিন যে লাগে। এই প্রকার নানারূপ ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।...

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায় হইলে শ্রীমার মুখে কয়েকটি অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে। কিন্তু তাহার মর্ম বোধ করিতে পারা যায় না। তারপর যে-কয়েকটি সুস্পষ্ট শব্দ শুনা যায়, তাহা এইরূপ —"যেতে হবে ?—না ? কেন ?—রাধির জন্যে ?—আচ্ছা তাই।"... মনে মনে ঐ শব্দগুলি লইয়া নানাপ্রকার কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—একথা কি ঠাকুরের সঙ্গে ?...

রাত্রি শেষের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমার শরীরে ঘর্ম দেখা দিল। সকালে জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল। ...

সন্ধ্যার পর শ্রীমা সুস্থ হওয়ায় শয্যার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া কথা কহিতেছেন। গত রাত্রে ঠাকুরের সহিত তাঁহার কিছু কথা হইয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়া সঠিক উত্তর না পাওয়ায় ধরিয়া বসিলাম, যাহাতে তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া না যান। স্বীকার পাইলেন। ...

শ্রীমার জন্য [কলিকাতায়] নূতন বাটী নির্মিত হইয়াছে —বাগবাজারের গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেনের উপর। জমিটি —কেদার দাস ওরফে 'খোড়ো কেদার' দান করিয়াছেন। নিচে উদ্বোধন কার্যালয় স্থানান্তরিত হইয়া আসিয়াছে এবং উপরে শ্রীমার থাকিবার জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাটীটি ত্রিতল। দ্বিতলে ঠাকুরের জন্য বেদি নির্মাণ করা হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা স্বহস্তে ঐ বেদির আচ্ছাদন রেশমি বস্ত্রে প্রস্তুত করিয়া টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। বাটীটি দেবমন্দির বলিয়া কর্পোরেশন ট্যাক্স হইতে মুক্ত হইয়াছে এসব হইয়াছে শ্রীমার আসিয়া থাকিবার জন্য। কিন্তু তিনি আসিতে বিলম্ব করিতে থাকিলেন।

অবশেষে অনেক ধরাধরির পর আসিলেন, ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের এক সন্ধ্যার পর।[৪১] শরৎ মহারাজের বন্দোবস্তে ঠাকুরঘরের পার্শ্বস্থ ঘরে[৪২] শ্রীমার জন্য একখানি নূতন খাট এবং রাধুর জন্য তাহারই পার্শ্বে শ্রীমার পুরাতন পালঙ্কখানি পাতা হইয়াছে এবং ঐ

৪১ শ্রীমা কলকাতার বাড়িতে পদার্পণ করেন ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, ইংরেজি ২৩ মে ১৯০৯।—সম্পাদক

৪২ বর্তমান শরৎ মহারাজের ঘর।—সম্পাদক

ঘর তাঁহাদের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীমা আসিয়া ঐসব দেখিয়া বলিলেন ঃ "আমার কি বাবা, ঠাকুরকে ছেড়ে থাকা চলে, না আমি থাকতে পারি ?" তখন ঐ খাট আর পালঙ্ক সরাইয়া ঠাকুর-ঘরেই পাতা হইল। তিনি প্রথম রাত্রি শুইলেন। মশারি খাটাইলেন না। ছোটমামী পাশের ঘরে[৪৩] রহিলেন।

পরদিন প্রাতে বলিলেন ঃ "আমার খাটে শোওয়া হবে না। রাধি আমাকে ছেড়ে শুতে পারে না।—আমিও রাধিকে ছেড়ে থাকতে পারি না। খাটখানা সরিয়ে ফেল। আমরা পুরানো পালঙ্কেই শোব।" গণেন্দ্রনাথ বলিলেন ঃ "শরৎ মহারাজ যে আপনারই জন্য নতুন খাট তৈরি করিয়েছেন।" শ্রীমা সম্মত হইলেন না। বলিলেন ঃ "না বাবা, খাটে শোওয়া কি অভ্যেস আছে ? ও ফোটে, আর তোমাদের কথায় তো একদিন শুলুম। এখন তোমরা শোওগে।" তাঁহার ইচ্ছানুসারে খাট সরানো হইল। গণেন্দ্রনাথ ত্রিতলের ঘরে লইয়া গিয়া ঐ খাট ব্যবহার করিতে থাকিলেন। শ্রীমা ও রাধুর জন্য পালঙ্কেই বিছানা করা হইল এবং দেওয়ালে পেরেক পুঁতিয়া মশারি খাটানো হইল।

শ্রীমার ঠাকুরপূজার জন্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের বাগান হইতে নিত্য প্রাতে মালী ফুল দিতে থাকে। গোলাপ-মা এখন হইতে শ্রীমার বাটীতে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। যে সামান্য কয়েকটি টাকা নাতির নিকট হইতে সাহায্য পাইতেন, তাহা শ্রীমার কলিকাতার সংসারে দিয়া আহার ও শয়ন করিতে লাগিলেন। প্রথম দু-তিন দিন ছোটমামীর ঘরে শুইলেন; পরে ত্রিতলের ঘরে (যে ঘরে গণেন্দ্রনাথ শুইতেন) শুইতে লাগেন। ছোটমামীর ঘরে শ্রীমা বসিয়া তৈল মাখিতেন ও পান সাজিতেন। দ্বিতলের দক্ষিণদিকের ঘরখানি[৪৪] পুরুষ-ভক্তদের আহারস্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। স্ত্রী-ভক্তেরা ছোটমামীর ঘরে খাইতেন। শ্রীমা ঠাকুরঘরে। যোগীন-মা দুইবেলা আসিয়া ভাঁড়ার বাহির করিয়া এবং কুটনা কুটিয়া দিতেন।

৪৩ বর্তমান মায়ের ঘরের সংলগ্ন বাঁদিকের ঘর।—সম্পাদক

৪৪ মায়ের ঘরের মুখোমুখি সে ঘর। এই ঘরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দেহান্ত হয়।—সম্পাদক

একদিন ললিত ফনোগ্রাফ লইয়া আসিয়া শ্রীমাকে শুনাইবার পর রাধুকে দিয়া কথা কহাইয়া উহা ধরিয়া লয়েন এবং যাইবার সময় উহা শুনাইয়াও যান।

একদিন রাত্রিকালীন আহারের অব্যবহিত পরে বেলুড় মঠ হইতে সংবাদ আসে, শ্রীঠাকুরের সন্তান গোপাল-দাদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ), যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে 'বুড়ো গোপাল' নামে অভিহিত হইয়াছেন, দেহত্যাগ করিয়াছেন।[৪৫] খবর পাইয়া শরৎ মহারাজ তৎক্ষণাৎ গণেন্দ্রনাথকে লইয়া মঠে যান।...

একবার শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত কীর্তন উপলক্ষে শ্রীমাকে স্ত্রী ও পুরুষ-ভক্তগণসহ নিজ বাটীতে লইয়া যান। কীর্তনিয়া যতীন্দ্র মিত্র পেশাদার নহেন, কিন্তু অতি সুন্দর কীর্তন গাহেন। মাথুর আরম্ভ হয় —বিরহের পালা। সে-কীর্তন শুনিলে সত্যই অভিভূত হইতে হয়। চিকের ভিতরে শ্রীমা ও স্ত্রী-ভক্তেরা বসিয়া। কীর্তন শুনিতে শুনিতে শ্রীমা অর্ধবাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়েন। সেইসময় যতীন্দ্রবাবুর কলিকাতার বাহিরে যাইবার ট্রেনের সময় আগতপ্রায় দেখিয়া কীর্তন বন্ধ করিয়া যাইবার উদ্যোগী হইলে, গোলাপ-মা চিকের ভিতর হইতে বলিলেন: "মা বলছেন, মিলনে শেষ করতে।" যতীন্দ্রবাবু একখানি মিলন গাহিলেন। মিলন-গীতিটি এত সুমধুর হইল যে, উহা শ্রোতৃবর্গমাত্রেরই মর্মে গিয়া আঘাত করিল। যতীন্দ্রবাবু চলিয়া গেলেন শ্রীমাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া। শ্রীমা সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া বসিয়া আছেন। গোলাপ-মা, বুঝিতে পারিয়া, কাহাকেও কিছু জানিতে না-দিয়া ধরিয়া তুলিলেন এবং নামমাত্র জলযোগে বসাইয়া, গাড়িতে লইয়া গিয়া তুলিলেন।

গাড়িতে উঠিতে যাইবার সময় শ্রীমার পা এখানে একটা, ওখানে একটা পড়িতে লক্ষ্য করা যায়। গোলাপ-মা জোর করিয়া ধরিয়া তুলিলেন। নিজ বাটীতে পৌঁছিলে, দুইজনে দুইদিকে ধরিয়া নামাইয়া

৪৫ স্বামী অদ্বৈতানন্দের দেহান্ত হয় ২৮ ডিসেম্বর ১৯০৯ বিকাল সাড়ে চারটার সময়।—সম্পাদক

উপরে লইয়া যাইতে হয়। গোলাপ-মা কত ডাকিতে লাগিলেন--সাড়াও নাই, শব্দও নাই। ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইলে, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—চক্ষের পলক পড়ে না! গোলাপ-মার ভাগ্যে পূর্বে বৃন্দাবনে নাকি একবার এইপ্রকার অভিজ্ঞতা হইয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ "সেই বৃন্দাবনে মার ভাব দেখেছিলুম—আর এই আজ দেখলুম।" আমাদের অভিজ্ঞতা আদৌ ছিল না। আজ প্রথম দর্শনে নিজেকে ধন্য মানিলাম। গোলাপ-মার উপর্যুপরি ডাকে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া না আসায়, আমাদের মনে শ্রীমার একদিনের উপদেশচ্ছলে [প্রদত্ত] উক্তিটি জাগে; এবং সেইটি পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এসময়ে প্রয়োগ করিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "মা যতই কাজে থাকুক না কেন, ছেলের কান্নায় কি ডাকে তখনই আসে।"

কর্ণের নিকটে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে থাকায় শরীরে কম্পন দেখা দিল। পরে স্পষ্টাক্ষরে "কেন, বাবা!" বলিলেন। বলিলাম ঃ "খিদে পেয়েছে, মা, ঠাকুরের ভোগ দিন।"—আর কিছুই অস্বাভাবিকতা রহিল না। একেবারে বাহ্যিক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। ভোগ আসিল। জোড়হস্তে ঠাকুরের ভোগ দিলেন। শরৎ মহারাজ, কিরণবাবুর বাটী হইতে ফিরিয়া সব শুনিয়া বলিলেন ঃ "ঠিক করেছিস—আমাদেরও জানা রইল।"

ঠাকুরের সন্তান লাটু মহারাজকে (স্বামী অদ্ভুতানন্দকে) দেখিতাম, তিনি বড় একটা শ্রীমার নিকট আসিতেন না; কিন্তু প্রতিবৎসর দুর্গাপূজার সময়ে শ্রীমা কলিকাতায় থাকিলে, একবার নিশ্চয় আসিতেন। তাঁহাকে দেখিলে শ্রীমার খুব আনন্দ হইত। নিজের ঘরে বসাইয়া প্রসাদ খাইতে দিতেন—অনেক কথা কহিতেন এবং একখানি কাপড়ও দিতেন। লাটু মহারাজ কাপড়খানি মাথায় পাগড়ির ন্যায় বাঁধিয়া লইতেন। প্রসাদ খাইতে খাইতে লাটু মহারাজের চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিত। কখনও বা প্রসাদ ও বস্ত্র লইয়াই ছুটিয়া পলাইতেন। শ্রীমা হোহো করিয়া হাসিতেন।

এই লাটু মহারাজের বিষয়ে শ্রীমাকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ "লাটু আমার নবতে রুটি বেলে দিত, ময়দা মেখে দিত, কত বাসন মেজে দিত, জল তুলত। আহা, লাটুর মতো একনিষ্ঠ ভক্ত কোথায় !"

একদা এক মার্কিন যুবক ও এক মার্কিন যুবতী (উভয়ে কুমার-কুমারী) আসিয়া বলেন যে, তাঁহারা শ্রীমার দর্শনপ্রার্থী। উঁহারা আমাদের নিকট অপরিচিত ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদিগকে উপরে লইয়া গেলে, শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া নামিয়া আসিয়া উদ্বোধন কার্যালয়ে খানিকক্ষণ বসেন আর নিজেদের ভিতর বাগবিতণ্ডা হইতে থাকে। শেষে [তাঁহারা] রাগিয়া চলিয়া যান। সেদিন অপর কার্যোপলক্ষে উপরে গেলে শ্রীমা জিজ্ঞাসা করেন ঃ "সাহেব আর মেমটি কি স্বামী-স্ত্রী ?" উত্তর করি ঃ "না, ওঁরা কুমার-কুমারী।" শ্রীমা বলিলেন ঃ "আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, ওরা তা-ই।" তখন বলিলাম ঃ "হ্যাঁ মা, ওদের ভেতর ঝগড়া শুনেছি।"

এই বাটীতে শ্রীমার তিনখানি ফটো, লেখক কর্তৃক বি. দত্ত ফটোগ্রাফার দ্বারা তুলা হয়।...

এখানে শ্রীমার নিকট দীক্ষিত হইতে স্ত্রী ও পুরুষের খুব সমাগম হইতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ একদিন শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসেন।

নলিনীর স্বামী প্রমথকে চিকিৎসা দ্বারা যে-ডাক্তার আরোগ্য করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীমার আদেশে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন এবং সেই দ্বিতীয়া স্ত্রী শ্রীমার সন্তানমধ্যে পরিগণিতা হন। তিনি শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার জীবনের এক অপূর্ব তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহার পতির নিকট হইতে বন্ধুসূত্রে ও ভ্রাতৃত্বভাবে [তাহা] আমরা লাভ করিয়াছি। মাতৃচরিত্রের ঐ বহুমূল্য উপাদানটি আমরা যথাসাধ্য বন্ধুবরের ভাষায় [অর্থাৎ বন্ধুবর শ্রীমার কথাগুলি যেভাবে বলিয়াছিলেন সেভাবে] দিতে প্রয়াস পাইতেছি —"দেবশরীর আমাদের সাধারণের মতো হয় না। তাতে এমন বিশেষত্ব থাকে, যা অন্যত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর; এমনকি, অসম্ভব বলাও যেতে পারে। শুনেছি, ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন ঃ 'ওরে, আমার মতো তোর দ্বারাও স্ত্রীসম্ভোগ হবার নয়।' "...

শ্রীমাকে আমরা কয়েকবার তাঁহার সন্তানদের বলিতে শুনিয়াছি, "ঠাকুরের দেখা পাওনি ? আমি বলছি—নিশ্চয় পাবে।—একি যে-সে ধরেছে ?"

আমরা কয়েকটি মাতৃসন্তান একবার একত্রিত হইয়া নিজ নিজ অভিজ্ঞতা আলোচনাকালে একটি বিষয়ে একমত হই যে, শ্রীমা, কোন্ সন্তান কি খাইতে ভালবাসে তাহা না-জানিয়া বা না-শুনিয়া সেই সন্তানকে সেইটিই দিতেন।

শ্রীমাকে আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে, ঠাকুর তাঁহাকে ছেলেদের হাতেখড়ির মতো কিরূপ আধারে কী মন্ত্র প্রযোজ্য এবং কী মন্ত্রের কী বীজ, ইত্যাদি শিখাইয়াছেন, যাহাতে ভবিষ্যতে শত-সহস্র লোকে তাঁহার দ্বারা ধর্মজীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে।

শ্রীমা আবার দেশে গেলেন। সেখানে শ্রীমার বাটীর দক্ষিণদিকে খানিকটা জমি ছিল, যাহা এপর্যন্ত খামাররূপে ব্যবহৃত হইত। 'খামার' তাহাকে বলে, যেখানে ধান আছড়ানো হয়। এবার জয়রামবাটী গিয়া দেখা যায়, সে-খামার আর নাই—কালী-মামার নূতন বাটী তাহার উপর হইয়াছে। পুরাতন বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ এবং পার্শ্বের ঘরটি, যাহাতে লেখকাদি ভক্তেরা থাকিত, এক্ষণে খামাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। অতএব, লেখককে কালী-মামার নূতন বাটীতে থাকিতে হয়। কালী-মামা মড়াগেড়ে হইতে নিজের পরিবারবর্গকে আনিয়া এই বাটীতে বসবাস করিতেছিলেন।

শ্রীমার দুই-চারিটি গৃহী ও ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিল। ইহাদের দ্বারা তিনি নিজের এমন কার্যগুলি করাইয়া লইতেন, যেগুলি অপর কাহাকেও বলিতে চাহিতেন না। এই থাকের একটি অন্তরঙ্গের কথা আমরা এখানে বলিব। এই ভক্তটি ঠাকুরের ছোট ও বড় নানা রকমের ছবি করাইয়া বিক্রয় করিত এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীমার আদেশানুসারে তাঁহার কার্যে লাগাইত।...

শ্রীমার হাতে বহু পূর্ব হইতে হোগলাপাকের বালা দুইগাছি থাকিত (যেমন ছবিগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়); অন্ততঃপক্ষে আমরা তাঁহার

সন্নিধানে আসা অবধি ঐরূপই দেখিয়াছি। ঐ বালা ঘসিয়া যাওয়ায়, উহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন নক্সার মাটাবালা গড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কড়ার ন্যায় দেখিতে ঐ নূতন বালা, শ্রীমা বাহ্যিক পছন্দ হইয়াছে বলিলেও আন্তরিক তাহা হয় নাই। যথার্থ মনোভাব তিনি উপরি-উক্ত ভক্তটিকে জানাইলে সে বলে ঃ "আপনার যখন হোগলাপাকই পছন্দ, তখন তিনদিনের মধ্যে হোগলাপাকই পাইবেন।"... যথাকালে তৃতীয় দিবসে উহা প্রস্তুত হইয়া আসে এবং শ্রীমা বালিকার ন্যায় আনন্দিতা হইয়া একবার তখনই পরেন, কিন্তু প্রকাশ্যে পরিতে পারেন নাই। তবে আমরা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি যে, উত্তরকালে তিনি উহাই পরিয়াছেন—মাটাবালা নহে। ভক্তটি চিরজীবনের মত সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু মা তাহার স্মৃতিচিহ্নরূপে উহা বরাবর ব্যবহার করিয়াছেন। ...

এবারে শ্রীমা কলিকাতায় আসিলে তাঁহার শরীরে বসন্ত দেখা দেয়। বাগবাজার স্ট্রীটের এক শীতলার পূজারীর* চিকিৎসাধীন থাকেন। নিত্য সে-ব্রাহ্মণ আসিত এবং নিত্য তাহার বিদায়কালে শ্রীমা গলবস্ত্রা হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন। শ্রীমাকে ঐ চরিত্রহীন ব্রাহ্মণের পদধূলি লইতে দেখিয়া আমরা বড়ই ব্যথিত হই। থাকিতে না-পারিয়া একদিন শ্রীমাকে ঐরূপ করিতে নিষেধও করিয়া বসি। তিনি উত্তরে বলেন ঃ "কি জান বাবা, হাজার হোক ব্রাহ্মণ—ভেকের মান দেওয়াই উচিত। ঠাকুর তো আর ভাঙ্গতে আসেননি।"

শ্রীমার এই অসুখে একটি কৌতূহলজনক ঘটনা ঘটে। অসুখ তখন আরাম হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও পথ্য পান নাই। এমন সময় একদিন তাঁহার ডাঁটা-চচ্চড়ি খাইবার সাধ হয় এবং আমাদের সে-অভিপ্রায় জানান। "এক্ষুণি এনে দিচ্ছি" বলিয়া আনিতে উদ্যত হইলে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "কি করে আনবে ?—কেউ যদি টের পায় ?"—"সে ভয় নেই। গোপীনাথের (পাচকের নাম) কাছ থেকে —লুকিয়ে নিয়ে আসছি—সে কাউকে বলবে না" বলিয়া চলিয়া

গেলাম। একখানি শালপাতায় কয়েকগাছি ডাঁটা লইয়া পরক্ষণে উপস্থিত হইলে, শ্রীমা আনন্দিত হইয়া চিবাইতে থাকেন এবং ছিবড়াগুলি শালপাতে রাখিতে থাকেন। সব খাওয়া হইয়াছে, কেবল শেষগাছি চিবাইতেছেন, এমন সময় গোলাপ-মা হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার দিকে পিছন করিয়া এক হাতে ছিবড়াগুলি মুখে পুরিয়া উদরস্থ করিয়া ফেলি, অপর হাতে শালপাতাটি লুকাইয়া রাখি। কিন্তু গোলাপ-মা শ্রীমাকে মুখ নাড়িতে দেখিয়া ফেলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন ঃ "মা, কি খাচ্ছ ?" শ্রীমাও বলিয়া ফেলিলেন ঃ "দুগাছা ডাঁটা চিবুচ্ছি, গোলাপ।" গোলাপ-মা বলিয়া বসিলেন ঃ "ডাঁটা ? ওতো সকড়ি (রান্না করা জিনিস)! কে আনলে ? আশু বুঝি ? শূদ্রের হাতের সকড়ি জিনিস খাচ্ছ কি করে, মা ?" শ্রীমা উত্তর করিলেন ঃ "তুমি আর বোকোনি, গোলাপ। কে শূদ্দুর ? ওতো ভক্ত—সন্তান। ভক্তের আবার জাত আছে ?"

শ্রীমায়ের উত্তরে গোলাপ-মা অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার দৃষ্টি ছিবড়াগুলির অনুসন্ধানে পতিত হইলে, উহার কোন চিহ্ন না দেখিতে পাইয়া বলিলেন ঃ "ছিবড়েগুলো কোথা গেল ? ও বুঝি খেয়ে ফেলেছে ?" শ্রীমাকে হাসিতে দেখিয়া আবার বলিলেন ঃ "ওমা ! নরেন-টরেন ঠাকুরের রক্ত মেশানো গয়ার খেয়েছিল। আমি ছিবড়ে খাব।" ইহা বলিয়া শ্রীমার নিকট হইতে অবশিষ্ট ছিবড়াটি লইয়া মুখে পুরিয়া চলিয়া গেলেন। সরলা ব্রাহ্মণীর একবার মনে হইল না যে, তিনিও শূদ্রের স্পৃষ্ট ছিবড়া খাইলেন !

খুব শীত পড়িয়াছে। শ্রীমার দুর্বল শরীরে বিশেষ কষ্ট হইতেছে দেখিয়া আমাদের মনে সাধ হইল, তাঁহাকে জামা না হউক, একটি গেঞ্জি পরাইতে। শরৎ মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিলে তিনি মূল্য দিলেন এবং গণেন্দ্রনাথ "হোয়াইট ওয়ে লেড্‌ল"র দোকান হইতে ১০্ মূল্যে একটি রেশমি গেঞ্জি কিনিয়া আনিলেন। শ্রীমাকে উহা দেওয়ামাত্র তিনি আনন্দ সহকারে পরিলেন এবং উপর্যুপরি তিনদিন সকাল ও সন্ধ্যায় পরিতে থাকেন। চতুর্থ দিনে আর পরিতে না দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন ঃ "মেয়েমানুষের কি জামা

পরতে আছে, বাবা ? তবু আমি তো তোমাদের মন রাখতে তিনদিন পরেছি।" ইহা লিখিতে গিয়া একটি কথা মনে আসিতেছে। শ্রীমা বাম বগলের নিচে একটি ছোট গেরো দিয়া এমনভাবে কাপড় পরিতেন যে, তাঁহার জামা বা সেমিজের আবশ্যকই হইত না। শ্রীমার কপালে দুইটি ভ্রূর ঠিক মধ্যস্থলে একটি উল্কির চিহ্ন ছিল। উহা অনুবীক্ষণ দ্বারা তাঁহার বড় ফটোতে দেখিল লক্ষ্য করা যাইবে।

শ্রীমার বসন্ত হওয়ায় একে তো শরীর খারাপ হইয়া পড়ে, তাহার উপর ক্রমাগত দীক্ষা দেওয়ায় আরও খারাপ হইয়া যায়। ওদিকে রামের মার[৪৬] অনেকদিন হইতে সাধ ছিল, শ্রীমাকে তাঁহাদের উড়িষ্যার জমিদারি কোঠারে লইয়া যাইবার। এখন সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইলে তিনি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ফলে শ্রীমার যাওয়া স্থির হইল ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। যাত্রার দিন মঠ হইতে সকলে আসিয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিলেন। স্থির হইল, শ্রীমার সঙ্গে পুরুষ ভক্তদিগের মধ্যে শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) এবং কৃষ্ণলাল (স্বামী ধীরানন্দ) যাইবেন। লেখক তখন উদ্বোধন কার্যালয়ের কার্যে নিযুক্ত; অতএব তাহার যাওয়া হইবে না। প্রায় শেষসময়ে কৃষ্ণলাল উপর হইতে আসিয়া রাখাল মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ—তখন মঠের প্রেসিডেন্ট) বলিলেন ঃ "মা বলছেন, আশু যাবে।" অতএব স্বামী ব্রহ্মানন্দের আজ্ঞায় তাড়াতাড়ি কার্যভার বিলাসকে বুঝাইয়া দিয়া লেখককে প্রস্তুত হইয়া শ্রীমার সেবকরূপে যাইতে হইল।

বিলাসের নাম ব্রহ্মচারী কপিল।[৪৭] ছোকরাটি অতি ভাল—শ্রীমার সন্তান। নাগ মহাশয়ের ভক্ত, ঢাকার নারিন্দাবাসী হরপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় ইহাকে মঠে আনেন। ছেলেটি ভাল বোধ হওয়ায় তাহাকে শ্রীমার বাটীতে উদ্বোধন কার্যালয়ে সহকারিরূপে আনিয়া রাখা হয়। ইহার আসিবার কিছুদিন পরে রাসবিহারী[৪৮] নামে অপর একটি ছোকরা মঠে আসিয়া থাকে। এটিও শ্রীমায়ের সন্তান। ছেলেটি বড় সরল ... ইহাকেও উদ্বোধন কার্যালয়ে সহকারিরূপে রাখিয়া দেওয়া হয়।

৪৬ বলরাম বসুর স্ত্রী—রামকৃষ্ণ বসুর মা।—সম্পাদক
৪৭ পরবর্তী কালে স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ।—সম্পাদক
৪৮ পরবর্তী কালে স্বামী অরূপানন্দ।—সম্পাদক

বাবুরাম মহারাজের ভাই শান্তিরামবাবু পূর্ব হইতে রেলের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া এবং তিনখানি ইন্টারক্লাসের টিকিট ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় শ্রীমা, রাধু, ছোটমামী, গোলাপ-মা, রামের মা এবং নিতাইয়ের মা উঠিলেন। আমরা তিনজনে ইন্টারক্লাসে চড়িলাম। রামও নিজের জন্য একখানি টিকিট লইয়া আমাদের সঙ্গে ইন্টারক্লাসে চলিলেন।...

প্রায় অর্ধরাত্রে বি. এন. রেলওয়ের ভদ্রক স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখা যায়, বাবুরাম মহারাজের অগ্রজ তুলসীরামবাবু এবং রামের জমিদারির ম্যানেজার হরপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় যানবাহনাদিসহ অপেক্ষা করিতেছেন। রামের ভদ্রকস্থ কাছারিবাটীতে মাতুল তুলসীরামবাবু থাকেন। তাঁহার একান্ত আগ্রহে শ্রীমা সেখানে খানিকক্ষণের জন্য অবতরণ করিলেন। পরে পালকি ও তাঞ্জামে করিয়া আট-নয় ক্রোশ দূরবর্তী কোঠারে যান। মায়েদের রাখিয়া তাঞ্জামগুলি ফিরত আসিলে তাহাতে আমরা যাই।

কোঠারে শ্রীমা অন্দরমহলে এবং আমরা কাছারিবাটীতে অবস্থান করি। ন্যূনাধিক দুইমাস এখানে অবস্থান করা হয়। দিনে দুইবার শ্রীমা আমাদের সহিত কথা কহিবার বা পত্রাদি শুনিবার এবং উত্তর লিখাইবার উদ্দেশে খিড়কিমহলে আসিতেন এবং আমরা খিড়কিদ্বার দিয়া তথায় যাইতাম। আমাদের অবস্থানকালে একদিন কেদার (স্বামী অচলানন্দ) আসিলেন এবং তথায় রহিয়া গেলেন। পরের বাটীতে অবরুদ্ধভাবে থাকায় ছোটমামীর মাথা খারাপ হইয়া পড়ে এবং শ্রীমার আদেশে লেখক তাঁহাকে জয়রামবাটী রাখিয়া আসে।

কোঠারে দুইবেলা সদর-ফটক দিয়া অন্দরমহলে গিয়া আমরা আহার করিয়া আসিতাম। জলখাবার এবং চা কাছারিবাটীতেই আসিত। শুকুল মহারাজ, কৃষ্ণলাল এবং লেখক—এই তিনজনের মধ্যে দুইজন বরাবরই নিরামিষাশী। অপর একজন মাত্র দুইমাস হইতে নিরামিষাশী হইয়াছেন। তাঁহার এইরূপ হইবার কারণ ছিল—যেহেতু শ্রীমা আমিষ খান না, সেইহেতু তিনিও খাইবেন না; আর এই মনোভাব

তিনি নিজের ভিতরেই রাখিয়াছিলেন, কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। একদিন মধ্যাহ্নভোজনে সকলে বসিয়াছি, গোলাপ-মা আসিয়া শ্রীমার নাম করিয়া ঐ তৃতীয় ভক্তটিকে মাছ খাইতে বলিলেন। তিনি সম্মত হইলেন না। গোলাপ-মা তথাপি বলিলেন ঃ "মা যে খেতে বলে পাঠালে।" তিনি তথাপি অসম্মত হইলেন। গোলাপ-মা চলিয়া গেলেন। পরক্ষণে শ্রীমা আসিয়া স্বহস্তে দুইটি বড় গলদা চিংড়ি তাঁহার পাতে দিয়া বলিয়া গেলেন ঃ "যা বলবার আছে, বিকেলে বোল —এখন খাও।" অগত্যা ভক্তটি উহা খাইলেন। যথাসময়ে শ্রীমা খিড়কিমহলে ভক্তটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ঐ সম্বন্ধে যে কথাবার্তা হয়, তাহা দিতেছি—

শ্রীমা—"মাছ খাওয়া কেন ছেড়ে দিয়েছ ?"

ভক্ত—"আপনি কেন খান না ?"

শ্রীমা (গম্ভীরভাবে)—"আমি কি একমুখে খাই ?—তুমি কি তাই মনে কর ? বোকামি করো না—মাছ খাবে। আমি বলছি, খাবে।" সেই অবধি ভক্তটি আজীবন আমিষাশী রহিলেন।

রাম (রামকৃষ্ণ বসু) অদীক্ষিত ছিলেন। সরস্বতী পূজোর দিন সস্ত্রীক (স্ত্রী—সুশীলাবালা) শ্রীমার নিকট দীক্ষা লইলেন। সুদূর শিলঙ হইতে দুইটি ভক্ত আসিয়াও দীক্ষা লইয়া গেলেন।

রামেদের ঠাকুরবাটীও আছে। উহাতে রাধাশ্যামচাঁদের নিত্য-সেবা হইয়া থাকে। মন্দির-সম্মুখে বৃহৎ প্রাঙ্গণ। উহাতে সময়-সময় যাত্রাদি হইয়া থাকে। মন্দির-চত্বরে প্রতিবৎসর সরস্বতী পূজাও হইয়া থাকে।

কোঠারে শ্রীমা এমন একটি মহানুষ্ঠান করিলেন, যাহা শ্রীঠাকুরও করেন নাই। তাই কি ঠাকুর শ্রীমাকে রীতিমত শিক্ষাদান করিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন ঃ "তোমার কাছে অনেকে আসবে আর তাদের তোমায় দেখতে হবে" ? তাঁহাদেরও জীবন সার্থক, যাঁহারা এই অনুষ্ঠানে নিমিত্তস্বরূপ হইলেন; আর সর্বাপেক্ষা রামই ধন্য, যাঁহার জমিদারিতে, যাঁহার ভদ্রাসনেই ঐ কার্য অনুষ্ঠিত হইল।

কোঠারের পোস্টমাস্টার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যৌবনের উদ্দাম তাড়নায় এক খ্রীস্টধর্মাবলম্বিনীর প্রণয়ে আসক্ত হইয়া স্বয়ং ঐ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া উহার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে কিন্তু সে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং বহুচেষ্টা সত্ত্বেও তাহাকে পুনর্লাভ করিতে না পারিয়া দেবেন্দ্রবাবু হতাশ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে কালে বিস্মৃতি আনিয়া দিলে, তাঁহার একটা সামান্য চক্ষের নেশায় পড়িয়া পরধর্ম আলিঙ্গন করার জন্য অনুশোচনা আসে। এইরূপে যখন তিনি ঘোর অনুতপ্ত, তখনই আমাদের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। আলাপ যত ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই তাঁহাকে ঘোর অনুতপ্ত হইতে, এমনকি, বালকের ন্যায় ক্রন্দনরত দেখিয়া নিজেদের ভিতর ইতিকর্তব্যের বিষয় পরামর্শ করা হয় এবং অবশেষে শ্রীমার নিকট আদ্যোপান্ত নিবেদন করা হয়। শ্রীমা, রাম ও রামের মাতার দেবমন্দির বা ভিটায় দেবেন্দ্রবাবুর শুদ্ধিকার্য অনুষ্ঠিত হইবার আপত্তি নাই জানিয়া, তাঁহার পুনর্দীক্ষার আদেশ করেন। ফলে সরস্বতী-পূজার পূর্বদিনে মুণ্ডিতমস্তক দেবেন্দ্রনাথ, রাধাশ্যামচাঁদের পূজারীর সাহায্যে মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণশরীর কৃষ্ণলালের (স্বামী ধীরানন্দের) নিকট যজ্ঞোপবীত এবং গায়ত্রী গ্রহণ করিয়া স্বধর্মে পুনঃপ্রবেশ করেন। ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হইয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিতে গেলে শ্রীমা তাঁহাকে প্রতি-নমস্কার করেন। পরদিন অর্থাৎ সরস্বতী-পূজার দিন দেবেন্দ্রনাথ শ্রীমার নিকট দীক্ষা লইলেন। দীক্ষান্তে শ্রীমা তাঁহাকে একখানি পরিধেয় বস্ত্র দেন। সেদিন রামের নিমন্ত্রণে দেবেন্দ্রনাথ আমাদের সহিত বসিয়া শ্রীমার প্রসাদ পান। তাই বলিতেছিলাম, ঠাকুরের সময়ে যে-কার্য হয় নাই, শ্রীমার দ্বারা সেই কার্য অনুষ্ঠিত হইল। শ্রীমা স্বধর্মত্যাগীকে স্বধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।—ঘরের ছেলে খেলাধূলায় মত্ত ছিল, এখন শ্রীমার কৃপায় ঘরে ফিরিয়া আসিল। ঠাকুরই সব করাইলেন।

শ্রীমার উপস্থিতিতে এবার সরস্বতী-পূজায় খুব ঘটা হইল। পূজার

দিন রাত্রে উড়িয়া-যাত্রা হইল। দুইটি বালক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর পাট করিল। এরূপ অপূর্ব যাত্রা আমরা জীবনে প্রথম দেখিলাম। সমগ্র পালায় একটিও কথা নাই—নৃত্য ও গীতে পালাটি অভিনীত হইল। আবার সে-নৃত্য উপভোগ্য বটে। ঐ নৃত্যে পাশ্চাত্য নৃত্যকলা, যাহা আমরা থিয়েটার আদিতে দেখিতে অভ্যস্ত, একেবারেই নাই। উহাতে সম্পূর্ণ প্রাচ্যকলাই বিদ্যমান। সমগ্র শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনপূর্বক সে-নৃত্য যে কি জিনিস, উহাতে কত অধিক ব্যায়াম ও পরিশ্রম হয়, অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুদৃশ্যরূপে পরিস্ফুট, তাহা যিনি না-দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পরিবেন না। আমাদের আশঙ্কা হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়, কিরূপে সাররাত্রিব্যাপী অত পরিশ্রম ঐ ক্ষুদ্র বালকদ্বয়ের পক্ষে সম্ভব! ফলতঃ, উহা এত মর্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, আজ পর্যন্ত আমাদের মনে উহাদের নৃত্যসহ গীতের একটি কলি অঙ্কিত আছে এবং উহা দেখিয়া শ্রীমাকে সরস্বতী-পূজার চিরন্তনপ্রথা পাল্টাইয়া, দুই দিবসের পূজার এবং তৃতীয় দিবসে নিরঞ্জনের নববিধি পরিচালিত করিতে হয় আর দ্বিতীয় রাত্রেও ঐ যাত্রার পুনরাভিনয়ের আদেশ দিতে হয়।

যে-গীতটির উল্লেখ আমরা করিলাম এবং যাহার প্রথম কলিটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, উহা শ্রীমার এত মনোনীত হইয়াছিল এবং উহার অভিনয়ে [তিনি] এতটা অভিভূতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আদেশে উহার বারংবার অভিনয় করিতে হয় এবং উত্তরকালে তাঁহাকেও আমরা ঐ কলিটি গাহিতে কয়েকবার শুনিয়াছি—

"কৌড় করিলা রা নন্দর টীকা পিলাটি!"—বঙ্গভাষায় যথাযথ অনূদিত হইলে উহার আকার হয়—"কি করিল রে নন্দের ছোট ছেলেটি!"

বিসর্জনের জন্য প্রতিমা শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাওয়া হয়। সে-শোভাযাত্রায় ধনী ও নির্ধন, সাধু ও অসাধু, ত্যাগী ও গৃহী, বৃদ্ধ ও বালক প্রতিমাতলে সমবেত হইয়া একতানে গাহিতে থাকেন—

"শ্রীদুর্গা নাম ভুলো না;
ভুলোনারে মন, ভুলো না।
শ্রীদুর্গা স্মরণে, সমুদ্রমন্থনে,
বিষপানে বিশ্বনাথ মলোনা।"—ইত্যাদি।

রামেদের বড় পুকুরে দেবীর নিরঞ্জন হইল।

শ্রীমার অবস্থানে রামেদের অতিথিশালায় অতিথির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চারিদিকে আনন্দের রোলে গ্রামখানি শহরের ন্যায় সর্বদা মুখরিত হইয়া থাকিত। পূর্বেই বলিয়াছি যে, খিড়কিমহলে শ্রীমার সহিত দুইবেলা কথাবার্তা হইত। ঐ কথাবার্তা নানা বিষয়ে হইত। একদিন তীর্থদর্শন বিষয়ে [কথা] হইতে থাকিলে, কয়টি ধাম লেখকের ভাগ্যে দর্শন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে বদরিকাশ্রম এবং পুরী, এই দুইটি ধাম হইয়াছে জানিতে পারিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন ঃ "তাহলে আর কি-কি বাকি ?" সে বলে ঃ "দ্বারকা আর রামেশ্বর—তবে রামেশ্বর এই পথে।" ইহা শুনিয়া শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লন, রামেশ্বর কতদূর—যাইতে কত দিন লাগে, ইত্যাদি। তাঁহার প্রশ্নে তিনি রামেশ্বরে যাইতে ইচ্ছুক ভাবিয়া বলিলাম ঃ "যাবেন তো চলুন না, মা। মাদ্রাজে তো শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) রয়েছেন। তিনি সব বন্দোবস্ত করে দেবেন।" শ্রীমা বলিলেন ঃ "ঠিক বলেছ, বাবা; আমার শ্বশুর গিয়েছিলেন, সেখান থেকে রামশিলা এনেছিলেন—কামারপুকুরে দেখেছ তো, এখনো পূজো হয়ে থাকে। আমি যাব।"

ঐরূপে স্থির হইলে, শরৎ মহারাজ এবং শশী মহারাজকে পত্র দেওয়া হয় এবং যাওয়া পাকাপাকি হইলে শ্রীমার আদেশে জয়রামবাটী হইতে ছোটমামীকে লইয়া আসি। কোঠার হইতে তাঁহাকে জয়রামবাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলাম—এক্ষণে রামেশ্বর যাইবার জন্য লইয়া আসিলাম।

রামের মা ও নিতাইয়ের মা আমাদের সঙ্গী হইলেন। যথাসময়ে সকলে ভদ্রকে আসিলাম। রাম পুরী যাইবেন বলিয়া নিজের জন্য

তথাকার টিকিট কিনিলেন। শুকুল মহারাজ, কৃষ্ণলাল ও লেখকের জন্য তিনখানি ইন্টারক্লাসের [টিকিট] মাদ্রাজ অবধি কেনা হইল। শ্রীমা, ছোটমামী, গোলাপ-মা, রামের মা এবং নিতাইয়ের মা—এই পাঁচজনের জন্য পাঁচখানি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট হইল। রাধুর লাগে নাই—মাদ্রাজ হইতে ওদিকে লাগিয়াছিল।

শ্রীমার সঙ্গে যাঁহারা রামেশ্বর গিয়াছিলেন, সকলেরই নাম আমরা উল্লেখ করিলাম—আমাদের সযত্নে রক্ষিত নোট হইতে আর আমাদের স্মৃতি হইতে। যদি কেহ অন্যপ্রকার বলেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় তিনি শুনা-কথা বলিতেছেন, অথবা সত্যের অপলাপ করিতেছেন—কোন স্বার্থ বা কারণবিশেষে প্রণোদিত হইয়া।

যথাসময়ে ভদ্রক হইতে মাদ্রাজ মেলে উঠা গেল।

রামেশ্বর-যাত্রার সূত্রপাত করিতে গিয়া মনে হয়, কোঠারের সবদিনের ঘটনা দেওয়া হইয়াছে কি না, একবার দেখি। অন্বেষণে ধরা পড়িল, একদিনের ঘটনার বর্ণনা করা হয় নাই। অতএব, যথাস্থানে না হইলেও এখানে দিতেছি—

সরস্বতী-পূজা হইয়া গিয়াছে। মঙ্গলবার; বৈকালবেলা। এদিন লেখকের পক্ষে মাতৃসঙ্গলাভের এক অতি স্মরণীয় দিন। খিড়কিমহলে গিয়া দেখি, শ্রীমা পূর্ব হইতেই বসিয়া আছেন। দেখিলাম, উপস্থিতি অনুভব করিলেন না। সন্দেহ হইল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কতক্ষণে দেখিতে পান এবং কথা কহেন। কিছুই না পাইয়া বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, বাতের জন্য পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন বটে, কিন্তু শরীর উন্নত, চক্ষুর্দ্বয় উন্মুক্ত হইলেও বাহ্যদৃষ্টি উহাতে নাই। ভাবের বিঘ্ন উৎপাদন না করিয়া স্থিরভাবে অপেক্ষা করিলাম, আর সে-মুখচ্ছবি অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলাম। আন্দাজ দশ-পনের মিনিট অপেক্ষার পর প্রথম কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসিলেন ঃ "কতক্ষণ এসেছ ?" বলিলাম ঃ "বেশিক্ষণ নয়। আপনি কতক্ষণ এখানে এসেছেন, মা ?"

"বদ্ধ হয়ে থাকতে ভাল লাগে না—তাই দুপুরবেলা ওরা সব শুলে, বেরিয়ে নিরিবিলিতে বসে আছি।"

ঐ কথায় মনে পড়িল, ভাল লাগে না বলেই তো কলিকাতায় ভাড়াটিয়া বা নিজস্ব বাড়িতেও মাঝে মাঝে ছাদে গিয়া একাকিনী বসিয়া থাকিতেন।

শ্রীমা বলিতে থাকিলেন। কিভাবে বলিতে থাকিলেন তাহা আমরা বলিব না; কারণ আমাদের ধারণা ভ্রান্তিমূলক—আমরা তাঁহাদের কি বুঝিব ?—কেবল তাঁহার উক্তিগুলিই দিতেছি।

শ্রীমা বলিতে থাকিলেন ঃ "বারবার আসা—এর কি নিস্তার নেই ? যেখানে শিব, সেখানেই শক্তি—শিব শক্তি একত্তরে [একত্রে], বার বার সেই শিব, সেই শক্তি। নিস্তার নেই। তবু তো লোকে বোঝে না—কত কষ্ট ঠাকুর করছেন, তাদের জন্যে ! কি সব তপিস্যে —তপিস্যের দরকার কি ? তবু তপিস্যে—খালি লোকের জন্যে। লোক কি পারবে ? তাদের তেজ কই, শক্তি কই ? তাই তো ঠাকুরকে সব করতে হয়। কাঁকুড়গাছির একটা গান জান ?" জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "কোন গানটা, মা ?"

শ্রীমা—"'এসেছে কাঙালের ঠাকুর কাঙালের তরে'—সত্যিই বাছারা আমার কাঙাল। একবার 'মা' বলে ডাকলে কি থাকা যায় ? অমনি ঠাকুরকে আসতে হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "চৈতন্যদেবেও কি এই ঠাকুর ?"

শ্রীমা—"হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই ঠাকুর বার বার—একই চাঁদ রোজ রোজ। নিস্তার নেই—ধরা পড়া আছেন। তাঁরই জীব। তিনি দেখবেন না তো কে দেখবে, ও পাড়ার লোকে এসে ? বলেছেন, 'যখনি ডাকবি মোরে, এসে দেখা দিব তোরে'।—এইটি মনে রেখ —কখনো ভুলনা—ডাকলেই পাবে—তিনি যে কল্পতরু !"

বলিলাম ঃ "আমি জানি, আমার মাকে।"

শ্রীমা—"ঠাকুরই তো 'মা' বুলি শিখিয়েছেন। 'মা' বলা কি ছিল আর ? তাঁর সৃষ্টি—তিনি প্রসব করছেন আবার খেয়ে ফেলছেন।

খেয়ে ফেলছেন মানে কি ?—মুক্ত করে দিচ্ছেন। তাঁর লীলা, তাঁর খেলা !"

রাধু আসিল। শ্রীমা তাহাকে দুইটা পান আনিতে বলিলেন। সে পান দিয়া শ্রীমাকে লইয়া যাইবার জন্য বায়না করিতে থাকে। শ্রীমা বলিলেন ঃ "একটু নিরিবিলিতে বসে আছি; তুই যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।" সে রাগিয়া চলিয়া গেলে শ্রীমা একটি পান সন্তানকে দিয়া এবং অপরটি নিজে খাইয়া পুনরায় বলিতে থাকিলেন ঃ "বলে—'বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি, যাতনা সহিবে কদিন'—একি খালি জীবের—এ যে ঠাকুরের ! তাই বসে বসে ভাবছিলুম। দেখলুম, শেষ নেই। কি কষ্ট ঠাকুরের—কে বুঝবে ?" বলিলাম ঃ "খালি ঠাকুরের কেন মা, আপনারও তো। ঠাকুর আর আপনি তো এক।" শ্রীমা বলিলেন ঃ "ছিঃ, ওকথা বলতে আছে, বোকা ছেলে ? আমি যে তাঁর দাসী ! পড়নি ?—'তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি ঘরণী, আমি ঘর; যেমনি করাও, তেমনি করি।' সব ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই। এক এক বার মনে হয়, জীবের ধার কি শোধ হবে না ? আবার ভাবি—না—এ-ধার তো শোধ হবার নয়—দাঁতে কুটো কেটেও নয়—জীব যে তাঁর !"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "তাই বুঝি যে-আসছে মন্ত্র নিতে, তাকেই দিচ্ছেন ?" শ্রীমা বলিতে থাকিলেন ঃ "কত শোক তাপ পেয়ে, কত জ্বালা যন্ত্রণায় জীব ছটফট করে আসছে, ঠাকুর না হলে কে তার জ্বালা ঘোচাবে ? তিনি যে ব্যথার ব্যথী। তিনি যে নিজে তার চেয়েও জ্বালা পাচ্ছেন, তাই তো তার জ্বালা বুঝছেন।"

ভিতর হইতে রাধু চিৎকার করিতে থাকায় শ্রীমা "বস, রাধিকে খেতে দিয়ে আসছি" বলিয়া চলিয়া গেলেন। একবার মনে হইল, বলি—ঠাকুরের অপেক্ষাও আপনাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইতেছে; আবার ভাবিলাম, না, ভাবের বিঘ্ন করা উচিত নহে। যাহা বলিতেছেন, শুনিয়া যাইব।

শ্রীমা ফিরিয়ে আসিয়া বলিতে থাকিলেন ঃ "হ্যাঁ, কি বলছিলুম ?" বলিলাম ঃ "ঠাকুরের কথা।" বলিতে লাগিলেন ঃ "একবার দেখি কি, তা জান ? দেখি না, ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যেদিকে দেখি, সেই দিকেই ঠাকুর—কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। তখন বুঝলুম, তাঁরই সৃষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। জীব কোন কষ্ট পাচ্ছে না—তিনিই পাচ্ছেন। তাই তো যে-এসে কেঁদে পড়ে, তাকেই উদ্ধার করতে হয়। তাঁরই জিনিসে তাঁকেই করি !"

আবার বলিলেন ঃ "এরা সব ঘুমুতে বলে। ঘুম কি আর আছে, না আসে ? মনে হয়, যতক্ষণ ঘুমুব, ততক্ষণ জপ করলে জীবের কল্যাণ হবে। এক-এক বার মনে হয়, এই শরীরটুকু না-হয়ে একটা খুব বড় শরীর হতো, তাহলে কত জীবেরই না কল্যাণ হতো !"

আবার বলিলেন ঃ "একটা ডেও পিঁপড়ে যাচ্ছে—রাধি তাকে মারবে—দেখলুম কি তা জান ? দেখলুম, সেটা পিঁপড়ে তো নয়—ঠাকুর—ঠাকুরের সেই হাত, পা, মুখ, চোখ, সব সেই !—রাধিকে আটকালুম—ভাবলুম, তাইতো, সব জীব যে ঠাকুরের ! আমি আর কি করতে পাচ্ছি—কজনকে দেখতে পাচ্ছি ? তিনি যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন ! সকলকে দেখতে পারতুম, তবে তো হতো !"

ঠাকুরবাড়িতে শঙ্খ-ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। শ্রীমা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বলিলেন ঃ "সন্ধ্যে হয়ে গেল ! যাই ঠাকুরকে সন্ধ্যে দিইগে। কত কি বকলুম !" উত্তরে বলিলাম ঃ "মা, আজকের কথাগুলি একটা শোনবার জিনিস !" হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "লিখে রাখছ নাকি ?" বলিলাম ঃ "হ্যাঁ মা। আপনি যখন জয়রামবাটী থাকেন, আর আমি কলকাতায়, তখন সময় পেলেই ঐগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি।" শ্রীমা হাসিলেন। যাইতে উদ্যতা হওয়ায় প্রণাম করিলাম। আশীর্বাদ করিলেন আর যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিয়া গেলেন ঃ "মা আর ছেলে, মা আর ছেলে !" কাছারিবাড়ির দিকে ফিরিলাম। কানে বাজিতে থাকিল—"মা আর ছেলে, মা আর ছেলে !"

সেই রাত্রে চুপি চুপি বসিয়া নিজ ঘরে নোট লিখিতেছি, কৃষ্ণলাল পিছনে নিঃশব্দে উপস্থিত হইয়া জানিতে চাহিলেন, কি লিখিতেছি। তাঁহাকে বলিবও না, তিনিও ছাড়িবেন না। অগত্যা কাহাকেও না-বলিবার প্রতিশ্রুতি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া নোটবইখানি দিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া বলিলেন ঃ "ভাই, তুই তো কাজ গুছিয়েছিস !"

রামেশ্বর যাত্রায় ভদ্রক স্টেশন হইতে মাদ্রাজ মেল ধরা হয়—ইহা বলা হইয়াছে। লেখককে অধিকাংশ সময় শ্রীমার গাড়িতে থাকিতে হয়। পুরী যাইবেন বলিয়া রাম যথাসময়ে খুড়দা রোড স্টেশনে নামিয়া গেলেন। গাড়ি চলিতে থাকিল।

প্রাতঃকালে প্রসিদ্ধ চিল্কা হ্রদের ধার দিয়া গাড়ি চলিল। ঐ হ্রদকূলে কোথাও সারি সারি বক সবেমাত্র বাসা হইতে বাহির হইয়া গা ঝাড়িতেছে, কোথাও বা বকের সারি আহারের অন্বেষণে ঘুরিতেছে; আবার অদূরের পাহাড় হইতে একসারি উড়িয়া আসিয়া হ্রদে নামিতেছে।

শ্রীমা এই অপূর্ব দৃশ্যে বালিকার ন্যায় আনন্দিতা হইয়া আমাদের দেখাইলেন। আবার কতকগুলি নীলকণ্ঠ পাখি দেখিয়া হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। যাহা হউক, গাড়ি হুড় হুড় শব্দে বেলা আটটার সময় গঞ্জাম জিলার বহরমপুর স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল।

এখানে শশী মহারাজের বন্দোবস্তে কেলনার কোম্পানীর বাঙ্গালী ম্যানেজার কয়েকটি মাদ্রাজী ভক্ত লইয়া আমাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা আমাদের নামাইয়া একটি পূর্বনির্দিষ্ট বাড়িতে লইয়া গেলেন। এখানে আহারাদির ও বিশ্রামের সকল বন্দোবস্ত উক্ত ম্যানেজারবাবু করেন। লোকটি নিরীহ। অপরাহ্ণে শ্রীমার দর্শনে কয়েকজন মাদ্রাজী এবং গঞ্জামবাসী ভক্ত কদলী ও নারিকেল লইয়া আসেন। সেরাত্রি তথায় বাস করিয়া পরদিন প্রাতে আবার মাদ্রাজ মেল ধরা হয়। সেদিন ও সেরাত্রি গাড়িতেই থাকিয়া তৎপরদিন দ্বিপ্রহরে মাদ্রাজ পৌঁছি।

পথিমধ্যে অপরাহ্নে প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস ওয়ালটেয়ার পড়ে। পাহাড়ের গায়ে সারি সারি অট্টালিকা দেখিয়া শ্রীমার আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন ঃ "দেখ দেখ, ঠিক যেন ছবিখানি।" রাত্রে শ্রীমা গাড়ির নিচের গদিতে শুইতে রাজি নহেন; কেননা, বহুদিন পূর্বে একদিন তিনি [ঐরূপে] শুইয়াছিলেন, ঘুমের ঘোরে তাঁহার হাত জানালায় আসিয়া পড়ে, আর সেই হাতে ঠাকুরের কবচ থাকায়, ঠাকুর দেখা দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন। অতএব উপরের গদিতে শুইতে চাহিলে, তাঁহাকে তুলিয়া দেওয়া হয় এবং নামিবার আবশ্যক হইলে নামানোও হয়।

মাদ্রাজ স্টেশনে শশী মহারাজ কয়েকজন ভক্তসঙ্গে এবং তিনখানি মোটরগাড়ি লইয়া শ্রীমাকে লইতে আসিয়াছেন। শ্রীমা ও আমরা এই প্রথম মোটরগাড়ি দেখিলাম ও চড়িলাম। মাদ্রাজ মঠের নিকট মায়লাপুর নামক স্থানে একখানি দ্বিতল বাটী শ্রীমার জন্য ভাড়া লওয়া হয়। উহাতে গিয়া আমরা উঠি। প্রায় একমাস এখানে থাকা হয়। যতদিন শ্রীমা রহিলেন, তাঁহার আদেশে শশী মহারাজ দুইবেলা মঠে না-খাইয়া এখানেই আমাদের সঙ্গে খাইতেন।

শ্রীমার অবস্থানকালে নারী-বিদ্যালয়ের মহিলারা তামিল ভজন এবং কুমারীরা বেহালা-বাদ্য অতি সুললিত সুরে শুনাইলেন।

প্রায় নিত্য সায়াহ্নে শ্রীমাকে লইয়া শহর-ভ্রমণে বাহির হওয়া হইত। একদিন সমুদ্রতীরে যাওয়া হয়। সেখানে বেড়াইবার এবং বসিবার সুব্যবস্থা আছে। একদিন নূতন মৎস্যাগার (একোয়ারিয়াম) দেখিতে যাওয়া হয়। মৎস্যাগারটি তখনও অর্ধনির্মিতাবস্থায়। নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু তখন নানা বর্ণের ও নানা আকারের সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষিত হইয়াছে। একদিন ট্রিপ্লিকেনের শৈবমন্দির (কপালেশ্বর) ও আর একদিন মায়লাপুরের পার্থসারথির মন্দির দর্শন হয়। মাদ্রাজে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐ দুইটি মন্দিরই প্রসিদ্ধ। একদিন কেল্লা দেখা হয়। এই কেল্লাই ভারতে ইংরাজের প্রথম কেল্লা। এখানে প্রথম রিক্সাগাড়ি দেখা যায়। শ্রীমাকে একদিন উহাও

চড়ানো হয়। ঘোড়ার গাড়িগুলি এখানে সবই প্রায় ব্রুহাম—কম্পাস গাড়ি নাই বলিলেই হয়। গাড়োয়ানেরা হিন্দি জানে না আর আমরাও তামিল জানি না। অতএব ইংরেজীতেই কথা কহিতে হয়।

এখানে অতি নীচ জাতি ব্যতীত কোন জাতি তামাক কোন আকারে ব্যবহার করে না। শ্রীমায়ের গুলের জন্য দোক্তাপাতা সংগ্রহ করিতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। একটা দোকানে দোক্তাপাতা দেখিয়া ইসারায় মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে, দোকানদার দোক্তা নাই বলে। পরে হাত দিয়া উহা দেখাইলেও সে বেচিতে চাহে না। কারণ বুঝিয়া কয়েকটি পাতা তুলিয়া লইতে বাধ্য হই এবং মূল্যস্বরূপ একটি টাকা দিলে সে অগত্যা প্রকৃত দাম কাটিয়া লইয়া বাকি ফিরত দেয়।

এখানে মাদ্রাজের বিষয় কিছু বলিলে মন্দ হইবে না। মাদ্রাজ কলিকাতাপেক্ষা আয়তনে বড়। তবে বসতি কম বলিয়া ফাঁকা ফাঁকা দেখায়। এখানে হাইকোর্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার দরুন তামিল, তেলেগু, কানাড়ী প্রভৃতি কতিপয় ভাষা প্রচলিত আছে। তবে তামিলই মুখ্য। সংস্কৃতের প্রচলনও খুব। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের লোক দেখা যায়। তবে দুই শ্রেণীর লোক মুখ্য—ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ। এ-অঞ্চলে জাতিবিচার প্রবলরূপে বিদ্যমান; এমনকি শুনা যায়, ব্রাহ্মণকে আহার বা পাক করিতে যদি কোন 'পারিয়া' বা শূদ্র দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে-খাদ্যসামগ্রী ফেলিয়া দিয়া রন্ধনশালা পরিষ্কার করিয়া ব্রাহ্মণ পুনরায় স্নানান্তে রন্ধন করেন। আবার ঐ মহাবিচারী ব্রাহ্মণ ললাটে নিজ সম্প্রদায়ের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া নগ্নপদে কাছারি গেলেন আর টিফিনের সময় হয়তো তাঁহার শূদ্র সহিস 'দধ্যোদন' (দধি মিশ্রিত ভাত) লইয়া গেল—তিনি অম্লানবদনে ভক্ষণ করিলেন। অন্নে দধি মিশ্রিত হইলে নাকি কোন দোষ থাকে না! আবার, এতদঞ্চলে বিবাহপ্রথায় নূতনত্ব আছে—পাত্রের মাতুলকন্যাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী। অন্যথায় অপর পাত্রীর অনুসন্ধান হইয়া থাকে। মাদ্রাজে রন্ধনের বিশেষত্ব এই যে, অধিকাংশ ব্যঞ্জন নারিকেল তৈলে প্রস্তুত

হয়। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, এই দেশে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তেঁতুল এবং লঙ্কা সহায়ে মাদ্রাজী 'রসম' এক অদ্ভুত জিনিস। আবার ভাতের পাঁপড় (দোসা) জীবনে প্রথম এখানেই খাই। মাদ্রাজে ইংরেজী বিদ্যার বহুল প্রচার। এদেশে শীত নাই বলিলেই হয়।

মাদ্রাজে কয়েকটি স্ত্রী ও পুরুষভক্ত শ্রীমার নিকট দীক্ষা লন। মাদ্রাজ মঠের ব্রহ্মচারী অমৃতানন্দ নামে জনৈক মার্কিনবাসী সাহেবও দীক্ষা লয়েন। শ্রীমার সহিত এইসব লোকের কথাবার্তার সময় আমাদিগকে দ্বিভাষীর কার্য করিতে হইত। কিন্তু দীক্ষার সময় মন্ত্র বা করজপ ইত্যাদির বিষয়ে আমাদের কোন সাহায্যের আবশ্যক হইত না। সকলেই শ্রীমার কথা বুঝিতেন। ইহা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

রামলাল-দাদা (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) রামেশ্বর দর্শন মানসে কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিতাইয়ের মায়ের অসুখ হওয়ায় আমাদের যাওয়ার বিলম্ব হইতে থাকিল। তাঁহার অসুখ আরাম হইল না দেখিয়া অগত্যা তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমরা এস. আই. রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়িয়া যাত্রা করিলাম। গাড়িগুলিতে সুন্দর বন্দোবস্ত। কয়েকটি ছোট ছোট কামরাবিশিষ্ট একখানি গাড়ি—তাহার এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্যন্ত একটি ছোট বারাণ্ডা আছে এবং তাহারই এককোণে চাবি লইয়া রাত্রিকালে একজন রক্ষক দাঁড়াইয়া থাকে। কোন আরোহী আসিলে রক্ষক খালি কামরার চাবি খুলিয়া দেয় আর স্থানাভাব হইলে অপর গাড়ি দেখিতে বলিয়া দেয়। প্রত্যেক কামরায় একটির উপর অপর একটি হিসাবে দুইজনের শুইবার স্থান আছে। প্রত্যেক স্থানের উপর আবার একখানি ক্ষুদ্র পাখা আছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাদের সঙ্গে চলিলেন। আমরা রাত্রে রওনা হইয়া পরদিন প্রত্যূষে মাদুরায় পৌঁছিলাম এবং সেদিন স্থানীয় মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান জনৈক মাদ্রাজী ভক্তের অতিথিস্বরূপে রহিলাম।

এখানে ভারতের বহু প্রাচীন শহর মাদুরার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। ভারতে রেলপথ নির্মাণ হইবার বহুপূর্বে যাত্রীদিগের সুবিধার্থে রানী অহল্যাবাঈ বঙ্গদেশের মেদিনীপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র হইয়া রামেশ্বর পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত রাস্তা নির্মাণ করিয়া দেন। এই রাস্তার স্থানে স্থানে সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য সত্র বা সদাব্রত আছে। এখনও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এই পথে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনান্তে জিওড়ে নৃসিংহজী, বেঙ্কটাদ্রি বা শ্রীশৈলে বালাজী, বিষ্ণুকাঞ্চী বা শিবকাঞ্চী, ত্রিচিনপল্লীতে শ্রীরঙ্গম মাদুরা, কূর্মক্ষেত্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসকল দর্শন করিতে করিতে রামেশ্বর আসিয়া থাকেন। আবার রামেশ্বর হইতে অপর একটি হাঁটারাস্তা ভারতের পশ্চিম সাগরের উপকূল দিয়া দ্বারকা পর্যন্ত গিয়াছে। সাধুরা রামেশ্বর দর্শনান্তে ঐ পথে পদ্মনাথ, জনার্দন, কন্যাকুমারী, গোকর্ণ মহাদেব, মহাবালেশ্বর, পাণ্ঢারপুর ইত্যাদি তীর্থস্থান দর্শন করিতে করিতে প্রভাস ও দ্বারকায় উপস্থিত হন।

মাদুরা ভাগাঈ বা ভগারু নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। এখানে দুইটি ধর্মশালা আছে। একটি রেলস্টেশনের নিকট এবং অপরটি ভাগাঈ নদীর তীরে। অপরাহ্নে আমরা মন্দির দর্শনে বাহির হইলাম। মাদুরার মীনাক্ষি-মন্দির অতি প্রসিদ্ধ মন্দির। এরূপ সুন্দর প্রাচীন ও প্রকাণ্ড মন্দির দক্ষিণ ভারতে আর নাই। ভাস্কর্যনৈপুণ্যে উহা ভারতে অদ্বিতীয়। এই মন্দির সম্বন্ধে স্থলপুরাণে বিবৃত হইয়াছে—

দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভারতের তীর্থসমুদয় ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিবামাত্র ঐ পাপ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তখন তিনি সহসা পাপমুক্তির কারণ অবগত হইবার জন্য অন্বেষণে এক অনাদি-লিঙ্গ দেখিতে পাইয়া বিশ্বকর্মার দ্বারা মন্দির নির্মাণ করাইলেন এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় বৈদিকমতে বৃহস্পতির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়া লিঙ্গমূর্তির নামকরণ করিলেন—'সুন্দর'। উক্ত পুরাণে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীরামচন্দ্র সীতা-অন্বেষণে লঙ্কাভিমুখে আসিবার সময় অগস্ত্যমুনির আদেশে মাদুরায় এই সুন্দরদেবের পূজা ও আরাধনা করেন।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্তারা ঐ মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রাচীর ও গোপুরম বা প্রবেশদ্বার ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। এক্ষণে ঐ ভাঙ্গা গোপুরমের নিম্নে বাজার বসিয়া থাকে। মন্দিরটি চতুর্দিকে রাজপথে বেষ্টিত। উহাতে নয়টি প্রবেশদ্বার আছে। তন্মধ্যে একটি ১৫২ ফিট উচ্চ। ঐ দেবালয়ের প্রাকার উত্তর-দক্ষিণে ৮৩৭ ফিট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৭৪৪ ফিট। মন্দিরমধ্যে সুন্দরেশ্বর স্বামী বা 'সুন্দর' লিঙ্গের এবং মীনাক্ষি দেবীর মূর্তি বিরাজিত। স্থানে স্থানে সুন্দরেশ্বরের লীলার জন্য কতকগুলি মণ্ডপ আছে। তন্মধ্যে 'সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপ' ও 'বসন্ত-মণ্ডপ' নামে মণ্ডপদ্বয় প্রসিদ্ধ। মন্দিরের সমুদয় অন্তর্ভাগ একটি খিলানের উপর স্থাপিত এবং সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপ অর্থাৎ এক সহস্র স্তম্ভযুক্ত দালান ভাস্কর-শিল্প ও চিত্র-চাতুর্যে বর্ণনাতীত—উহা এক দেখিবার জিনিস। বসন্ত-মণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ১০০ গজ ও প্রস্থে ৬০ ফিট। উহার ছাদ ১২০ ফিট প্রস্তর-স্তম্ভের উপর নির্মিত এবং প্রত্যেক স্তম্ভ ২০ ফিট উচ্চ। উহার মধ্যে জল প্রবাহিত হইবার পয়ঃনালী আছে। ঐ মণ্ডপে বৈশাখী শুক্লপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত সুন্দরেশ্বর স্বামীর বসন্তক্রীড়া-উৎসব হইয়া থাকে। সে-উৎসবে বহু লোকসমাগম হয়। ঐ মণ্ডপ ভক্তরাজ তিরুমল নায়ক কর্তৃক কুড়িলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত। মন্দিরপার্শ্বে প্রস্তরনির্মিত শিবগঙ্গা নামক সরোবর। সরোবরটির চতুর্দিকে চাঁদনি এবং মধ্যস্থলে সুন্দর-লীলা-মণ্ডপ।

শ্রীমা প্রভৃতি সকলে ঐ সরোবরে অপরাহ্ণে স্নানান্তে যথাবিধি দর্শনাদি করিয়া সন্ধ্যার পর প্রত্যাগমন করিলেন। এদেশে চলিত প্রথানুসারে স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার সময় দীপ কিনিয়া শিবগঙ্গার তীরে নিজ নিজ নামে রাখিয়া যায়। শ্রীমাও নিজ নামে দীপ দান করিলেন। রাত্রে মন্দিরটি আলোকমালায় আলোকিত করা হয়।

একমাইল দূরে তিরুমল নায়কের চৌলট্রি বা রাজভবন দর্শনযোগ্য স্থান। সমুদয় ভবনটি প্রস্তরনির্মিত ও সুগঠিত। ঐ প্রশস্তগৃহের ছাদ একশ পঁচিশটি আশ্চর্যজনক খোদিত স্তম্ভের উপর সুরক্ষিত। এক্ষণে

ঐ স্থানে জজের আদালত আদি কয়েকটি সরকারি দপ্তর আছে। ঐ স্থানে জজের বাংলো-সংলগ্ন জমির উপর একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে —যাহার মূলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ ফিট এবং শাখাগুলি প্রায় ১৮০ ফিট পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ চৌলট্রি হইতে দেড়মাইল পূর্বোত্তরে রামেশ্বরের হাঁটা-রাস্তার পার্শ্বে তেপ্পনপুলম্ নামে এক সুবৃহৎ সরোবর আছে। উহার প্রত্যেক দিক ১২০০ গজ দীর্ঘ; চতুর্দিকে প্রস্তরনির্মিত সৌধাবলী ও স্থানে স্থানে প্রস্তরনির্মিত অশ্ব, ময়ূরাদি মূর্তি। সরোবরের মধ্যস্থলে চতুর্দিক প্রস্তরে বাঁধানো একটি উপদ্বীপ আছে। উহার মধ্যস্থলে দ্বিমহল দেবালয় ও চারিকোণে কারুকার্যবিশিষ্ট চারিটি ক্ষুদ্র দেবমন্দির আছে। গ্রীষ্মকালে জলযাত্রা উৎসবে সন্ধ্যার পর সুন্দরেশ্বর স্বামী মীনাক্ষি দেবীর সহিত ঐ সরোবরে আসিয়া নৌকারোহণে ঐ উপদ্বীপের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সেই সময় সরোবরটি চতুর্দিকে এক লক্ষ বাতি দ্বারা আলোকিত করা হয়। শ্রীমা প্রভৃতি রামেশ্বর যাইবার এবং প্রত্যাগমনের সময় ঐসব স্থান দেখিয়া অতিশয় আনন্দিতা হন। শ্রীমা বলেন ঃ "কী সব ঠাকুরের লীলা!"

পরদিন দ্বিপ্রহরের গাড়িতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণে পাম্বান প্রণালী বা হরবলার খাড়ির (Pamban Pass) তটে আসিলাম। ঐস্থানে রেল শেষ হইয়াছে। স্টেশনটির নাম মণ্ডপম্। এখানে একখানি ক্ষুদ্র স্টীমার-যোগে খাড়িটি পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে আসিতে হইল। এক্ষণে ঐ খাড়ির উপর রেল চলিতেছে; কিন্তু আমরা যখন যাই, তখন সেতুর স্তম্ভগুলির কিয়দংশমাত্র নির্মিত হইয়াছিল। ত্রেতাযুগের সেই নলনির্মিত সেতু আজও সমুদ্রোপকূলসস্থ উচ্চাপল্লী হইতে আরম্ভ হইয়া লঙ্কা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ মাইল এবং প্রস্থে দুই-তিন মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মধ্যে দুই-তিন স্থান ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আর উহার উপর দিয়া এক্ষণে চলাচল হইতে পারে না। এখনও উহার উচ্চাপল্লী হইতে খাড়িকা বা হরবলার খাড়ি পর্যন্ত এগার মাইলের একটি অংশ ভারতের সহিত সংবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার পর দুই মাইল ভগ্ন—উহাকেই 'পাম্বান পাস' বলে। জাহাজ

গমনাগমনের জন্য নাকি পরে তোপ দিয়া ঐ অংশটুকু ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এখনও স্থানে স্থানে জলমধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসকল দেখিতে পাওয়ায় মনে হয় যে, শ্রীরামের সেতু প্রস্তরদ্বারাই নির্মিত হইয়াছিল। ঐ পাম্বান খাড়ির পর ২৪ মাইল দীর্ঘ ও ৩-৪ মাইল বিস্তীর্ণ রামেশ্বর দ্বীপ। উহার পর আবার প্রায় তিন মাইল ভগ্ন; তথায় জোয়ারের সময় জল থাকে, কিন্তু ভাটার সময় স্থানে স্থানে বালি ও প্রস্তর জাগিয়া উঠে। তাহার পর আবার সেতুর ১৮ মাইল দীর্ঘ ও আড়াই মাইল বিস্তৃত আর একটি অংশ। ঐ অংশটির নাম 'মান্নার দ্বীপ'—উহাতে একটি দুর্গ এবং বহু লোকের আবাসভূমি ও নগর আছে। তাহার পর পুনরায় দুই মাইল ভগ্ন; ঐ ভগ্নাংশটি পার হইয়াই লঙ্কা। ঐখানেও জল খুব কম। এত কম যে, ভাটার সময় মান্নার দ্বীপ হইতে মনুষ্য ও গাভী হাঁটিয়া পার হইয়া লঙ্কায় যায়। পূর্বে ঐ সেতু-সাহায্যেই লোকে যাতায়াত করিত। কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ১৪৮৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে চলাচল বন্ধ হইয়াছে। ঐ সেতুর উভয় পার্শ্বে সমুদ্রের জল কম এবং অভ্যন্তরে বালুকা ও পর্বত। এই হেতু ক্ষুদ্র নৌকা ব্যতীত জাহাজাদি চলিতে পারে না। শ্রীমা ঐসব দেখিয়া ও শুনিয়া বলেন ঃ "দেখেছ বাবা, কোন্ যুগের চিহ্ন আজও রয়েছে!"

আমরা স্টীমারযোগে রামেশ্বর দ্বীপের যে স্থানটিতে আসিলাম, তাহাকে পাম্বান বা পবন বন্দর বলে। ঐ বন্দর হইতে কতকগুলি স্টীমার কলম্বো, মাদ্রাজ, তুতকুরী [তুতিকোরিণ] (Tuticorin) আদি স্থানে যাতায়াত করে। ঐ বন্দরে সমুদ্রোপকূলে সাহেবদিগের তিন-চারিটি বাংলা, কয়েকটি মালগুদাম এবং একটি ধর্মশালাও আছে। আমরা ঐ বন্দর হইতে পুনরায় রেলযোগে রামেশ্বর স্টেশনে রাত্রি প্রায় এগারটার সময় পৌঁছি এবং পাণ্ডা গঙ্গারাম পীতাম্বর-নিযুক্ত একখানি দ্বিতল বাড়িতে গিয়া উঠি। স্টীমার হইতে নামিয়া রামেশ্বর দ্বীপের রেলগাড়িতে চড়িবার সময় শ্রীমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হয় আর সেহেতু একটি পুঁটলি হারাইয়া যায়।

রামেশ্বর মন্দিরের চতুর্দিকে পঞ্চাশ-ষাট ঘর ব্রাহ্মণ বা পাণ্ডার বাস। উহা ভিন্ন অপর জাতীয় লোকেরও বাস আছে। ঐখানে সকল সম্প্রদায়ের সাধুদিগের মঠ আছে। স্থানটি একটি ক্ষুদ্র শহরের ন্যায়। বাজারে সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। কতকগুলি ধর্মশালা এবং যাত্রীদের থাকিবার জন্য পাণ্ডাদিগের নির্মিত কয়েকটি বাসাবাটীও আছে। ঐ পাণ্ডারা আর্যাবর্তবাসীদিগের ভাষা না জানায় সকলেরই কার্য-সুবিধার জন্য দুই-একটি আর্যাবর্তবাসী গোমস্তা আছে। রামেশ্বরের সর্বত্রই কূপের জল—জল মিষ্ট, জলকষ্ট নাই। দ্বীপটি বালুকাময় ও বাবলা বৃক্ষে ভরা; কৃষির সম্পর্ক নাই। অধিকাংশ দ্বীপবাসী দানের উপরই নির্ভর করিয়া দিনপাত করে। দ্বীপটি মাদুরা জেলান্তর্গত এবং রামনাদের রাজার জমিদারির মধ্যে গণ্য।

রামেশ্বরের প্রকট হওয়া সম্বন্ধে পুরাণে পাওয়া যায় : শ্রীরামচন্দ্র বানরসৈন্যসহিত লঙ্কা যাইবার জন্য সমুদ্রোপরি সেতুবন্ধনকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া একসময় পানীয় জলের আদেশ করেন। জল আসিলে তাঁহার স্মরণ হয়, তখনও শিবপূজা হয় নাই; কি করিয়া জল পান করেন? অতএব জলপান না করিয়া তিনি পার্থিব শিবলিঙ্গ গঠন এবং ঐ লিঙ্গের যথাবিধি পূজা করিয়া প্রার্থনা করেন : "হে শম্ভো! এই সমুদ্রের জল অগাধ; রাক্ষসাধিপতি রাবণও অতি বলবান্ এবং যুদ্ধে একমাত্র সহায় এই বানরকুলও চপল। অতএব, হে প্রভো! এবিষয়ে আপনি আমায় সাহায্য করুন। রাবণ আপনার ভক্ত-হেতু মানবগণের সর্বথা অজেয় হইলেও হে শিব! আপনি তো সর্বদা ধর্মের পক্ষপাতী, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।" শ্রীরামের ঐরূপ স্তবে ভগবান শঙ্কর জ্যোতির্ময় রূপ ধারণপূর্বক পার্বতী ও গণাদিতে পরিবৃত হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। শ্রীরঘুনাথও ঐ প্রকার শিব সন্দর্শন করতঃ পুনর্বার বিবিধ উপচারে পূজা ও স্তব করিয়া স্বীয় জয় প্রার্থনা করিলে, মহাদেব কহেন : "তোমার জয় হউক।" তখন শ্রীরাম পুনঃ প্রার্থনা করেন : "হে দেব! যদি দাসের উপর অহৈতুকী কৃপাদান করিলেন, তবে

লোকহিতায় এবং জগৎকে পবিত্র করিবার জন্য কৃপয়া এই স্থানে চিরাবস্থান করুন।" মহাদেবও ভক্তের প্রার্থনায় "তথাস্তু" কহিয়া লিঙ্গরূপী হন; এবং অবনীমণ্ডলে 'রামেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ঐ সমুদ্রতীরে অবস্থান করিতে থাকেন।

রামেশ্বরের প্রকট-বিষয়ে পুরাণে উপরোক্ত প্রকার বর্ণনা থাকিলেও আরও দুইটি সুন্দর কিংবদন্তি প্রচলিত আছে—একটি লোকমুখে প্রবাদ, অপরটি মন্দির-মধ্যে এক প্রকোষ্ঠে রামনাদের রাজা কর্তৃক মূর্ত্যাকারে [illegible]বৃত। দুইটিই এখানে দেওয়া হইতেছে।

লঙ্কা হইতে উদ্ধার পাইয়া সীতাদেবী শ্রীরামকর্তৃক দুষ্পার জলধির উপর সেতুবন্ধনদৃষ্টে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূতা হইয়া স্বামীর কীর্তি চিরদিন অক্ষয় রাখিবার মানসে ঐ স্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবতী হন। অত[illegible] প্রতিষ্ঠার উপযোগী শিবলিঙ্গ আনয়ন করিতে হনুমান প্রেরিত হন। [illegible]দেশ পাইবামাত্র হনুমান ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে কেদার[illegible] গোকর্ণ এবং আরও কতকগুলি লিঙ্গ লইয়া উপস্থিত হন এবং সে[illegible]লি সীতাদেবীকে দেন। কিন্তু যখন জানকী দেখেন যে, ঐ সব লিঙ্গের মধ্যে কাশীর বিশ্বনাথ নাই, তখন তিনি উহা আনিতে পুনরায় হনুমানকে প্রেরণ করেন। অতঃপর হনুমানের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তাহাকে অপারগ ভাবিয়া সীতাদেবী নিজে খিচুড়ি বা অন্নপিণ্ড ঐস্থানে ঢালিয়া দেন, যাহা ক্রমে জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন এবং লিঙ্গের আকার ধারণ করে। তখন তিনি উহার নাম 'রামেশ্বর' রাখেন। ঐ উপায়ে রামেশ্বরের স্থাপনা হইয়া গেল। পরে হনুমান কাশীধাম হইতে বিশ্বেশ্বর লইয়া আসেন এবং রামেশ্বর-দৃষ্টে ক্ষোভ ও অপমানে ক্রোধান্ধ হইয়া স্বীয় পুচ্ছ ঐ লিঙ্গে জড়াইয়া উহাকে উৎপাটনপূর্বক নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু জানকী-স্থাপিত শিবলিঙ্গ উৎপাটিত হওয়া দূরে থাকুক, হনুমানের ঐরূপ বলপ্রয়োগে তাঁহারই পুচ্ছ ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, তিনি ঐ স্থান হইতে এক মাইল দূরবর্তী 'রামঝর্কা' নামক স্থানে গিয়া পতিত হন। শ্রীরাম ঐ ব্যাপার দৃষ্টে ভক্ত হনুমানের নিকট গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন এবং

তাঁহার আনীত বিশ্বনাথ ও গোকর্ণাদি রামেশ্বরের চতুর্দিকে প্রতিষ্ঠা করেন।

অপর বৃত্তান্ত—লঙ্কা হইতে জানকীকে উদ্ধার করিয়া প্রত্যাবর্তন-কালে শ্রীরামচন্দ্র ঐ স্থানে আগমনপূর্বক শিবপূজার মানসে হনুমানকে কাশীধাম হইতে একটি শিবলিঙ্গ আনিতে আদেশ করেন। আদেশ পাইবামাত্র পবননন্দন পবনবেগে ধাবিত হইয়া ত্বরায় কাশীধামে উপনীত হন এবং তথায় পথে অসংখ্য শিবলিঙ্গ পতিত দেখিয়া স্বীয় বানরবুদ্ধিবশতঃ 'শিব পলাইতে পারেন' ভাবিয়া একটির পরিবর্তে দুইটি লিঙ্গ দুই বাহুমূলে লন এবং শিবের তুষ্টি সাধনার্থে স্বীয় পুচ্ছে একটি ঘণ্টা বন্ধন করিতে প্রযত্ন করেন। ভাবিলেন ঘণ্টার বাদ্য সহকারে শিবকে তিনি আনয়ন করিবেন; কিন্তু ঘণ্টা-বন্ধনের অবসরে একটি শিব পলায়ন করেন বা পড়িয়া যান। অবশিষ্ট শিবসহ [হনুমান] প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রতীরস্থ বালুকা দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্মাণ ও স্থাপনা করিয়াছেন। তাঁহাকে ঐ লিঙ্গের পূজায় উদ্যত দেখিয়া হনুমান ভক্তাভিমানে মুখ ভার করিয়া দণ্ডায়মান থাকেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ভক্তের মান বাড়াইবার নিমিত্ত তাঁহার আনীত শিবের প্রতিষ্ঠান্তে অগ্রেই পূজা করিয়া তৎপরে নিজ শিবের পূজা করেন। অদ্যাবধি সেই নিয়মে অগ্রে হনুমান-আনীত বিশ্বনাথের এবং পরে শ্রীরামচন্দ্র-স্থাপিত রামেশ্বরের পূজা ও ভোগাদি হইয়া থাকে।

রামেশ্বরমন্দির প্রস্তর-নির্মিত অতি প্রকাণ্ড এবং খোদিত কারুকার্যপূর্ণ, দেখিতে অতি চমৎকার। উহার চতুষ্কোণ-প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ১০০০ ফিট এবং প্রস্থে ৬৫৭ ফিট। মন্দিরের বাহিরে চতুর্দিকে রাজপথ। প্রবেশদ্বারের উচ্চতা ১০০ ফিট এবং মন্দিরের ১২০ ফিট। চতুষ্কোণাকার ঐ সুবিস্তীর্ণ মন্দিরদ্বার দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, পূর্বদিকে বারান্দা মন্ত্রীসহ পলিগার রাজমূর্তিপূর্ণ রহিয়াছে। ঐ রাজাই ঐ স্থানে দানশালা স্থাপন করিয়াছেন। মন্দির-মধ্যে একপার্শ্বে চতুর্দিকে প্রস্তরবাঁধানো একটি কুণ্ড আছে। মন্দিরমধ্যে কয়েকটি মহল আছে এবং সেইসব মহলে কতকগুলি দালানে দেবতার

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লীলা বা উৎসবের স্থান ও দেবদেবীর মূর্তি আছে। ঐরূপে দুই-তিন মহল অতিক্রম করিয়া রামেশ্বরজীর মহলে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ মহলের প্রাঙ্গণে প্রায় একতলা সমান উচ্চ প্রস্তরনির্মিত একটি বৃষ আছে, যাহাকে 'নন্দী' নামে অভিহিত করা হয়। সমীপে প্রায় তিনতলা উচ্চ একটি লৌহনির্মিত যূপস্তম্ভ প্রোথিত আছে—প্রত্যহই উহার পূজা হইয়া থাকে। ঐ মহলের চতুর্দিকে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, গোকর্ণ আদির লিঙ্গমূর্তি পৃথক্ পৃথক্ বিরাজিত। পার্শ্বস্থিত পৃথক্ মহলে পার্বতীদেবীর মূর্তি।

আমরা সেরাত্রি রাজপথ হইতেই উদ্দেশে রামেশ্বরকে প্রণাম করিয়া বাসায় গিয়া উঠি। পরদিন প্রাতে সমুদ্রস্নানান্তে যথারীতি উপরোক্ত দেবদেবীর দর্শনান্তে রামেশ্বরের স্থানে উপস্থিত হই। রামেশ্বরের বালুকাময় প্রস্তরের লিঙ্গমূর্তি কুণ্ডমধ্যে অবস্থিত। অতি ক্ষুদ্রকায়, কুণ্ডের উপর প্রায় অর্ধহস্ত উচ্চ। ঐ মূর্তি কঠিন পাষাণের নহে। বালুকাময় পাষাণের বলিয়া সর্বদা স্বর্ণমুকুটে আবৃত রাখা হয় এবং মুকুটোপরি জল চড়ানো ও পূজাদি করা হয়। তবে প্রাতে গঙ্গাজলে সর্বপ্রথম স্নানকালীন মুকুটাবরণ উন্মোচন করা হয়। তখন প্রকৃত মূর্তির দর্শন হইয়া থাকে। অথবা কোন যাত্রী গঙ্গোত্রীর জল চড়াইতে চাহিলে এবং সে-মর্মে রামনাদের রাজার কাছারি হইতে ১ টাকা ১২ আনা জমা দিয়া অনুমতি-পত্র লইয়া আসিলে মন্দিরের পূজারিগণ আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই জল বাবার মাথায় ঢালিয়া দেন। রামেশ্বরের নিত্য স্নান ও ভোগে গঙ্গাজল ব্যবহৃত হয় এবং প্রত্যহ সেই জল সরবরাহের ব্যয়-নির্বাহার্থে হোলকারের রানী অহল্যবাঈ বহু অর্থ দিয়া ঐ বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

বাবার পূজারী সকলেই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। বাবার গৃহে কোন যাত্রী প্রবেশ করিতে পায় না। কাহারও পূজা করিতে ইচ্ছা হইলে ঐ পূজারিদিগের হাত দিয়াই পূজা করিতে হয়। এমনকি, দক্ষিণী ব্রাহ্মণীরাও পর্যন্ত প্রবেশ করেন, কিন্তু আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণেরও প্রবেশাধিকার নাই। প্রত্যুতঃ শিবমন্দিরে ঐ নিয়ম ভারতে অপর

কুত্রাপি নাই। তবে শ্রীমার জন্য ভিন্ন কথা। রামনাদের রাজা স্বামীজীর শিষ্য এবং রামেশ্বরদ্বীপ ঐ রাজ্যান্তর্গত হওয়ায় রাজা পূর্ব হইতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরুর গুরু পরমগুরু দেবদর্শনে আসিতেছেন—তাঁহার জন্য যেন সব সুবন্দোবস্ত হয়। শ্রীমা এবং তাঁহার স্ত্রী ও পুরুষ-ভক্তেরা সকলেই একদিন স্বহস্তে গঙ্গোত্রীর জল ১ টাকা ৪ আনা তোলা হিসাবে পাণ্ডাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বাবার মুকুটাবরণ উন্মোচন করাইয়া উক্ত জল এবং সুবর্ণ-বিল্বপত্রে বাবার গৃহে বাবার পূজা করেন। শশী মহারাজ শ্রীমার পূজার জন্য ১০৮টি সুবর্ণ বিল্বপত্র পূর্বেই গড়াইয়া রাখিয়াছিলেন।

আমরা যথারীতি ত্রিরাত্রি রামেশ্বরে বাস এবং সমুদ্রস্নান, বাবার পূজা ও আরাত্রিক দর্শন করিলাম। তৃতীয় দিন শ্রীমা বিশেষভাবে বাবাকে পূজাদি দিলেন এবং পাণ্ডাদিগের পুঁথিতে লিখিত রামেশ্বরের কাহিনী কথকমুখে শ্রবণ করিয়া পাণ্ডাভোজন করাইলেন। প্রত্যেক পাণ্ডাকে একটি করিয়া জলের ঘটি দান করা হইল। শ্রীমা হাতে সুপারি ও পয়সা লইয়া কথা শুনিলেন এবং শ্রবণান্তে ঐগুলি দিয়া প্রণাম করিলেন।

যেদিন শ্রীমা গঙ্গোত্রীর জল এবং সুবর্ণ-বিল্বপত্রে রামেশ্বরের স্নান ও পূজা করিয়াছিলেন, সেদিন প্রথমে নিজসন্তানদ্বয়ের মস্তক স্বহস্তে বাবার অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া এবং তাহাদিগকে দিয়া স্নান ও পূজা করাইয়া তবে স্বয়ং করেন। তাহার পরে গোলাপ-মা, ছোটমামী এবং রাধু করেন।

প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ধূমধামের সহিত আলোক, বাদ্যাদি, রেশেলা ও হস্তী, ঘোড়া লইয়া রামেশ্বরের সোয়ারী বা পাল্কি রাজপথে বাহির হয়। প্রত্যহই বাবার এক একটি পৃথক্ পৃথক্ লীলা বা উৎসবের অনুকরণ সোয়ারীতে দেখিতে পাওয়া যায়। সোয়ারীতে যে-সকল মূর্তি বাহির হয় সেসব স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত বাবার সচল মূর্তি। সোয়ারীর সঙ্গে নর্তকীগণ, যাহাদের দেবনর্তকী বলে, অগ্রগামিনী হইয়া নৃত্যগীত করে। ঐরূপ সমগ্র মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া

সোয়ারী পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করে এবং তথায়ও আবার কিছুক্ষণ দেবনর্তকীদিগের নৃত্যগীত হয়। ঐসকল দেবনর্তকীদিগের অলঙ্কারাদি, সমুদয় বসন-ভূষণ এবং আহারাদির ব্যয় মন্দির হইতে দেওয়া হয়, তবে কাহারও কোনরূপ চরিত্রদোষ ঘটিলে তাহার নিকট হইতে অলঙ্কারাদি ফিরাইয়া লওয়া হয় এবং মন্দিরের কার্য হইতে তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়।

কথিত আছে, বাবার মাথায় গঙ্গোত্রীর জল চড়াইবার সময় লিঙ্গমূর্তি ঈষৎ বর্ধিত হয়। কার্ত্তিক মাসে রামেশ্বরের এক মেলা হয়। তাহাতে প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। অনতিদূরে শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত 'শৃঙ্গেরী' বা শৃঙ্গ গিরি মঠ। শহর-প্রান্তে একটি পুরাতন মহল ও উহার পার্শ্বস্থিত নলমন্দির বা 'টোনাগুড়ি'। ঐ মহল ও সেতুনির্মাতা নলের মন্দিরে বিশেষ কিছু নাই—প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মাত্র। নিকটে লক্ষ্মণকুণ্ড নামক চতুর্দিকে প্রস্তরে বাঁধানো পথিপার্শ্বস্থ কুণ্ড—ঐ কুণ্ডে স্নান, পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। কুণ্ডের জল মিষ্ট ও স্বচ্ছ। শহর-প্রান্তে সমুদ্রের উপকূলে রামঝরকা। উহা বালির পাহাড় বা বালিয়াড়ি-স্তূপ। ঐ স্তূপের নিম্নে ভগ্ন ফটক এবং কয়েকটি মন্দির ভগ্নাবস্থায় আছে। সিঁড়ি দিয়া উপর উঠিলে একটি বড় মন্দির, তাহাতে রামসীতা ও হনুমানের মূর্তি আছে। রামঝরকার উপর হইতে সমগ্র রামেশ্বর দ্বীপ এবং চতুর্দিকে সমুদ্র সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডা বলিল, শ্রীরামচন্দ্র ঐ স্থান হইতে হনুমানকে লঙ্কার সেতু বাঁধিবার স্থান নির্দেশ করেন। গন্ধমাদন পর্বতও আছে।

রামেশ্বর হইতে চোদ্দ-পনের মাইল ব্যবধানে দ্বীপের শেষ সীমায় প্রসিদ্ধ 'ধনুস্তীর্থ' বা 'ধনুষ্কোটি'। এই স্থান পর্যন্ত রেল গিয়াছে। হাঁটাপথে যাইতে গেলে দুই দিন এবং নৌকায় বা মেছুয়ায় প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। ঐ স্থানে মাত্র চার-পাঁচ ঘর পাণ্ডার বাস। এখানে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধাদি এবং সোনা-রূপার তীর-ধনুক দিয়া সমুদ্রের পূজা করিতে হয়। শ্রীমা তাঁহার পক্ষ হইতে কৃষ্ণলাল এবং লেখককে সোনা-রূপার তীর-ধনুক দিয়া পাঠাইয়া দিলে তাহারা যথারীতি ঐখানে রেলে গিয়া সমুদ্রের পূজা করিয়া আসে।

ধনুস্তীর্থের বিষয়ে যে-দুইটি বৃত্তান্ত পাণ্ডামুখে শুনা যায়, সেই দুইটিই নিম্নে দেওয়া হইতেছে—

(১) নল শ্রীরামচন্দ্রের সেতুনির্মাণ কার্য করিতে করিতে ঐ পর্যন্ত আসিলে সমুদ্র আর তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেয় না। বানরেরা যতই প্রস্তর দ্বারা নির্মাণ করিতে থাকে, সমুদ্র ততই উহা ভাঙ্গিয়া দেয়। সমুদ্রের ঐ প্রকার বাধা প্রদানে শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় ধনুর্বাণ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, সে ভীত হইয়া শ্রীরাম-সমীপে উপস্থিত হইয়া, অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহে ঃ "আর আমি আপনার কার্যে বাধা দিব না।" এইহেতু এস্থানের নাম 'ধনুস্তীর্থ' হইয়াছে।

(২) লঙ্কা হইতে শ্রীরামের প্রত্যাগমনকালে সমুদ্রের আশঙ্কা হয় যে, আপামর সাধারণ সেতু-ব্যবহারে লঙ্কায় উপস্থিত হইতে পারে। অতএব সে নিজ মর্যাদা রক্ষা হেতু শ্রীরামসন্নিধানে আসিয়া উহা ভগ্ন করিতে করজোড়ে প্রার্থনা করে। শ্রীরামচন্দ্রও তাহাকে দুঃখিত দেখিয়া স্বীয় ধনুর্বাণ-সহায়ে উহা ভগ্ন করিয়া সমুদ্রের মর্যাদা রক্ষা করেন। এজন্য ঐ স্থানের নাম ঐ প্রকার হইয়াছে। ['ধনুষেকাটি' বা 'ধনুষ্কোটি']

ধনুস্তীর্থ হইতে দু-তিন মাইল দূরে 'মান্নার দ্বীপ' বা সেতুর অপর অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেতুর ঐ স্থান জলমগ্ন বটে, কিন্তু জল বেশি না থাকায় উহার মধ্য দিয়া নৌকা ভিন্ন জাহাজাদি যাইতে পারে না। ঐ স্থানটির দৃশ্য বড়ই রমণীয়। বামে শান্তমূর্তি বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণে প্রবল তরঙ্গায়িত ভারত-মহাসাগর। ঐ পরস্পর-বিরোধী দুইটি সমুদ্রের ঐ ধনুস্তীর্থে মিলন হওয়ায় উগ্র ও শান্ত ভাবের একত্র সমবায় দেখা যায়। একদিন শ্রীমাকে মন্দিরের পক্ষ হইতে মণিকোঠা [রত্নাগার] খুলিয়া দেখানো হয়। প্রকোষ্ঠে সামান্য একটি দীপ জ্বলিতেছে অথচ সমস্ত ঘরটি এবং অলঙ্কারাদি সেই ক্ষীণ আলোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। শ্রীমা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন।

রামেশ্বরে ত্রিরাত্রি বাসের পর মাদুরায় ফিরিয়া আসা হয়। সেখানে একদিন থাকা হয়। শশী মহারাজের একটি বক্তৃতাও হয়। পরদিন তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্বার মাদ্রাজ ফিরিয়া আসা হয়।

মাদ্রাজে দিন কয়েক থাকিবার পর ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়। উৎসবে মাদ্রাজী কীর্তনের দলের পর দল ঠিক বাংলার মতো মঠে আসিতে থাকে এবং কীর্তন গাহিতে থাকে। ঠাকুরের জন্মতিথি পূজার দিন দুইটি ভক্ত শশী মহারাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীমার নিকট দীক্ষা লইলেন। মাদ্রাজে এপর্যন্ত যে কয়েকটি স্ত্রী ও পুরুষ-ভক্ত শ্রীমার নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন তন্মধ্যে একটি স্ত্রীভক্ত অগ্রণী ছিলেন। তিনি দীক্ষান্তে শ্রীমার নিকট তিন রাত্রি বাস করেন এবং আমাদের বাঙালী রান্না আনন্দের সহিত খাইতেন। শ্রীমা ইঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মাদ্রাজে ইলেকট্রিক ট্রাম প্রথম দেখি।

ঠাকুরের উৎসবান্তে বাঙ্গালোর মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দ (তুলসী মহারাজ) আসিয়া শ্রীমাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীমা বাঙ্গালোর যান। বাঙ্গালোরে শ্রীমা মঠের ভিতর ঠাকুরের বর্তমান শয়নঘরটিতে ত্রিরাত্রি বাস করেন এবং অন্যান্য স্ত্রীভক্তগণ মঠের অন্যান্য ঘরে থাকেন। ঐ তিনদিন পুরুষভক্তদের বাসের জন্য মঠের জমিতে তাঁবু খাটানো হয়। বাঙ্গালোরে নিত্য বহু ভক্ত দলে দলে শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিত। তাহাদের আনীত ফুল এক-এক সময় স্তূপাকার হইয়া উঠিত। মঠের জমিতে চন্দন বৃক্ষ ও একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিয়া শ্রীমা আনন্দিতা হইয়াছিলেন এবং ঐ পাহাড়টির উপর প্রস্তরাসনে পশ্চিমমুখী হইয়া বসিয়া তুলসী মহারাজের অনুরোধে জপ করেন।

বাঙ্গালোর অতি সুন্দর শহর। রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার। উঁচু-নিচু রাস্তা এবং অট্টালিকাগুলি রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকে দেখিতে অতি মনোহর। ভারতে এই শহর সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হয়। আমরা বৈদ্যুতিক আলো প্রকৃতপক্ষে এখানেই প্রথম দেখি। এখানে মহীশূর রাজ্যের রেসিডেন্ট থাকেন। একটি ছাউনিও আছে। এ দেশেরই চন্দন সর্বত্র বিক্রয়ার্থ যায়। এখান হইতে কিয়দ্দূরে একটি প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত আছে।

মাদ্রাজ হইতে বাঙ্গালোর এবং বাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজ শ্রীমা প্রভৃতি রেলের প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করেন।

বাঙ্গালোর হইতে শ্রীমা পুনরায় মাদ্রাজে আসিয়া তথায় দুই-এক দিন থাকিয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হন। রাস্তায় রাজমাহেন্দ্রীতে তথাকার জজ জনৈক মাদ্রাজী ভক্তের অতিথি হইয়া একদিন বিশ্রাম ও গোদাবরীতে স্নান করেন। জজটি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত লোক। স্বামী নির্মলানন্দের সহিত সংস্কৃতে সুন্দর শাস্ত্রালাপ করেন। রাজমাহেন্দ্রী ত্যাগ করিয়া শ্রীমা পুরীতে আসেন এবং তথায় তিন-চার দিন থাকিয়া ২৮শে চৈত্র মঙ্গলবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তুলসী মহারাজ বাঙ্গালোর হইতে বরাবর কলিকাতা পর্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন। রামলাল-দাদা ঠাকুরের উৎসব হইবার পর মাদ্রাজ হইতেই কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। নিতাইর মা আরোগ্য হওয়ায় শ্রীমার সঙ্গে পুরী আসেন। শ্রীমা এবার পুরীতে পূর্বের ন্যায় ক্ষেত্রবাসীর মঠে থাকেন নাই—সমুদ্র সন্নিকটস্থ রামেদের সুবৃহৎ অট্টালিকা 'শশীনিকেতনে' থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ সেসময় পুরীর শশীনিকেতনেই ছিলেন।

শ্রীমা কলিকাতায় ফিরিলে এতদিন পরে তাঁহাকে পাইয়া কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের ভক্তেরা কেহ প্রণাম করিতে, কেহ বা দীক্ষা লইবার মানসে আসিতে থাকিলেন। বাগবাজারের বাটী সর্বদা ভক্ত-সমাগমে মুখরিত হইতে থাকিল। বায়ু-পরিবর্তনে শ্রীমার হৃতস্বাস্থ্যের কথঞ্চিৎ পুনর্লাভ হওয়ায় তিনিও পূর্ণ উদ্যমে সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে থাকিলেন। একটা বিষয় দেখা গিয়াছে যে, যে কেহ শ্রীমার সন্নিধানে আসিয়াছেন, এমনকি তাঁহার ভাগ্যে [হয়তো] শ্রীমার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণও ঘটিয়া উঠে নাই—হয়তো মাত্র একবার শ্রীচরণ স্পর্শের অধিকার লাভ হইয়াছে, তাঁহারও সাধ হইয়াছে জন্মজন্মান্তরেও সেই দেবদুর্লভ চরণপ্রান্তে পড়িয়া থাকিতে, সাধ হইয়াছে—আজীবন দাস হইয়া থাকিতে, আর সর্বাপেক্ষা সাধ হইয়াছে—অহর্নিশি তাঁহার সন্নিধানে থাকিতে।

১৩১৮ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় নোট শেষ হওয়ায় আমাদের বাধ্য হইয়া এখানে অবসর গ্রহণ করিতে হইতেছে। মুখবন্ধেই সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি যে, শ্রীমার জীবনী লিখিবার অসীম-সাহসিকতা আমাদের নাই; তবে একমাত্র সন্তোষ এই যে, তদীয় পূত-চরিত্ররূপ সেতু নির্মাণে কাষ্ঠবিড়ালের কার্য আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে আর সে বিষয়ে শ্রীমার শ্রীমুখের অমৃতময়ী বাণীর পবিত্রতা রক্ষা এবং ভাষা যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে যদি সক্ষম হইয়া থাকি তো সে কেবলই তাঁহারই কৃপায়; ত্রুটি বা দোষগুলি আমাদের নিজের।

শ্রীমার শ্রীচরণে প্রণাম। শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম। শ্রীমার ও শ্রীঠাকুরের ভক্ত-সন্তানগণের চরণে প্রণাম!

শ্রীমা ঃ নানা ভাবে

॥ ১ ॥

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রীদ্বয় তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী কখনও কখনও শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিতেন। তাঁহারা কখনও ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেন না বা শ্রীমাকে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন না। ঠাকুরঘরের বাহির হইতেই গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুরকে এবং শ্রীমাকে প্রণাম করিতেন। শ্রীমাও তাঁহাদিগকে প্রসাদ পাইতে বলিতেন। আহারান্তে শ্রীমা স্বহস্তে তাঁহাদের পান দিতেন। তাঁহারা উহা আলগোছা লইতেন। এই সব দেখিয়া একদিন তাঁহারা চলিয়া গেলে [শ্রীমা] বলেন ঃ "এদেরই ঠিক ঠিক ভক্তি। যেটুকু ভগবানকে ডাকে, সেটুকু একমনে ডাকে। আহা!"

॥ ২ ॥

এক আত্মীয় যুবকের চরিত্রে দোষ হওয়ায় শ্রীঠাকুরের এক প্রাচীন গৃহী-ভক্ত শ্রীমার নিকট আবেদন করিয়া পাঠান, যাহাতে শ্রীমা তাহাকে নিজের নিকট আসিতে না-দেন। যুবকটি শ্রীমার সন্তান। আবেদন শুনিয়া শ্রীমা উত্তর দেন ঃ "আমার কাছে আসবে না তো কার কাছে যাবে? আমি কি খালি ভালরই মা—মন্দের নই?"

॥ ৩ ॥

কোন এক দুশ্চরিত্রা নারী শ্রীমার নিকট ঘন ঘন আসিতেন দেখিয়া অন্যান্য স্ত্রী ও পুরুষ-ভক্তেরা অসন্তুষ্ট হইতেন; এমনকি একদিন শ্রীঠাকুরের কোন এক বহু প্রাচীন ভক্তের স্ত্রী[১] শ্রীমার নিকট এবিষয়ে

---

১ বলরাম বসুর স্ত্রী—কৃষ্ণভাবিনী দেবী।—সম্পাদক

অভিযোগও করিয়া বসেন; কিন্তু শ্রীমায়ের পূর্বোক্তরূপ একই ভাবের উত্তর—"আমি কি খালি ভালটিরই মা—খারাপের নই ?" নারীটি শ্রীমার সন্তান [মন্ত্রশিষ্য] নহেন—'গোপালের মা'র।

॥ ৪ ॥

শ্রীমা রঙ্গরসে বিশেষ পটু ছিলেন। দুইটি চরিত্রবিশেষ অবলম্বন করিয়া একসময়ে এমন পারদর্শিতার সহিত হাতমুখ নাড়িয়া বর্ণনা করেন, যেন বোধ হয় সত্যই অভিনয় করিতেছেন। কিন্তু ঐরূপ করিতে করিতে অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া বলেন ঃ "আমার ছেলেরা যেন কেউ ওরকম না হয়। নেড়ানেড়ীর দল সৃষ্টি করার চেয়ে যেন বে করে গিয়ে। আমার অনুমতি রইল।" ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একজন কালে-ভদ্রে শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিতেন। শ্রীমা, কয়েকটি অন্তরঙ্গ ব্যতীত যেভাবে সচরাচর চাদর মুড়ি দিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম গ্রহণ করিতেন, এক্ষেত্রেও তাহাই করিতেন এবং সে-লোকটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে, আমরা একাধিকবার লক্ষ্য করিয়াছি, শ্রীমাকে তাঁহার চাদর ও কাপড়ে গঙ্গাজল ছিটাইবার পর চরণদ্বয় গঙ্গাজলে ধুইতে।

॥ ৫ ॥

এক প্রৌঢ়া বিধবা শ্রীমার নিকট নিত্য আসিতেন। তাঁহার বিষয়ে শ্রীমাকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ "ওরা এক আলাদা থাকের লোক। একটা-না-একটা পুরুষকে আশ্রয় করে থাকা চাই। হয়ত কামাখ্যায় গিয়ে কৌলমতে বে করে এল।"

॥ ৬ ॥

অল্পবয়স্কা জনৈকা বিধবা শ্রীমার নিকট আসিতেন। সময়ে সময়ে দু-চার দিন থাকিয়াও যাইতেন। ইঁহার অবস্থানকালে শ্রীমাকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। ইনি শ্রীমার সন্তান। শ্রীমা ইঁহাকে অনেক উপদেশ দিতেন। বলিতেন ঃ "দেখিস মা, আমার নাম ডোবাসনি।

শিষ্যের পাপ গুরুতে লাগে। খুব সাবধানে থাকবি। পুরুষমানুষ, সে যে-ই হোক না কেন—কাউকে বিশ্বেস করবিনি। পুরুষের দিকে একেবারে চাইবিনি। নিজের ধ্যান-জপ নিয়েই দিন কাটিয়ে দিবি।"

॥ ৭ ॥

রাখাল মহারাজ বা বাবুরাম মহারাজ প্রণাম করিলে শ্রীমা চাদরের ভিতর হইতে দক্ষিণ হস্তটি তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেন। স্বামীজী, নাগ মহাশয়, গিরিশবাবু বা মাস্টারমহাশয় প্রণাম করিলে চাদরের ভিতর হইতে শ্রীমা প্রতি-নমস্কার করিতেন। নাগ মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীমা কথা কহিতেন।

॥ ৮ ॥

শ্রীমা নিজ সন্তানদের কাহারও মস্তকে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিতেন, কাহারও বা চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিতেন। মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গ সন্তানদের বক্ষস্থলে এবং মস্তকে জপ করিয়া দিতেন; দুই-এক স্থলে পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া "কুণ্ডলিনী জাগুক" বলিয়া আশীর্বাদ করিতেন।

॥ ৯ ॥

আমাদের জানিত তিনটি সন্তানকে শ্রীমা দীক্ষা দিবার 'চাপরাস' দিয়াছেন। প্রথম কালীকৃষ্ণ মহারাজ [স্বামী বিরজানন্দ], দ্বিতীয় সুশীল মহারাজ [স্বামী প্রকাশানন্দ] এবং তৃতীয়জনের নাম প্রকাশ করিতে আমাদের উপর নিষেধ আছে। প্রথম দুইজনকে একই রকমের বীজসহ মন্ত্র এবং তৃতীয়জনকে উহার অতিরিক্ত অপর একটি বীজসহ মন্ত্র শিখাইয়াছেন, যাহা ঠাকুর শ্রীমাকে শিখান নাই।

॥ ১০ ॥

শুনিয়াছি, ঠাকুর মুদ্রা স্পর্শ করিতে পারিতেন না—তাঁহার অনুপস্থিতিতে শয্যাতলে রাখিয়া দিলেও ঐ শয্যা স্পর্শ করিতে

পারিতেন না। ধাতু স্পর্শ করিতে গেলে হস্তে সিঙ্গি মাছের কাঁটা ফুটার ন্যায় তিনি এক প্রকার ব্যথা অনুভব করিতেন এবং হস্ত বাঁকিয়া যাইত। আমরা শ্রীমাকে ভিন্নপ্রকারে পাইয়াছি। তিনি মুদ্রা বা অলঙ্কার হস্তে লইবামাত্র নিজ মস্তকে উহা স্পর্শ করাইতেন। কাহাকেও দিবার সময় বা কাহারও নিকট হইতে লইবার সময় ঐ প্রকারই করিতেন। শ্রীমাকে তাঁহার এবং ঠাকুরের মধ্যে ঐ প্রকার পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছি ঃ "ঠাকুর আর আমি ! আমি যে বাবা, মেয়েমানুষ—ঠাকুর যে আমায় সোনার গয়নাও পরিয়েছেন !"

॥ ১১ ॥

লেখক অধিক চা পান করিত। শ্রীমা তাহাকে উপদেশ দিয়াছেন ঃ "ঠাকুর বলতেন, 'শরীরকে শামশীতলে (সমশীতলে) রাখতে হয়।' খালি অত গরম জিনিস কি খেতে হয় ? মিছরির পানা, ডাবের জল—এসবও খেতে হয়।"

॥ ১২ ॥

মঠে চণ্ডীপাঠ হইত। শ্রীমা কিন্তু পাঠ ঠিক হইতেছে না বলিয়া বন্ধ করাইয়া দেন। পরে হরি মহারাজের [স্বামী তুরীয়ানন্দের] পাঠ শুনিয়া পূর্বাদেশ প্রত্যাহার করিয়া বলেন ঃ "হরি পড়তে পারে।"

॥ ১৩ ॥

শুনিতে পাই, ঠাকুর বলিতেন ঃ "বাংলায় অক্ষরগুলো একটা, জোর দুটো করে আছে। কিন্তু 'শ' তিনটে—শ, ষ, স—এর মানে সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর !" শ্রীমাকে আমরা ঐ অর্থে ভিন্ন উপমা দিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন ঃ "পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ থাকা চাই।" বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতেন ঃ "পৃথিবীর ওপর দিয়ে কত উৎপাত, কত উপদ্রব হয়ে যাচ্ছে, পৃথিবী কিন্তু সব একভাবে সহ্য করে যাচ্ছে। এইরকম সহ্যগুণ মানুষেরও হওয়া চাই।"

॥ ১৪ ॥

শ্রীমা তাঁহার কোন এক সেবককে বস্ত্রাদি দিতে চাহিলে তিনি উহা না লইয়া বলিতেন ঃ "মা, আমার আছে—আপনাকে দিতে হবে না।" কিছুদিন ঐভাবে কাটিবার পর একদিন শ্রীমা ঐ সেবককে বলেন ঃ "তোমায় বলতে হবে, কেন তুমি নাও না। —কে যতগুলো কাপড় দিই, সে কখনো 'না' বলে না; আর তোমায় একখানা দিতে গেলেও নাওনা—কেন ?" সেবক উত্তর দেন ঃ "ভক্তেরা আপনাকে নিজের ব্যবহারের জন্যেই দেন—সে-জিনিস কি নিতে পারি ? তারপর, এখানে আপনি পেয়ে থাকেন, দেশে তো আর পান না; সেখানে গিয়ে তো যাকে-তাকে বিলিয়ে দেন। শেষে একখানাও প্যাঁটরায় থাকে না দেখেছি। আমায় ক্ষমা করুন। আমি নিতে পারব না।" শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "তুমি আমায় কি ভাব ?" সেবক উত্তর করিলেন ঃ "আমার মা !" শ্রীমা রাগিয়া বলিলেন ঃ "বোকা ছেলে ! তোমার কি একটুও বুদ্ধি নেই—মা কি কখনো ছেলেকে না-দিয়ে খেতে-পরতে পারে ? মার ভাঁড়ার কি ছেলের বেলা খালি থাকে ? আজ বলে দিচ্ছি, যখনি যা দরকার হবে, আমার কাছে চেয়ে নেবে —তাতে আমি খুশি হব।" ইহা বলিয়া শ্রীমা প্যাঁটরা হইতে একখানি কাপড় বাহির করিয়া নিজের শরীরে একবার জড়াইয়া প্রসাদী কাপড়খানি [সেবককে] দিলেন এবং একখানি মূল্যবান গায়ের কাপড়, যাহা প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার এস. এন. ব্যানার্জীর মাতা দিয়াছিলেন, সেখানিও একবার নিজের গায়ে দিয়া প্রসাদী করিয়া দিলেন। সেবক দুইটি মাথায় ঠেকাইয়া লইয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া এতাবৎকাল সযত্নে রক্ষিত ঠাকুরের একখানি পরিধেয় বস্ত্র দিলেন। সেবক নিজ ভাবের প্রতিকূল কার্যেই হউক অথবা শ্রীমার অপার স্নেহরাশিতে মুগ্ধ হইয়াই হউক, কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রীমা তাঁহার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন ঃ "মার ওপরও ছেলের জোর আছে, বাবা,—যা দরকার হবে, চেয়ে নেবে।" সেবক নিচে আসিয়া ঠাকুরের পরা কাপড়খানির পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে কি

না ভাবিয়া শরৎ মহারাজের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দিলেন। অপর দুইখানি বস্ত্র নিজে লইলেন। শ্রীমার অত বলা সত্ত্বেও তিনি মুখ ফুটিয়া পরে কখনও কিছু চাহেন নাই। শ্রীমা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় যে-একখানি কাপড় দিতেন, তিনি তাহাই লইতেন। বহুকাল পরে একবার আমরা সেই সেবকের দেখা পাই। ইতিমধ্যে মহা ঝঞ্ঝাবাতে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া তাঁহাকে মহাদুঃখে হাবুডুবু খাইতে হইয়াছে। আমাদের সঙ্গে যখন দেখা, তখন তিনি অনাহারে দিন কাটাইতেছেন এবং শ্রীমার শরীরও নাই। বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিতেছেন ঃ "মা যখন তোমায় অত করে বলেছেন, তখন তাঁর কাছে চাও না!" তিনি উত্তর দিয়াছেন ঃ "চাইলেই পাই—খুব বিশ্বাস আছে, কিন্তু চাইব না। চুষিকাঠি দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চান—তা হবে না!"

॥ ১৫ ॥

নিম্নলিখিত ভক্ত-সন্তানগুলিকে শ্রীমা যে-যে নামে ডাকিতেন, তাহা দেওয়া হইল—

নাম	শ্রীমার ডাকা নাম
লাটু মহারাজ	নাটু
যোগীন মহারাজ	ছেলে যোগেন
যোগীন মা	মেয়ে যোগেন
কৃষ্ণলাল	কেষ্টনাল
গণেন্দ্র	গণেশ
ডাঃ কাঞ্জিলাল	কাঞ্জিনাল
ললিত [ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়]	নলিত
গৌরী-মা	গৌরদাসী

॥ ১৬ ॥

"ঠাকুর বড় কি মা বড়"—এই ভাবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমা জনৈক সন্তানকে বলেন ঃ "ছিঃ, অমন কথা বলতে হয়?" পরক্ষণে আবার

জিজ্ঞাসা করেন ঃ "তোমার কি মনে হয় ?" সন্তান বলেন ঃ "কালী মহাদেবের উপরে দাঁড়িয়ে।" শ্রীমা মৃদু হাসিয়া বলেন ঃ "তুমি ঐ নিয়েই থাক।"

॥ ১৭ ॥

দক্ষিণেশ্বরের স্বল্পায়তন নহবতখানায় আবদ্ধ থাকিয়া শ্রীমার একটি পায়ে বাতের সূত্রপাত হয়। উত্তরজীবনে, অর্থাৎ আমরা যখন তাঁহাকে পাইয়াছি, তখন বাত এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাঁহাকে ঐ পায়ে খুঁড়াইয়া চলিতে হয়। নানাপ্রকার ডাক্তারি ও কবিরাজী ঔষধে ও মালিশে এবং দৈব ঔষধেও আরোগ্য হয় নাই। দিনকয়েক একটু উপশম হইয়া পুনরায় বৃদ্ধি পায়। একসময় উহা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাঁহার শরীরে বিশেষ কষ্ট দিতেছে দেখিয়া জনৈক সন্তান তাঁহাকে বলেন ঃ "মা, আপনি অনুমতি দিন, আপনার শরীরের ঐ রোগ আমি নিজের শরীরে টেনে লই।"—ইহা বলিয়াই তিনি প্রক্রিয়া করিতে উদ্যত হন। শ্রীমা জানিতেন, সন্তানটি ঐ বিদ্যা নেপালী মাঈর নিকট লাভ করিয়াছেন এবং উহা করিতেও পারেন; সেজন্য তাঁহাকে অবসর না দিয়াই অতিশয় বিচলিতা হইয়া তাঁহার হাত দুইটি ধরিয়া বলেন ঃ "না, না বাবা, করো না। তুমি জান না—ওটা এ শরীরে (নিজ শরীর দেখাইয়া) যে কষ্ট দিচ্ছে, তোমার শরীর গেলে ঢের বেশি কষ্ট আমায় দেবে—গোদের ওপর বিষফোড়া হবে। —আমি যে মা!" মহাশক্তির নিকট ক্ষুদ্রশক্তির পরাজয় হইল।

॥ ১৮ ॥

আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি, শ্রীমাকে ত্যাগী অপেক্ষা গৃহী-সন্তানকে বেশি স্নেহ করিতে। এপ্রকার পক্ষপাতিত্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছি ঃ "এরা (ত্যাগীরা) সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ধ্যান-জপ নিয়ে আছে—নিজের চেষ্টায়ই উঠবে, আর ওরা (গৃহীরা) কচি ছেলের মতো আমার পানে চেয়ে পড়ে আছে—কাজেই আমায় দেখতে হয়।"

॥ ১৯ ॥

শ্রীমায়ের নূতন বাটীর নিকট চিৎপুর রোডে একবার শীতলার বারোয়ারি পূজা হয়। সেদিন গঙ্গাস্নানান্তে শ্রীমা ডাব, চিনি এবং দক্ষিণার পয়সা আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন ঃ "এইগুলো বারোয়ারিতলায় দাও আর মনে মনে মা শীতলাকে বোলো, 'ফলটি লও আর ফলের ফলটিও লও।' "

॥ ২০ ॥

দৈবদুর্বিপাকবশতঃ শ্রীমার কোন এক সন্তানকে[২] চিরকালের মতো সঙ্ঘত্যাগ করিতে হইতেছে। বিদায়কালে শ্রীমাও কাঁদিতেছেন, সন্তানও কাঁদিতেছে। এইভাবে খানিকক্ষণ কাটিবার পর কাহারও আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা বুঝিয়া শ্রীমা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন এবং সন্তানকে কলঘরে গিয়া চক্ষু ধুইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। আর বলিলেন ঃ "এস বাবা, যেখানে বলেছি, সেখানে গিয়ে থাকগে। জেনো, আমি তোমার কাছে সব সময় আছি। এটা (নিজ শরীর দেখাইয়া) গেলেও তা-ই। হেসে নেচে কুঁদে লও। কোন ভয় নেই।" সন্তান যখন যায়, জানালায় দাঁড়াইয়া যতদূর দেখা যায় [শ্রীমা তাহাকে] দেখিতে থাকেন। সন্তানটি পরে শুনিয়াছিল, সেদিন শ্রীমা খাইতে পারেন নাই, আর সারাদিন কাঁদিয়াছেন।

॥ ২১ ॥

শ্রীমার শরীরে বসন্তের গুটিগুলি পাকিয়া উঠিলে সেবক বেলকাঁটা দ্বারা ঐগুলি গালিয়া বোরিক তুলায় পুঁজ মুছিতে থাকে। ডাক্তার কাঞ্জিলাল উহা দেখিয়া শরৎ মহারাজের অনুমতিক্রমে সেবককে টিকা লইতে বলেন। সে অস্বীকার করিয়া বলে ঃ "মার সেবায় টিকে-ফিকের দরকার করে না।" ডাক্তার না শুনিয়া জোর করিতে থাকেন। গতিক সুবিধাজনক নয় দেখিয়া সেবক পলায়ন করে। ডাক্তার ছুটিয়া উহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকেন। সে বরাবর দৌড়িয়া

২ আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, এই সন্তান স্বয়ং লেখক (আশুতোষ মিত্র)।
—সম্পাদক

গিরিশচন্দ্রের বাটীতে সদরদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া যায়। গিরিশচন্দ্র সে-সময় উপরে বসিয়াছিলেন—সেবককে দেখিতে পান নাই—কিন্তু ডাক্তারকে ছুটিতে দেখিয়া নিজের কাছে ডাকিলেন এবং সবকথা শুনিয়া বলিলেন ঃ "তুমি ওকে ধরবে ? ও এতক্ষণে খিড়কি দিয়ে পগার পার !" ডাক্তার ফিরিয়া শ্রীমার নিকট অনুযোগ করিলে শ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলেন ঃ "ও বড় শক্ত ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই !"

॥ ২২ ॥

শ্রীমার এক সন্তান মঠে গঙ্গাস্নানকালে সাঁড়াসাঁড়ীর বানে [প্রচণ্ড জোয়ারে] পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। অতি কষ্টে সাধুদের দ্বারা বান হইতে উদ্ধার পায়। ঘটনাচক্রে ডাক্তার কাঞ্জিলাল সে-সময় মঠে ছিলেন। তিনি উহার উদর হইতে কৃত্রিম উপায়ে জল বাহির করিয়া যথাযোগ্য সেবা দ্বারা উহাকে বাঁচাইয়া তুলেন। শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। ললিতের[৩] পত্রে ঐ ঘটনার বিষয় জানিতে পারিয়া শ্রীমা লেখেন, "বাবা, আমি তো ভাবিয়া অস্থির। ঠাকুরকে তুলসী দিয়েছি। তাহাকে বলিও, সারিয়া উঠিয়া সে যেন এখানে আসে।"

॥ ২৩ ॥

জনৈক ভক্ত একখানি পুস্তক লিখিবার উদ্দেশে একটিমাত্র পরিচ্ছেদ লিখিয়া কার্যব্যপদেশে আর লিখিতে পারেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, জয়রামবাটীতে গিয়া নিশ্চিন্তে উহা শেষ করিবেন। তথায় একদিন তাঁহার অনুপস্থিতিতে জনৈক স্ত্রীভক্ত ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া ঐ লেখাটি লইয়া গিয়া শ্রীমাকে পড়িয়া শুনান। আহারকালে শ্রীমা ভক্তটিকে বলেন ঃ "তুমি তো বেশ লেখ, বইখানা শেষ কোরো।" আশীর্বাদ পাইয়া ভক্তের আনন্দ হয় এবং তিনি উহা যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করেন।

---

৩ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। ভক্তমহলে 'কাইজার' নামে সুপরিচিত।—সম্পাদক

॥ ২৪ ॥

কোন কোন সেবিকার[৪] বিষয় শ্রীমাকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ "ওরা কি কম গা ! আমাকেই ওদের ভয় করে চলতে হয়।"

॥ ২৫ ॥

শ্রীমা যেথায় যান না কেন, তাঁহার ঠাকুরের সঙ্গে একটি ছোট কৌটা থাকিত, যাহাতে সিংহবাহিনীর মাটি থাকিত। তিনি উহা নিত্য পূজার পর একটু একটু খাইতেন।

॥ ২৬ ॥

শ্রীমা অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিতেন। কাপড় কাচিয়া আসিয়া মালা লইয়া বসিতেন। বেলা আট-নয়টার সময় ঠাকুরপূজা করিতেন। পূজান্তে মিছরির পানা খাইতেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পর সামান্য বিশ্রাম করিতেন। বৈকালে চারটার সময় পুনরায় কাপড় কাচিয়া আসিয়া মালা লইয়া বসিতেন এবং রাত্রিকালীন আহার পর্যন্ত জপ করিতেন। মধ্যে সন্ধ্যা হইলে একবার সন্ধ্যা দিতেন। দিনে চারবার গুল মুখে দিতেন—প্রত্যূষে কাপড় কাচিতে যাইবার সময় একবার, দ্বিপ্রহরে আহারের পর একবার, বৈকালে কাপড় কাচিবার সময় একবার আর সর্বশেষে রাত্রে আহারের পর। গুল প্রস্তুত হইত মতিহারি শুকনো দোক্তাপাতা ভাজা আর বিচালি পোড়ার ছাই মিশাইয়া। গোলাপ-মার হাতের তৈয়ারি গুল তিনি পছন্দ করিতেন।

॥ ২৭ ॥

লেখক তখন কলিকাতায় ছিল—জয়রামবাটী হইতে শ্রীমার এক পত্রে সে জানিতে পারে যে, তিনটি ছেলে তাঁহার নিকট গিয়া দীক্ষা ও সন্ন্যাস লইয়া তথা হইতে পদব্রজে কাশীযাত্রা করিয়াছেন। ইঁহারা মঠে আদৌ আসেন নাই—একেবারে শ্রীমার নিকট গিয়াছেন—অবশ্য পরে

---

৪ বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে যে, সরলা দেবী (পরবর্তী কালে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা) ছিলেন উদ্দিষ্ট সেবিকা।—সম্পাদক

মঠভুক্ত হইয়াছিলেন ; ইঁহাদের মধ্যে একজন লেখককে খুব ভালবাসিতেন। ইঁহার নাম স্বামী শান্তানন্দ (খগেন)।[৫]

॥ ২৮ ॥

স্বামীজীর সুবন্দোবস্তে শ্রীমার সংসারের ব্যয় নির্বাহার্থে মাসিক পঁচিশ টাকা মঠ হইতে আসিত। যোগীন মহারাজের ব্যবস্থায় গিরিশচন্দ্র এবং আরও দুই-একজন মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। পরে শরৎ মহারাজের বন্দোবস্তে মিসেস ওলি বুল মাসে মাসে সাহায্য করিতেন।[৬] এতদ্ব্যতীত শ্রীমা দেশে থাকিলে আমাদের জানিত নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে নিয়মিত টাকা পাঠাইতেন—

মাস্টারমহাশয়	... ...	১০ টাকা
ললিত ...	... ...	১০ টাকা
সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার এস. এন. ব্যানার্জীর মাতা	...	১০ টাকা
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	...	৫ টাকা

॥ ২৯ ॥

শ্রীমা কলিকাতার স্থানে স্থানে বেড়াইতে যাইতেন, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আদৌ চাহিতেন না—ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

॥ ৩০ ॥

পুরীতে পুরুষোত্তম দর্শনকালে শ্রীমা এক সন্তানের মস্তক রত্নবেদীতে স্পর্শ করাইয়া বলিয়াছিলেন : "গুরু ইষ্ট একত্রে দেখতে হয়—দেখ।"

---

৫ বাকি দুজন হলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ (জিতেন মহারাজ) এবং স্বামী গিরিজানন্দ (গিরিজা মহারাজ)। (দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৮৪, পৃঃ ৩৬২)—সম্পাদক

৬ মিসেস ওলি বুল যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন শ্রীমায়ের সেবায় প্রতি মাসে ষাট টাকা করে পাঠাতেন।—সম্পাদক

॥ ৩১ ॥

কলিকাতার নূতন বাটীতে শ্রীমার পায়খানা একদিন সেবককে পরিষ্কার করিতে দেখিয়া গোলাপ-মা নিজের মাথার চুল দিয়া প্যান সাফ করেন।

॥ ৩২ ॥

শ্রীমার কথিত ভাষা সাধারণতঃ দুই প্রকারের ছিল। আমাদের সহিত কলিকাতার ভাষায় এবং দেশের লোকের অথবা আত্মীয়-স্বজনের সহিত কথাকালে দেশের ভাষায় কথা কহিতেন। তবে তাঁহার দেশীয় ভাষা একেবারে শুদ্ধ ছিল না—কলিকাতার ভাষা মিশ্রিত ছিল।

॥ ৩৩ ॥

জনৈক সেবক কোন নির্জন স্থানে তপস্যা করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়া অনুমতি চাহিলে শ্রীমা বলেন ঃ "নাটু পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করত। ঠাকুর ঝাউতলায় যাবার সময় দেখে বলেছিলেন, 'ওরে, যার ধ্যান করছিস, সে তো বাসন মেজে আর হাঁড়ি ঠেলে মরছে।—তা খবর রাখিস ?' নাটু সেই থেকে নবতে আমার বাসন মেজে, বাটনা বেটে, ময়দা মেখে দিত। তা তোমার যখন যাবার ইচ্ছে হয়েছে, তখন এস,—বিষ্ণুপুরে গিয়ে লালবাঁধে থাকগে। সেখানে মৃন্ময়ীর পূজারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছেন—তাঁর কাছে আমার নাম কোরো—তিনি খুব যত্ন করে রাখবেন। তারপর আমি দেশে গেলে সেখানে যাবে।"

॥ ৩৪ ॥

ঐ মৃন্ময়ী দেবীর প্রকট হওয়া সম্বন্ধে শ্রীমার নিকট একদা যাহা শুনিয়াছি তাহা দিতেছি—"পূজারী ব্রাহ্মণের অবস্থা বড় খারাপ ছিল। একদিন মৃন্ময়ী স্বপ্ন দেন, 'আমি লালবাঁধের জলে রয়েছি—তুই তুলে নিয়ে আমার সেবা কর।' ব্রাহ্মণ গিয়ে দেখে, অর্ধেক জলে দেবী রয়েছেন। তখন তাঁকে তুলে নিয়ে লালবাঁধের ঘাটে প্রতিষ্ঠা করে পূজো করতে শুরু করলে। মায়ের কৃপায় এখন ব্রাহ্মণের অবস্থা ভালই হয়েছে, বলতে হবে।"

॥ ৩৫ ॥

ঠাকুর-পূজা সমাপনান্তে শ্রীমা নিজ মনে অল্পক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পার্শ্বস্থিত নবীন ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "তুমি ঠাকুরকে দেখেছ ?—শ্যামপুকুরে ?" ব্রহ্মচারী বলিলেন : "তখন আমার বয়স পাঁচ বৎসর—পাড়ার মেয়েরা সব দেখতে গিয়েছিল; সেইসঙ্গে আমার জননী আমায় কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন—আপনি কি করে জানলেন ?"

শ্রীমা—"তোমায় নাড়ু দিতে ঠাকুর শিকের দিকে ইশারা করেছিলেন ? কে দিলে, মনে পড়ে কি ?"

ব্রহ্মচারী—"হ্যাঁ, একটি স্ত্রীলোক এনে দিয়েছিলেন।"

শ্রীমা—"সে আমি।"

"আপনি !"—ব্রহ্মচারী স্তম্ভিত।

শ্রীমা—"আর একবার তাঁকে দেখেছিলে ?"

"হ্যাঁ; সে তো ঠাকুরের দেহত্যাগের অনেক পরে—পুরীতে—শ্রীমন্দিরে।"

শ্রীমা—"আর তুমি হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডেকেছিলে ?"

"সে তো তিনি ডেকেছিলেন, তাই আমিও ডেকেছিলেম।"

শ্রীমা—"মন্দিরে হৈ চৈ পড়ে গেল—ছেলের দর্শন হয়েছে বলে।"

"আপনি কি করে এ ব জানলেন ?"

শ্রীমা—"আমি ছিলুম।"

ব্রহ্মচারী আত্মহারা হইয়া মাতৃচরণে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলে, সে অবকাশ না দিয়া শ্রীমা তাঁহাকে দীক্ষা দেন এবং তৎপরে তাঁহার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করেন।

॥ ৩৬ ॥

কয়েক বৎসর পরে আমরা ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে, তিনি দীক্ষার্থীকে দেখিয়া তাহার অতীত জীবন ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার পক্ষে কল্যাণকর ইষ্টমন্ত্র দেখিতে পাইয়া থাকেন।

॥ ৩৭ ॥

পূর্বরাত্রে শ্রীমা 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের বন্দোবস্তে তাঁহার বসিবার জন্য রয়্যাল বক্স ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বহুদিন পরে মাত্র সেই রাত্রের জন্য 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছে। 'জগাই'—অর্ধেন্দুশেখর এবং 'মাধাই'—গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও ভূষণ শ্রীমার জন্য বিনা বেতনে 'নিমাই'রূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন আর 'নিতাই'রূপে—সুশীলা। অভিনয়ের পূর্বে ঐ দুইটি অভিনেত্রী শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া যান। ঐ বিষয় আলোচনা করিতে করিতে শ্রীমা বলিতেছেন ঃ "মেয়েটিকে (ভূষণকে) দেখলুম, ভক্তিমতী—ভক্তি না থাকলে কি হয় গা ? নিমাই—তা ঠিক নিমাই—কে বলবে, মেয়েমানুষ ?" আবার জগাই-মাধায়ের বিষয় বলিতেছেন ঃ "ওদের মতো ভক্ত কে ? রাবণের মতো ভক্ত কে ? হিরণ্যকশিপুর মতো ভক্ত কে ? এই যে গিরিশবাবু ঠাকুরকে কত গালি দিতেন; তা ওঁর মতো ভক্ত কে ? এঁরা সব ঐ ভাবে এসেছেন। ভক্ত হওয়া কি কম কথা ? ভক্তি কি এমনিই হয় ?" আবার লক্ষ্মী-দিদির দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন ঃ "হ্যাঁ লক্ষ্মী, সেটা কি ?—মুক্তি দিতে কাতর নই—?" লক্ষ্মী-দিদি সুর করিয়া বলিলেন ঃ

"(আমি) মুক্তি দিতে কাতর নই গো,
ভক্তি দিতে কাতর হই।"

॥ ৩৮ ॥

শ্রীমাকে লাল বা কাল নরুনপেড়ে কাপড় পরিতে আমরা বরাবর দেখিয়াছি। অধিকাংশ ভক্ত লাল নরুনপাড় কাপড় দিতেন। কেহ কেহ বা কাল দিতেন। তাঁহারা হাতে দুইগাছি হোগলাপাকের বালা এবং গলায় একছড়া সোনার তারে গাঁথা ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা থাকিত। মালাটিতে ১০৮টি ছোট রুদ্রাক্ষের দানা থাকিত। উহা নাকি যোগেন মহারাজের সময় [করানো] হইয়াছিল। আমাদের সময় ঐ রুদ্রাক্ষগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় একস্থানে ছিঁড়িয়া যায়। নূতন রুদ্রাক্ষের

দানা সোনার নূতন তারে গাঁথাইয়া দেওয়া হয়। শ্রীচরণের মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়ে বাতের জন্য লোহার তারের আংটা থাকিত।

॥ ৩৯ ॥

শ্রীমা বাতের জন্য প্রত্যহ স্নান না-করিয়া একদিন অন্তর করিতেন—কলিকাতায় থাকিলে গঙ্গাস্নান এবং দেশে থাকিলে বড় পুকুরে। শ্রীমার আহারকালে আমাদের কেহ উপস্থিত হইলে, সে-সময় তিনি যাহা খাইতেছেন, তাহার প্রসাদ দিতেন। পান খাইতে থাকিলে সে-প্রসাদ দিতেন না—হয় স্বয়ং একটা পান আনিয়া দিতেন অথবা কাহারও দ্বারা আনাইয়া স্বয়ং হাতে করিয়া দিতেন।

॥ ৪০ ॥

হরির মা নামে পাড়ার এক প্রৌঢ়া বিধবা শ্রীমার নিকট প্রত্যহ আসিতেন। একদিন অপরাহ্ণে তিনি নিজের সাংসারিক মনোমালিন্যের বিষয় শ্রীমাকে জ্ঞাপন করিয়া অন্যান্য কথার সঙ্গে বলেন: "কি করব মা? এ তো ছাড়া যায় না। এই দেখুন না, আপনি কি রাধুকে ছাড়তে পারেন, না, ছেড়ে থাকতে পারেন?"

শ্রীমা এক অপূর্ব হাসি হাসিয়া উত্তর করেন: "আমার কথা ছেড়ে দাও, হরির মা।" শ্রীমার ঐ হাসি এবং ঐ উক্তি আমাদের হৃদয়ে এক অভিনব রেখাপাত করায়, সে-সময় কিছু না-বলিয়া তাঁহার রাত্রিকালীন আহারের পর ঐ বিষয় উল্লেখ করিয়া ধরায়, তিনি অপেক্ষা করিতে বলিয়া কলঘরে প্রবেশ করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া হাত পা মুছিয়া শয্যার উপর বসিয়া বলিতে থাকেন: "ওরা কি বুঝবে? দেখনা—আমায় বলে, রাধির ওপর টান! যাদের ঘরে জন্ম নিইছি, তাদের দেখতে হয়। তাই তো মা বল, বাপ বল, ভাই বল, ভাইপো-ভাইঝি বল, করতে হয়। ঋণ তো কারুর রাখতে নেই। তা না হলে রাধি-টাধি আমার কে? ঠাকুর যে তাঁর মার সেবা কত করেছেন—রামলালকে কালীঘরে ঢুকিয়েছেন।" ঐ উক্তিতে নূতন

আলোকসম্পাত হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম ঃ "তবে আপনার আপনার জন কে ?" উত্তর পাইলাম ঃ "কথামৃতে 'সাঙ্গোপাঙ্গ' পড়েছ তো ? ঠাকুরেরই বল আর আমারই বল, ছেলেমেয়েরাই হচ্ছে আপনার জন।" জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "তাই কি, মা ?" বলিলেন ঃ "কেন ? —বুঝতে পাচ্ছ না ? ওখানে (লেখকের অন্তর দেখাইয়া) কি ?" বলিলাম ঃ "আপনি।" বলিলেন ঃ "এখানেও (নিজ অন্তর দেখাইয়া) তোমরা—এতে মায়া নেই; এ বড় টান। এ টানে বার বার আসতে যেতে হয়। বুঝছ তো ?"—"হ্যাঁ, মা।"—"যাও, এখন শোওগে। লিখবে তো ?"—"এখনই গিয়ে লিখব।" শ্রীমা—"দেখতে পাবে—জগতে আর কেউ তোমার আপনার নয়; তখন ঠিক ঠিক বুঝবে, এ কি টান !"

॥ ৪১ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের যেকোন ভাগ বা সংস্করণ বাহির হইলে মাস্টার মহাশয় আসিয়া প্রথম পুস্তকখানি শ্রীমাকে দিয়া যাইতেন এবং শ্রীমাও প্রতিদিন অপরাহ্নে কোন না কোন স্ত্রীভক্ত দ্বারা পড়াইয়া শুনিতেন—যতদিন না পুস্তকখানি পড়া শেষ হয়। প্রতিমাসে 'উদ্বোধন' পাইয়াও তাহাই করিতেন।

॥ ৪২ ॥

একবার একটি হাস্যজনক ঘটনা ঘটে। শ্রীমার ফটো (১৫"× ১২") সাহেব-বাটী হইতে তৈয়ার হইয়া আসিলে, কেমন হইয়াছে দেখিবার জন্য একখানি তাঁহাকে দিলে, তিনি দুই হাত বাড়াইয়া উহা লইয়া নিজ মস্তকে ঠেকাইয়া দেখিতে থাকেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করি। পরে উহা প্রত্যর্পিত হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি ঃ "ছবিখানি কার, মা ?" তিনি সরলা বালিকার ন্যায় উত্তর করেন ঃ "কেন—আমার।" ঐ উত্তরে হাসিয়া ফেলি। জিজ্ঞাসা করেন ঃ "হাসছ কেন ?" উত্তরে বলি ঃ "তবে আপনি মাথায় ঠেকালেন কেন ?" তিনিও সেই হাস্যে যোগদান করিয়া অবশেষে বলেন ঃ "এরও ভেতর তো ঠাকুর আছেন।"

॥ ৪৩ ॥

শ্রীমার এক প্রাচীন সন্তান চিরকৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া গৃহে থাকিতেন এবং কলিকাতার এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। যে-সময়ের ঘটনা বর্ণনা করিতেছি, তখন শ্রীমা জয়রামবাটীতে এবং মঠ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাতীরস্থ বেলুড়ের উদ্যানবাটীতে। একদিন সায়াহ্নে ঐ সন্তানটি মঠে আসিয়া স্বীয় গুরুভ্রাতাগণকে একত্রিত করিয়া বলেন যে, তিনি সাময়িক উত্তেজনাবশে এক অতি কদর্য কার্য করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা তাঁহার বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়গণ এবং দুই-একটি ছাত্রের অভিভাবকগণের গোচরীভূত হইয়াছে এবং পরদিন সে-বিষয়ের বিচার হইবে। অতএব, এক্ষণে তাঁহার কর্তব্য কি, সে-বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জানিতে চাহেন। তাঁহারা একমত হইয়া তাঁহাকে কৃতাপরাধের জন্য যেকোন বিপদের সম্মুখীন হইতে নিজেকে প্রস্তুত থাকিতে এবং ফলাফল কামনা না-করিয়া শ্রীমার উদ্দেশে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতে এবং যাত্রাকালে শ্রীমার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া যাইতে পরামর্শ দেন। পরদিন যথাবিহিত কার্য করিয়া তিনি কর্তৃপক্ষীয়গণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অপরাধ অকপট হৃদয়ে ব্যক্ত করেন এবং সর্বপ্রকার দণ্ড মস্তক পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হন। ফলে কিন্তু কর্তৃপক্ষীয়েরা কেবলমাত্র ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া ছাড়িয়া দেন। বিপন্মুক্তির পর মঠে আসিয়া তিনি ভ্রাতৃগণকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া যান।

॥ ৪৪ ॥

সময় সময় শ্রীমাকে ভক্তদের দাম্পত্যকলহেরও মীমাংসায় লিপ্ত হইতে হইত। একটি পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শ্রীঠাকুরের অতি প্রাচীন ভক্তমধ্যে পরিগণিত এবং তাঁহাদের কলহে শ্রীঠাকুরকে নাকি মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। তাঁহার তিরোভাবের পর শ্রীমার উপর ঐ ভার আসিয়া পড়ে। আমরা শ্রীমাকে ঐ কার্য করিতে কয়েকবার দেখিলেও, এখানে মাত্র সর্বশেষ ঘটনাটি উল্লেখ করিতেছি। একদিন

প্রাতঃকালে স্ত্রীভক্তটি শ্রীমার নিকট আসিয়া থাকিয়া যান। শ্রীমা আমাদিগকে বলিয়া রাখেন, পুরুষভক্তটি আসিলে তিনি যেন সংবাদ পান। ঐভাবে তিন-চার দিন অতিবাহিত হয়, পুরুষভক্তটি আসিলেন না; তবে তাঁহাদের দ্বিতীয় পুত্রটি একবার লইতে আসিলে শ্রীমা তাহার পিতাকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া দেন আর তাহার মাতাকে তাহার সঙ্গে পাঠাইলেন না। অবশেষে একদিন পুরুষভক্তটি সন্ধ্যার পর আসিলে শ্রীমা [তাঁহাকে] উপরে ডাকিয়া পাঠান এবং আমাদের দ্বারা বলান : "এখনো কি বুড়ো বয়সে ওসব ভাল দেখায় ?—(জ্যেষ্ঠ পুত্র) তিনটে পাস করেছে—আজ বাদে কাল বে হবে—বউ এসে ঐসব দেখে তো শিখবে ! আমি বলে দিচ্ছি, আর যেন ওরকম না হয়। হবে না তো ?" তিনি স্বীকার করিলেন যে, আর হইবে না। শ্রীমা পুনরায় বলিয়া দেন : "ও ঘরের লক্ষ্মী—ওকে কোনরকম মনঃকষ্ট দিতে নেই। ও কি নিজের জন্যে কিছু করে ? তবে ওর হাতটা একটু দরাজ। তাতে হলো কি ? ভক্তের সংসার। ওকে ভাল করে যেন রাখা হয়।" সেই দিন উভয়ে চলিয়া যান। আর কখনও তাঁহাদের কলহ আমরা দেখি নাই।

॥ ৪৫ ॥

চাদর মুড়ি দিয়া শ্রীমা দাঁড়াইয়া গৃহী-ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করিতেছেন। ভক্তেরা একে একে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু একজন প্রণাম করিলেন না—আসিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে কয়েকবার বলা সত্ত্বেও তিনি প্রণাম করিলেন না, উত্তরও দিলেন না; চুপ করিয়া পূর্ববৎ বসিয়া রহিলেন। তিনি কি চাহেন জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাইলাম না। তখন তাঁহাকে বলা হইল— শ্রীমার চাদর মুড়ি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট হইতেছে—এপ্রকার কষ্ট দেওয়া তাঁহার উচিত নহে। তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন : "হ ! বেটী পাষাণী !" কিন্তু উঠিলেন না। শ্রীমা জিজ্ঞাসা করাইলেন, মন্ত্র লইবেন কি ? তিনি উত্তর করিলেন : "হ, অখন হুশ হইচে !" শ্রীমা

তাঁহাকে ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলাইলে, তিনি তাহাই করেন। ইত্যবসরে শ্রীমা চাদর খুলিয়া নিজ আসনে গিয়া বসিলেন এবং ভক্তটিকে ডাকাইয়া দীক্ষিত করেন। সেদিন প্রসাদ পাইতেও বলান। দীক্ষান্তে ভক্তটি নিচে আসিয়া নিজ মনে বসিয়া থাকেন—কাহারও সহিত কোন কথা কহেন না। অবশেষে নীরবে প্রসাদ পাইয়া চলিয়া যান। বহুদিন পরে একবার তিনি আসেন। সেদিন তাঁহাকে খুব প্রফুল্ল দেখি। সকাল হইতে বৈকাল পর্যন্ত থাকেন—সকলের সঙ্গে আনন্দিতচিত্তে মেলামেশা করেন।

॥ ৪৬ ॥

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটিতে অর্থের উপর শ্রীমার আসক্তি কি অনাসক্তি ছিল, বুঝা যাইবে। এই প্রকারের দৃষ্টান্ত আমরা বহুবার পাইলেও এখানে একটি মাত্র দিলাম।

জয়রামবাটী যাইবার উদ্যোগকালে একবার সেখানে একটি অতি দরিদ্র স্ত্রীলোককে দিবার জন্য একখানি গায়ের কাপড় কিনিতে [শ্রীমা] আমাদের হাতে একখানি দশ টাকার নোট দেন। আমরা আড়াই টাকায় উহা কিনিয়া বাকি সাড়ে সাত টাকা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে গেলে তিনি উহা লইতে স্বীকৃত না হইয়া বলেন যে, তিনি দশ টাকার নোট দেন নাই, মাত্র পাঁচ টাকার নোট দিয়াছেন; অতএব এত ফিরত কেন লইবেন? আমাদের বার বার দশ টাকা দিবার কথা বলাতেও কোন ফল না হওয়ায় অগত্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি: "আপনার প্যাঁটরায় কয়খানা দশ টাকার নোট এবং কয়খানা পাঁচ টাকার নোট ছিল, মনে আছে তো?" তিনি বলেন: "না।" "সর্বশুদ্ধ কত টাকা ছিল, তা-ও কি মনে আছে?" বলিলেন: "না।" "তবে বুঝে দেখুন, বেশি কেন দিতে যাব? আর বেশি পাবই বা কোথা? যদিও বা কারও কাছে পেতাম, তাহলে তা-ই বলে আপনাকে দিতাম। এভাবে কেন দেব?" এত বলায় তবে তিনি বাকি টাকা ফিরত লন।

॥ ৪৭ ॥

সন্তানের কঠিন রোগমুক্তি-কামনায় শিরোমণিপুর হইতে জনৈকা

স্ত্রীলোক শ্রীমার পাদোদক লইতে জয়রামবাটীতে আসিয়াছে—ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথের নিকট জানিতে পারিয়া ভিতরে গিয়া দেখি, স্ত্রীলোকটি একটি পাত্রে জল আনিয়াছে এবং শ্রীমা নিজ দক্ষিণ-চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি উহাতে ডুবাইবার উপক্রম করিতেছেন। তাড়াতাড়ি তাঁহার চরণ ধরিয়া বাধা দিয়া স্ত্রীলোকটিকে বলি ঃ "তুমি বাছা, তোমার ছেলের চিকিৎসা করাও গিয়ে বা আর কিছু করাও গিয়ে—মার পা-ধোয়া জল পাবে না।" নিকটে ভব ছিলেন। তিনিও সায় দিয়া শ্রীমাকে বলিলেন ঃ "না, মা, দিও না। একে বাতে ভুগছ, আবার কি অসুখ করবে। কর্তাভজারা ঐরকম পায়ের বুড়োআঙ্গুল চোষে।" শ্রীমা নিরস্ত হইয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন ঃ "তুই মা, চুপি চুপি কেন এলি না ? তাহলে তো পেতিস। এখন ছেলেরা জানতে পেরেছে; ওদের অমতে তো কিছু করতে পারিনে। গাঁয়ে তো অনেক বামুন আছে, যার কাছ থেকে হোক, নিয়ে যা—আমি বলছি, তোর ছেলে সেরে উঠবে।"

॥ ৪৮ ॥

আর একবার বিষ্ণুপুরে পোকাবাঁধের চটিতে সর্বাঙ্গ ধবল হইয়া গিয়াছে, এখন একটি লোক মাটি হাতে আসে—শ্রীমার চরণরজঃ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে। উহাকে নিরস্ত করিলে শ্রীমা বলিয়া দেন ঃ "ছেলে দিতে দেবে না, বাবা, কি করব বল ? তুমি যাও, মৃন্ময়ীর মাড়োয় হত্যে দাওগে—অসুখ সেরে যাবে।"

॥ ৪৯ ॥

জয়রামবাটীতে মামাদের একটি 'বাগাল'[৭] ছিল। কখনও কখনও সে সন্ধ্যার পর হাতে একগাছি পাচনবাড়ি লইয়া নিজ পিঠে মারিতে মারিতে নৃত্য করিত। হাফু খেলিত। আর মুখে সুর করিয়া 'মা গো

---

৭ রাখাল—গ্রামাঞ্চলে যারা গৃহপালিত গবাদি পশুর দেখাশুনা করে।—সম্পাদক

মা, বিয়া দিলি না' ইত্যাদি বলিয়া ছড়া কাটিত। শ্রীমা তাহাকে একদিন ঐরূপ করিতে দেখিয়া বলেন ঃ "এখন 'বিয়া দিলি না, বিয়া দিলি না' বলছিস—বিয়ার কি স্বাদ তা পরে বুঝবি।" আমাদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করেন ঃ "ঠাকুরের সেকথা মনে আছে তো?" বলি ঃ "হ্যাঁ, মা। ঠাকুরের দাদা তাঁর স্ত্রীর গায়ের জোরে পারেন, কিন্তু স্ত্রী তাঁর কোঁচা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন আর তিনি কেঁচোর মতো চলেছেন।" শ্রীমা বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, সেইরকম হবে।"

॥ ৫০ ॥

দীক্ষান্তে শ্রীমা কোন কোন সন্তানকে রুদ্রাক্ষের মালা আনিতে বলিতেন। ঐ মালা সন্তানরা দুই প্রকারে ব্যবহার করিতেন। কেহ ১০৮টি দানার আর কেহ বা ৫৪টি দানার গাঁথাইয়া লইতেন। মালা শ্রীমার নিকট আনিয়া দিলে তিনি উহাকে গঙ্গাজলে স্নান এবং চন্দনসিক্ত করিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে স্পর্শ করাইয়া নিজে জপ করিয়া দিতেন। জপ-ধ্যান করিতে বলিলে কোন সন্তান কোন কারণে নিজ অপারগতা দেখাইলে তিনি সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ-মনন করিতে বলিতেন। উহাতেও অপারগ হইলে দিনান্তে একবার মাত্র স্মরণ করিলে হইবে বলিয়া দিতেন। ইহা পাত্রবিশেষের জন্য—সাধারণ নিয়ম নহে।

॥ ৫১ ॥

(বুড়ো)গোপাল-দাদার দেহত্যাগের রাত্রে শ্রীমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়। জিজ্ঞাসা করি ঃ "স্বামীজী বলতেন, 'অবতার কপালমোচন'—একভাবে কপাল চলছে, অবতার একবার হাত বুলিয়ে অন্যদিকে চালাতে পারেন। আপনারা কি সত্যই এরকম করতে পারেন? আর করেও কি থাকেন?" স্তোকবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে অবশেষে ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলেন ঃ "ঠাকুর ভাঙ্গতে আসেন না। লোকে বুজরুকি দেখতে ভালবাসে—দেখেও তাই।

জগাই-মাধায়ের মতো ভক্ত কে ? গিরিশবাবুর মতো ভক্ত কে ? এঁরা যে ঐভাবেই আসবেন। দেখনি—আলোর চারিদিকে পোকাগুলো রকমারি করে উড়ে উড়ে শেষে আলোয় মিশে যায়।"—"তাহলে আপনি কি বলতে চান যে, এঁরা বরাবর অবতারের সঙ্গে আসেন আর থিয়েটারের মতো যে-যাঁর পাট অভিনয় করে চলে যান ?"—"হ্যাঁগো, হ্যাঁ।"—"তাহলে আমাদের মতো লোকের কি দশা ?"—"ঠাকুরের কথা পড়নি—বুড়ি ছুঁলেই হলো। হাস, খেল, নাচ, কোঁদ আর যা-ই কর—বুড়ি ছুঁয়েছ—টিকি বাঁধা আছে—যাবার যো কি ?"—"তাহলে আমাদেরও ভাবনা নেই ?"—"না, বাবা, না। তোমাদের আবার ভাবনা কি ? ঠাকুর যে ভার নিয়েছেন—একি যে-সে ধরেছে ?"—"তা আপনিই জানেন, মা।"—"দেখে নিও।"

॥ ৫২ ॥

মহাষ্টমীর প্রত্যুষ হইতে শ্রীমার বিরাম নাই। দলে দলে স্ত্রী ও পুরুষ-ভক্ত, কেহ প্রণাম, কেহ বা পূজা করিয়া যাইতেছেন—শ্রীমা দাঁড়াইয়া আছেন। এই প্রকারে বেলা নয়টা বাজিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ "আর এখন আসতে দিও না—নিচে বসাও গে। আমি পূজো সেরে নিই।" এই বলিয়া তিনি কলঘরে প্রবেশ করিলেন। নিচে আসিয়া দেখি একজন মাত্র মাতৃসন্তান কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র) ফুল হাতে অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীমা কলঘর হইতে বাহির হইলে তাঁহাকে কালিপদর বিষয় বলায় তিনি বলিলেন ঃ "সে একা আছে তো ?—তাকে টপ করে সেরে যেতে বল।" কালিপদর হাতে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পদ্ম ও রক্তজবা দেখিয়া শ্রীমা আনন্দিতচিত্তে দুই হাত বাড়াইয়া বলিলেন ঃ "বাঃ ! বাঃ !—বেশ ফুল তো !—কিছু আমায় দাও—ঠাকুরকে দিই—আজ মহাষ্টমী।" কালিপদ সমস্তই দিলে, তিনি হাসিয়া বলিলেন ঃ "না, না, সব দিতে হবে না। তুমি তো আবার পূজো করবে।" ইহা কহিয়া কয়েকটি ফুল লইয়া ঠাকুরপূজার পুষ্পপাত্রে

রাখিলেন—নিজে পূজা করিবেন বলিয়া। অবশিষ্টগুলি দিয়া কালিপদ শ্রীমার পূজা করিলেন। শ্রীমা বলিলেন ঃ "নিচে বসগে, পুজো সেরে প্রসাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

॥ ৫৩ ॥

মঠ হইতে (বুড়ো)গোপাল-দাদা একদিন শ্রীমাকে প্রণাম করিবার পর প্রসাদ পাইতে পাইতে তাঁহার পায়ের বাতটা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমা বলিলেন ঃ "ও আর এই কাঠামোয় সারবে না—সঙ্গের সাথী হয়ে আছে। তা তুমি কেমন আছ ?" গোপাল-দাদা বলিলেন ঃ "আমাকেও বাতে বেশ কষ্ট দেয়, তবু তো অনেক খাটি। ছেলেরা কেউ দেখে না। তবু মঠের জমিতে যা হয়, দুটো তরি-তরকারি করেছি—ঢেঁড়স, বেগুন, কাঁচকলা হচ্ছে—তরকারি আর বড় কিনতে হয় না। তোমার এখানে তো মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিয়ে থাকি।" শ্রীমা বলিলেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, তুমি সেকেলে লোক—তুমি তো আর ছেলেদের মতো থাকতে পারবে না। মঠও তো একটা সংসার—খাওয়া-দাওয়া তো আছে—তুমি থাকতে পারবে কেন ?—তাই দেখে থাক।"

॥ ৫৪ ॥

শ্রীমা ক্ষীরকমলা খাইতে ভালবাসেন বলিয়া যোগীন-মা কখনও কখনও উহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া আনিতেন। একবার ঐ-প্রকার আনিলে, শ্রীমা আমাদের দিতে আসেন। আমরা বলি ঃ "মা, আপনি ভালবাসেন বলে যোগীন-মা আপনাকে দিয়েছেন—আপনি খান।" তিনি স্নেহভরে উত্তর করিলেন ঃ "আমি ভালবাসি বলেই তো তোমাদের দিচ্ছি। তোমাদের না-দিয়ে কি আমি খেতে পারি ?" তথাপি আমরা জিদ করায় তিনিও খাইলেন, আমাদেরও দিলেন।

॥ ৫৫ ॥

ভগিনী নিবেদিতা এবং ভগিনী ক্রিস্টিন (মার্কিন মহিলা—

নিবেদিতার সহকর্মিণী) অধিকাংশ দিনই সন্ধ্যার পর শ্রীমার নিকট আসিতেন। নিবেদিতা কাজ চালাইবার উপযুক্ত বাঙলায় কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। কিন্তু ক্রিস্টিন দুই-চারিটি কথা মাত্র শিখিয়াছিলেন, তবে কিছু কিছু বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ক্রিস্টিন একাকিনী আসিলে আমাদিগকে দ্বিভাষীর কার্য করিতে হইত। একদিন উভয়ে একত্র আসিয়াছেন। উপরে গিয়া নিবেদিতাকে বলিতে শুনিলাম ঃ "এ, মাতৃদেবি, আ-প-নি হ-ন আ-মা-ডি-গে-র কালী।" ক্রিস্টিন নিবেদিতার কথাটি বুঝিয়া বলিলেন ঃ "O ! Holy Mother is our Kali—yes." শ্রীমা হাসিয়া বলিলেন ঃ "না বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারব না। জিভ বার করেই থাকতে হবে তাহলে।" শ্রীমার উত্তর না-বুঝিতে পারিয়া উভয়ে আমাদের দিকে তাকাইলে বুঝাইয়া দিলাম। তখন উভয়ে বলিলেন ঃ "We shall look upon Her as our Kali; for Sri Ramakrishna is our Shiva." (মাকে এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না—আমরাই উঁহাকে কালীরূপে দেখিব, কেননা, শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিব।) শ্রীমাকে একথা বলিলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন ঃ "তা নাহয় দেখা যাবে !" উঁহাদিগকে বুঝাইলে উঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "She admits ?" (উনি স্বীকৃতা ?) বলিলাম ঃ "হ্যাঁ, এইপ্রকারে।" তখন তাঁহারা "Then let us take the dust of Your Holy Feet" (তাহলে আমরা আপনার শ্রীচরণের ধূলি লই) বলিয়া তাহাই করিয়া চলিয়া যান।

॥ ৫৬ ॥

অন্নপূর্ণার মা একটি যুবতীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীমার নিকট আসিয়াছেন। যুবতীটিকে দেখাইয়া অভিযোগ করিলেন যে, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে লন না—সাধু হইবার ভয় দেখান। অতএব শ্রীমা যেন তাঁহাকে বুঝাইয়া গৃহবাসী করেন। উত্তরে শ্রীমা বলিলেন ঃ "তার যদি সত্যি সত্যি বৈরাগ্য হয়ে থাকে তো আমি কি করে ও কথা বলব ?" অন্নপূর্ণার মা জিদ করিতে থাকিলেন এবং সেই সুযোগে যুবতীটি

শ্রীমার চরণদ্বয় ধরিয়া কাকুতি মিনতি করিতে থাকিলেন। শ্রীমা হাসিয়া অগত্যা বলিলেন ঃ "আচ্ছা, সে এলে তাকে দেখব। তবে বৈরাগ্য হলে বলতে পারব না বাপু।"

॥ ৫৭ ॥

প্রথিতযশা অভিনেত্রী তিনকড়ি শ্রীমার নিকট আসিয়াছেন। তাঁহাকে গান গাহিবার জন্য লক্ষ্মী-দিদি অনুরোধ করিলে তিনি ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছেন ঃ "আপনাদের কাছে আমি কি গাইতে পারি ?" কিন্তু পরে শ্রীমা "তাতে কি, গাওনা ! তোমার সেই পাগলীর গানটা গাও" বলায় তিনি গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এসব আমরা পরে শুনিলেও কিছুই তখন জানিতে পারি নাই। আমরা তখন নিচে যে-যার কার্যে ব্যস্ত ছিলাম। তখন বেলা সাড়ে নয়টা। অকস্মাৎ সারঙ্গী যে-প্রকার সুদক্ষ হস্তে ছড়ি সংযোজিত হইয়া অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী সুর উদ্গীরণ করে, সেইপ্রকার তিনকড়ির কোমল কণ্ঠ হইতে 'ছায়ানটে' 'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে' নিঃসৃত হইতে আমরা আকৃষ্ট হইয়া যে-যার কার্য ত্যাগ করিয়া উপরে গেলাম—শরৎ মহারাজ বসিয়া কি একটা লিখিতেছিলেন, লেখনী ত্যাগ করিয়া গম্ভীরাকার ধারণ করিলেন; যোগীন-মা কুটনা কুটিতেছিলেন, ফেলিয়া উপরে উপস্থিত হইলেন; পাচক রান্নার কড়া নামাইয়া এবং ভৃত্য বাটনার শিল ছাড়িয়া উপরে হাজির ! গিয়া দেখিলাম, শ্রীমার পূজা হইয়া গিয়াছে—ঠাকুরঘরে পা ছড়াইয়া বসিয়া গান শুনিতেছেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে থাকিলাম। গায়িকা ঠাকুরঘরের বাহিরের ক্ষুদ্র বারান্দাটিতে[৮] বসিয়া অট্টালিকাখানি ভক্তিরসে ভাসাইয়া তান ধরিয়াছেন—

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
আমি যেখানে যাই, সে যায় পাছে, বলতে হয় না জোর করে॥"

---

৮ তখন শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের বারান্দাটি ছোট—এক ফালি ছিল, পরবর্তী কালে বাড়িয়ে বর্তমান আয়তনে আনা হয়েছে।—সম্পাদক

শ্রীমা একবার ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া চক্ষু বুজিলেন। কিছুক্ষণ বাদে চক্ষু চাহিলেন বটে, কিন্তু সে-দৃষ্টি আদৌ বাহ্যদৃষ্টি নহে বলিয়া আমাদের ধারণা হইল; চক্ষু উন্মুক্ত, কিন্তু কিছুই দেখিতেছেন না। ওদিকে গায়িকা গাহিতেছেন—

"মুখখানি সে যতনে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়।
আমি হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে, কতই রাখে আদরে ॥"

গোটা বাড়িটি নিস্তব্ধ, যেন বাড়িতে কেহ নাই; সকলে মুগ্ধ ও বিভোর—এ কি গায়িকার গানের প্রভাবে অথবা শ্রীমার শক্তিতে—কে বুঝিবে?

পরে যখন গাহিতেছেন—

"আমি জানতে এলেম তাই, কে বলে রে আপন রতন নাই?
সত্যি মিছে দেখনা এসে—কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে ॥"

শ্রীমা ভাবাবস্থায় বলিতেছেন: "আহা! আহা!"

গান সমাপ্ত হইলে শ্রীমা কিছুক্ষণ যাবৎ সেইভাবে বসিয়া রহিলেন—সাড়া নাই, শব্দ নাই। কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকিবার পর অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া গায়িকাকে বলিলেন: "আজ কি গানই শোনালি, মা!"

॥ ৫৮ ॥

আর একবার শারদীয়া পূজার পূর্ব হইতে জয়রামবাটীতে আছি। দেবীপক্ষে জনৈক ভিখারি আসিয়া শ্রীমার বাটীর খিড়কিদ্বারে 'আগমনী' গাহিতেছে। গান শুনিয়া গিয়া দেখি, শ্রীমা দ্বারের ভিতরে বসিয়া গান শুনিতেছেন। গায়ক গাহিল—

"যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা বড় দুঃখে রয়েছে।
দেখেছি স্বপনে, নারদ-বচনে, উমা 'মা, মা' বলে কেঁদেছে ॥
ভাঙ্গড় ভিখারি জামাতা তোমার, সোনার ভ্রমরী গৌরী আমার।
উমার যত বসন ভূষণ, বেটা তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে ॥"

গান হইয়া গেল। শ্রীমা চুপ করিয়া একভাবে বসিয়া আছেন। ভিক্ষুক ভিক্ষা চাহিল—শ্রীমার উত্তর নাই। চারিটি পয়সা দিয়া

ভিক্ষুককে বিদায় করিলাম। প্রায় দশ মিনিট অতীত হইল—শ্রীমা একভাবে বসিয়া। তখন তাঁহাকে ঘরে যাইতে বলিলাম। প্রথমবার উত্তর পাইলাম না। দ্বিতীয়বার বলায় বলিলেন ঃ "চল, যাচ্ছি। ভাল লাগে না।" অপেক্ষা করিলাম—যতক্ষণ না উঠেন। অগত্যা উঠিয়া ঘরের মেজেয় গিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভাব দেখিতে থাকিলাম। খানিক পরে নিজে নিজে বলিতে থাকিলেন ঃ "আর কদ্দিন ?—অনেককাল হয়ে গেছে যে!" ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া তেল মাখিতে লাগিলেন দেখিয়া চলিয়া আসিলাম।

॥ ৫৯ ॥

শ্রীমা ক্ষীণ শরীরে অতিমাত্রায় পরিশ্রম করিয়াও সন্তানদিগকে খাওয়াইতে যে বড় ভালবাসিতেন, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি—

পৌষমাসে একবার জয়রামবাটীতে থাকি। সংক্রান্তির পূর্বদিন বৈকালে উপেন্দ্রনাথ মাইতি আসিয়াছেন। সংক্রান্তির প্রাতে ফুল লইয়া আসিয়া দেখি, শ্রীমা ঢেঁকিশালে বসিয়া চাউল কুটাইতেছেন—নিজে গড়ে চাউল দিতেছেন আর কুটা হইয়া গেলে তুলিয়া লইতেছেন। ঐরূপ করায় তাঁহার হাতে মুষল পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হওয়ায় বলিলাম ঃ "আপনি কেন মা, করছেন ? মুষলটা যে হাতে পড়ে যেতে পারে।" শ্রীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন ঃ "তুমি থাম। আমার সব অভ্যেস আছে।" নিরস্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম। খানিক পরে দেখি, ধুচুনিতে ডাল লইয়া কলুপুকুরে (খিড়কিপুকুরে) কচলাইয়া ধুইয়া খোসা তুলিতেছেন। ফিরিয়া আসিয়া নলিনী ও ছোটমামীকে বাটিতে দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "কি হবে, মা ?" বলিলেন ঃ "দেখতে পাবে।" স্নান ও পূজা শেষ করিয়া রান্নাঘরে গিয়া কোমর বাঁধিয়া পিঠা গড়িতে ও ভাজিতে বসিলেন। সারাদিন ধরিয়া নানাপ্রকার পিঠা প্রস্তুত করিলেন—আগুন-তাতে থাকিয়া মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটিলেন। রাত্রে আমাদের খাইবার সময়

দেখি, সরুচাকলি, সিদ্ধ ও ভাজা নানা প্রকারের পুলি, রসবড়া, পাটিসাপটা এবং পায়েস আনিয়া দিলেন। বলিলেন ঃ "অনেক হয়েছে —রেখে দিইছি—কাল আবার খাবে—বাসী হলে মজে।" প্রচুর খাইলাম। কাছে বসিয়া পরিবেশন করিতে থাকিলেন। বৃহৎ সংসার —সকলের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করিয়া তৈয়ার করিয়াছেন ভাবিয়া মনে কষ্টও হইতে থাকিল।

॥ ৬০ ॥

বেলা আন্দাজ দশটা। ভক্তশ্রেষ্ঠ নাগ মহাশয় আসিয়াছেন— শ্রীমার দর্শনে। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীমাকে সংবাদ দিলে তিনি প্রসাদ হাতে ভক্তের জন্য সিঁড়ির নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। এদিকে নাগ মহাশয় শ্রীমার বাটীর সদর দরজা হইতে "মহামায়ী, মহামায়ী" শব্দ করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গে অগ্রসর হইতে থাকিলেন—সমস্ত সিঁড়িটিও সেই ভাবে উঠিলেন। উপরে পৌঁছিলে শ্রীমা "এস বাবা, এস" বলিলে তিনি "মহামায়ী, মহামায়ী" বলিয়া মাথা খুঁড়িয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীমা ছাদের সিঁড়ির প্রথম ধাপটিতে বসিয়া তাঁহাকে উঠিতে বলিলে তিনি নতজানু হইলেন —সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, নয়নদ্বয় হইতে ধারার পর ধারা নির্গত হইয়া গণ্ডযুগল বাহিয়া পড়িতেছে। শ্রীমা বলিলেন ঃ "এস, ঠাকুরের প্রসাদ পাও।" তিনি বলিলেন ঃ "মহামায়ীর প্রসাদ!" শ্রীমা নিজের জিহ্বায় একটুকু ঠেকাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলে তিনি মুখ খুলিলেন। শ্রীমা তাঁহাকে একটু একটু করিয়া খাওয়াইতে থাকিলেন আর তিনি বালকের ন্যায় খাইতে লাগিলেন। গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইতে থাকিল। প্রসাদ খাওয়াইয়া শ্রীমা জল এক এক ঢোক করিয়া মুখে দিতে থাকিলেন আর তিনি খাইতে থাকিলেন। এইপ্রকারে প্রসাদ খাওয়াইবার পর শ্রীমা হাত ধুইয়া আসিয়া দক্ষিণ হস্ত তাঁহার মস্তকে স্পর্শ করাইয়া আশীর্বাদ করিলে তিনি "মহামায়ী, মহামায়ী" কহিতে কহিতে বরাবর পাছু হটিয়া অবতরণ করিলেন। আর শ্রীমা যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা

যায়, ততক্ষণ অনিমেষনয়নে দেখিতে লাগিলেন।—এ এক অপার্থিব দৃশ্য!

॥ ৬১ ॥

খঞ্জনিতে ঘা দিতে দিতে এবং মুখে গুনগুন করিতে করিতে এক পাগলী উপরে উঠিয়া যাওয়ায় শরৎ মহারাজ আমাদিগকে বলিলেন: "ওরে দেখ, কে একটা পাগলী ওপরে গেল।" উপরে গিয়া দেখি —শ্রীমা তাহাকে "এস মা, এস" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, আর সে ঠাকুরঘরের বাহিরেই দাঁড়াইয়া গাহিতে থাকিল। পাগলীর পরনে একখানি ছিন্ন বসন, চুলগুলি রুক্ষ—এত রুক্ষ যে, উকুন ঝরিতেছে। পাগলী শ্রীমাকে প্রণাম করিল না, কথাও কহিল না—কেবল গাহিতে থাকিল। নিজ মনে গাহিল—কখনও নতজানু হইয়া, কখনও বা দাঁড়াইয়া গাহিল। কখনও করজোড় করিয়া, কখনও বা হাত প্রসার করিয়া গাহিল। যতক্ষণ গাহিল—চক্ষু আদৌ খুলিল না। পাগলী অতি কদর্য, অতি নোংরা, কিন্তু তাহার কণ্ঠ সুকণ্ঠ। সেই সুকণ্ঠে সে কীর্তন[১] গাহিল—

"দে, দে, আমায় সাজায়ে দে—তোরা সাজায়ে দে,
আমি যোগিনী হব—প্রাণকানু লাগি আমি যোগিনী হব।
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব—শঙ্খের কুণ্ডল পরি॥
(আমায় সাজায়ে দে—তোরা সাজায়ে)
(আমি) যাইব সেই দেশে, যোগিনীর বেশে যথায় নিঠুর হরি।
যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল,
(আমার) এ রূপযৌবন, পরশ রতন কাচের সমান ভেল॥
(আমায় সাজায়ে দে—আর ঘরে রইতে নারি—আমায় সাজায়ে দে)
(আমি) মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিব প্রাণের হরি।
যদি রোধে কেউ, ত্যজিব এ জিউ, নারীবধ দিব তারে॥
(আর যে রইতে নারি—আমায় সাজায়ে দে)"

---

১ গানটি ভিন্নরূপ হইলেও আমরা পাগলীর মুখে যে-প্রকারে শুনিয়াছি, সেই প্রকারই দিলাম।

—গাহিতে গাহিতে পাগলী চলিয়া গেল। শ্রীমা তাহাকে ছিন্নবসনা দেখিয়া একখানি নূতন বস্ত্র দিলেন—বস্ত্রখানি পড়িয়া রহিল। খাইতে বলিলেন, পাগলী খাইল না—চলিয়া গেল। শ্রীমা বলিলেন ঃ "জোর বৈরাগ্য ! ও খাবে না, নেবে না—শরীর ত্যাগ করবে !"

॥ ৬২ ॥

কালীঘাটে ভাদ্র-কালী দর্শনের পর শ্রীমা পদব্রজে নকুলেশ্বরের অভিমুখে যাইতেছেন। পথিমধ্যে তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এক গৈরিকবসনা, ত্রিশূল-হস্তে ভৈরবী। শ্রীমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া ভৈরবী গাহিতে লাগিলেন। শ্রীমা চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভৈরবীর গানে রাস্তায় ভিখারি ও যাত্রী প্রভৃতির ভিড় লাগিয়া গেল। তিনি গাহিলেন—

"কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা, বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই ॥
মায়ের প্রাণ কি ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে ?
এবার নিতে এলে হরে, বলব উমা ঘরে নাই ॥"

গান শেষ হইলে শ্রীমার ইঙ্গিতে পয়সা দিতে গেলে ভৈরবী উহা না লইয়া বলিলেন ঃ "যার কাছে যা নেবার, তা-ই নিতে হয়, মা। তোর কাছে যা নেবার আমি নিজেই নেব। তুই যেখানে যাচ্ছিস, যা।" শ্রীমা চলিলেন। লক্ষ্য করিলাম, শ্রীমার পাদক্ষেপের রজঃ পথ হইতে ভৈরবী কুড়াইয়া নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

নকুলেশ্বরে পৌঁছিয়া শ্রীমা দর্শনে গেলেন না। নলিনী, রাধু, ছোটমামী ও গোলাপ-মাকে দর্শনে যাইতে বলিয়া নিজে এক চাতালে বসিয়া রহিলেন। নিজমনে একভাবে বসিয়া রহিলেন। গোলাপ-মা প্রভৃতি ফিরিয়া কয়েকবার ডাকিলে শ্রীমা উঠিলেন এবং আনমনে গাড়িতে উঠিলেন। সারা পথ কোন কথা কহিলেন না। বাটীতে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "ভৈরবীটি কে ?" বলিলাম ঃ "গিরিশবাবুর থিয়েটারের কেউ হবেন বোধ হয়; এখন ঐরকম হয়েছেন।" বিশেষ কিছু বলিলেন না, কেবলমাত্র "ওঃ !" বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

পরিশিষ্ট

॥ ১ ॥

একদা লেখক শ্রীমাকে তাঁহার কোষ্ঠীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন : "ওসব তো সারদাই রাখত, তাকে লিখে দেখ দিকি।" সারদা মহারাজ তখন আমেরিকার স্যানফ্রান্সিস্কো শহরে হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠান্তে তথায় ঠাকুরের ভাব প্রচার করিতেছেন। যাহা হউক, তাঁহাকে লিখিলে তিনি যে-উত্তর দেন, তাহার অংশবিশেষ এবং কোষ্ঠীর নকল নিম্নে দেওয়া হইল—

The Hindu Temple,
2963 Webster Street,
San Francisco, California
U. S. A.

২৮শে শ্রাবণ, ১৩১৬, শুক্রবার

মা ব্রহ্মময়ি,

আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিবেন। মা, আপনি কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আশাকরি আপনার শরীর বেশ ভাল আছে। এবং বাত অথবা অম্বল প্রভৃতি এতদিনে আপনার শরীর হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশীর্বাদে সুশীল[১], হরিপদ[২] ও আমি আজকাল বেশ ভাল আছি।

---

১ স্বামী প্রকাশানন্দ।

২ স্বামী বোধানন্দ।

মা, সম্প্রতি আশু এক পোস্টকার্ড আমাকে লিখিয়াছে, আপনার ঠিকুজী-কুষ্ঠীর জন্য। মা, আমি তো অনেকদিন হইল হয় দিদিমাকে, না হয় প্রসন্ন-মামাকে বা অপর কোন মামাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। আমি নকল করিয়া লইয়াই ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। সে অনেক দিন হইল, এখন তো আমার ঠিক মনে নাই, কাকে ফিরাইয়া দিয়াছি। আমার কাছে তো এখানে নাই। তবুও মা, একবার আশু বা আর কারুকে দিয়া শশী-ডাক্তার বা মহেন্দ্র মাস্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করাইবেন, যদি ভুলিয়া আর কাহারও নিকট দিয়া থাকি। কিন্তু আমার বেশ বোধ হইতেছে যেন আমি কোন মামা বা দিদিমার নিকট দিয়াছিলাম। যাহা হউক, যদিও তাহা হারাইয়া গিয়া থাকে, কিছু ক্ষতি তাহাতে হইবে না; কারণ, আমার নিকট আপনার সেই কুষ্ঠীর ঠিক ঠিক নকল এখানে আমার খাতায় তোলা আছে। আমি সেই খাতা হইতে আপনাকে নকল করিয়া এই চিঠির সঙ্গে পাঠাইলাম। আর এই চিঠির ভিতর পাঁচ টাকা আপনার হাতখরচের জন্য পাঠাইলাম।

আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সকলের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ইতি—

আপনার স্নেহাস্পদ সন্তান
সারদাপ্রসন্ন

সারদা মহারাজের উপরোদ্ধৃত পত্রের সহিত শ্রীমার কোষ্ঠীর যে-নকল আসে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

১৭৭৫। ৮। ৭। ২৯। ৪৮। ১৬ ॥ সৌর পৌষস্য অষ্টম দিবসে গুরুবাসরে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তম্যাস্তিথৌ রাত্রৌ গজাগ্নিপলাধিক তৃতীয় দণ্ডাভ্যন্তরে মিথুনলগ্নে বুধস্য ক্ষেত্রে চন্দ্রস্য হোরায়াং ভৃগুর্দ্রেক্কানে গুরোর্নবাংশে শনের্দ্বাদশাংশে গুরোস্ত্রিংশাংশে এবং ষড়বর্গ পরিশোধিতে গুরোর্যামার্দ্ধে রবের্দণ্ডে জাততাং উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে সিংহরাশস্থিতে চন্দ্রে নরগণে ক্ষত্রিয়বর্ণে শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়স্য প্রথমা কন্যা শ্রীমতি ঠাকুরমণি দেবী জাতা।

ততো দিনমানং দণ্ডাদিঃ—২৬। ২২। ১৬ ॥ ততো নিশামানং ৩৩। ৩৭। ৪৪ ॥ ততো উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রাণি করণক ভৌমস্য দশায়াং অস্য নক্ষত্র ত্রয়ং ১০। ১১। ১২ ॥

জাতাহঃ			পূর্ব্বাহঃ			পরাহঃ		
৫	১১	৩	৪	১০	২	৬	২২	৪
২২	২০	৩৯	২১	১৮	৪২	২৩	১০	৩৫
৩৩	০	৮	৫০	৩১	৫১	৪৮	১১	৪
			৩৭	৫	৭	৮	২	৯

॥ ২ ॥

শ্রীমার সন্তানসন্ততিগণের অনেকে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন এবং ভোগও দিয়া থাকেন—তাঁহাদের সুবিধার্থে শ্রীমা যে-কয়েকটি জিনিস খাইতে ভালবাসিতেন এবং যে-উপচারে পূজা লইতে ভালবাসিতেন না, সেগুলির উল্লেখ, যতটা আমাদের জানা আছে বা দেখিয়াছি, নিম্নে করিতেছি ঃ

আম—সর্বপ্রকার, তবে দেশী আমের মধ্যে বিশেষতঃ পিয়ারাপুলি; কাঁঠাল (রসকরা); জাম, জামরুল, লিচু ও ম্যাঙ্গোস্টিন।

পুঁই ব্যতীত সর্বপ্রকার ডাঁটা—বিশেষতঃ সজনা ডাঁটা; কলমী, সজনা ও আমরুল শাক, ঝিঙে, ধুধুল, পটল, আলু ও কুমড়া।

ছোলা, অড়হর ও মুগের ডাল এবং সর্বপ্রকার বড়ি ও বড়া।

তিলকুটা, চিত্রকূট, ছানার মুড়কি, গজা, পাটিসাপটা।

বেগুনি, ফুলুরি আদি প্রায় সর্বপ্রকার তেলেভাজা, চিড়াভাজা, পাঁপর, পোস্তবাটা ভাতে, মোচা ভাতে, পোস্তচচ্চড়ি এবং আমড়া ও পোস্তর অম্বল (মিষ্ট)।

একাদশীতে শ্রীমা অন্ন খাইতেন না। সেদিন লুচি, রাধাবল্লভী, ছোলার ডাল বা ধোঁকা, সুজির পায়েস অথবা ক্ষীরকমলা খাইতেন।

কোন ভক্ত শ্রীমাকে পূজা করিতে আসিলে তিনি বিল্বপত্র দিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিতেন—সময় সময় তুলসীপত্র দিতেও নিষেধ করিতেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে, তিনি চাদরমুড়ি দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ভক্ত নিষেধ সত্ত্বেও অলক্ষে বিল্বপত্র বা তুলসীপত্র দিয়া পূজা করিয়া গিয়াছেন। ভক্ত চলিয়া গেলে তিনি উহা দেখিয়া আমাদের বকিতেন। বলিতেন ঃ "কেন বারণ করনি ?" আমরা হয়তো বলিতাম ঃ "ভক্তের প্রাণে কি করে কষ্ট দেব ?" তিনি শুনিতেন না; বলিতেন ঃ "চটে চটুক—দিতে দেবে না।"

আগমন

৮ই পৌষ, ১২৪০, বৃহস্পতিবার।

তিরোধান

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২৭, মঙ্গলবার।

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ-কথিত ঘটনাবলী

[মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রীম-র) অপ্রকাশিত ডায়েরী অবলম্বনে]

অনিল গুপ্ত*

নিকুঞ্জ দেবী (শ্রীম বা মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী) দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে প্রায়ই দর্শন করিতে যাইতেন। কখনও কখনও তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত রাত্রিযাপনও করিতেন। পুত্রশোকে নিকুঞ্জ দেবী যখন উন্মাদিনীপ্রায়, ঠাকুর তখন বিশেষ ভাবিত হন ও তাঁহার যথাযথ ব্যবস্থাও করেন। তাঁহারই আদেশে নিকুঞ্জ দেবী ঐ যাত্রায় কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আশ্রয়ে বাস করেন। ঠাকুর ঐ সময়ে নিকুঞ্জ দেবীকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দেন যে, আত্মহত্যা করিলে ফিরিয়া ফিরিয়া এই দুঃখময় সংসারে আসিতে হয়, এবং পাশে গঙ্গা থাকায় নিজেও সতর্ক থাকিতেন। ভক্তবৎসল কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে তাঁহার স্নেহস্পর্শে ভক্ত-পরিবারটির হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করেন ও হৃদয়ের জ্বালা দূর করিয়া দেন। ঠাকুর যখন অসুস্থ হইয়া কাশীপুরে অবস্থান করেন নিকুঞ্জ দেবী ঠাকুরের অসুখ বৃদ্ধি স্বপ্নে দেখিয়া কাঁদিয়া ওঠেন—"ওগো, তোমার কাছে গিয়ে যে আমার সব জ্বালা গিয়েছিল!" এই উক্তিই ইহার পরিচায়ক। আহা! কি ছিল তাঁহার অশেষ করুণা!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর নিকুঞ্জ দেবী ১২৯৩ সালের ১৫ ভাদ্র শ্রীশ্রীমায়ের সহিত তীর্থে গমন করেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনী বলিতে নিকুঞ্জ দেবীই ছিলেন।[১] প্রথমে দেওঘর দর্শনাদি করিয়া

---

* শ্রীম-র পৌত্র—শ্রীম-র জীবিত সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রভাসচন্দ্র গুপ্তের (ডাক নাম 'নটি') চতুর্থ পুত্র।

১ কথাটি ঠিক নয়। কারণ, শ্রীমায়ের সেবারের বৃন্দাবন-যাত্রায় অন্যতম সহযাত্রী স্বামী অভেদানন্দ তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনকথা'-য় লিখেছেন ঃ

তাঁহারা কাশীধামে আসেন ও তিনদিন অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীমায়ের সহিত নিকুঞ্জ দেবী বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিতে যাইতেন। একদিন আরতি সমাপনান্তে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখে ও গণ্ডদেশে এক অপূর্ব রক্তিম আভা দর্শন করেন ও সেই সময়েই শ্রীশ্রীমাকে দ্রুতগতিতে মন্দির হইতে বাসায় প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হন। পরে তিনি শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীমা বলেন ঃ "ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।" নিকুঞ্জ দেবী শ্রীশ্রীমায়ের এই সময়ে যে অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দর্শন করেন, তাহা সকলকেই বলেন। কাশীধাম দর্শন করিয়া অযোধ্যায় একদিন থাকিয়া শ্রীমা বৃন্দাবনে আসেন। এখানে এক মাস কাল থাকিয়া নিকুঞ্জ দেবী ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। অতীব দুঃখের সহিত 'মন্দ ভাগ্য' এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দের সহিত কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।[২] নিকুঞ্জ দেবী বলেন—বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমা আবার হাতের বালা খুলিতে যান ও এই সময়ে ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দর্শন দিয়া বলেন ঃ "তুমি বালা খুলো না, গৌরদাসীর কাছে বৈষ্ণবতন্ত্র জেনে নিও। কৃষ্ণ পতি যার, তার বিধবা হওয়া (বৈধব্য) নাই—সে চিরসধবা।"[৩] পরে শ্রীশ্রীমা

"শ্রীমার সঙ্গে যোগেন (স্বামী যোগানন্দ), লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ও আমি রহিলাম। গোলাপ-মা, লক্ষ্মীমণি দিদি, শ্রীম-র স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবীও চলিলেন।" (আমার জীবনকথা, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ১২৮)। যোগীন-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার কয়েকদিন আগেই বৃন্দাবনে এসেছিলেন। শ্রীমা বৃন্দাবনে যোগীন-মাকেও সঙ্গিনীরূপে পুনরায় পেয়েছিলেন। (দ্রঃ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১২৯; শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃঃ ১৮৬-১৯০; শ্রীশ্রী সারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃঃ ৫৬; শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, কলকাতা, ১৩৯০, পৃঃ ১১২-১১৪)। —সম্পাদক।

২ স্বামী অভেদানন্দের আত্মজীবনী অনুসারে শ্রীশ্রীমা-ই নিকুঞ্জ দেবীকে তাঁদের কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে দিতে স্বামী অভেদানন্দকে আদেশ করেছিলেন। —সম্পাদক।

৩ কথাগুলি নিকুঞ্জ দেবীর সূত্রেই প্রাপ্ত। ঘটনাটি যখন ঘটে তখন নিকুঞ্জ দেবী শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনে ছিলেন। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য নিকুঞ্জ দেবীর

তৎকালীন তীর্থভ্রমণ সমাপনান্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে নিকুঞ্জ দেবী প্রায়ই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেন। মাস্টার মহাশয়ও ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া অশেষ সহায়হীন হইয়া পড়েন ও শ্রীশ্রীমাকে মধ্যে মধ্যে নিজ বাটীতে আনিয়া সেবা করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও কয়েকবার মাস্টার মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া কখনও পক্ষাধিক কাল, কখনও বা মাসাধিককাল বাস করিয়া যাইতেন। ঁঘট প্রতিষ্ঠা করিতে স্বপ্নাদিষ্ট হইলে শ্রীশ্রীমা মাস্টার মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া পূজা ও ঁঘট স্থাপনার ব্যবস্থাও করেন। এই ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীমা কতই না পূজা, জপ ও ধ্যান করিয়াছেন!

নিকুঞ্জ দেবী যখনই মায়ের সহিত মিলিত হইয়াছেন ও তাঁহার সহিত যেসব কথা হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু মাস্টার মহাশয়কে বলেন ও তিনি ডায়েরীতে সেইসব কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই ডায়েরীর উপর ভিত্তি করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ-কথিত ঘটনাবলী ইহাতে সন্নিবেশিত হইল।

নিকুঞ্জ দেবী—মা, সংসারে কেবল যন্ত্রণা আর অশান্তি। তোমার কাছে এলেই তপ্ত হৃদয়ে একমাত্র শান্তি আসে। আর তোমাকে মা বলে ডাকলে হৃদয় জুড়ায়!

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, তুমি ওঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দেখেছ, তোমার আর ভাবনা কি? তোমাকে উনি খুব ভাল বলতেন। তিনি আমায় বলেছেন, 'মাস্টারের স্ত্রী কি উদার, কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।' আর মা, তোমায় বলি শোন, এই সংসারে সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ আছেই, যার যখন সময়, ঠিক আসে, ভোগও করিয়ে নেয়। মনে জোর করতে হয় আর ঈশ্বরে মন রাখতে হয়। কেবল এমন অশান্তি-অশান্তি বলতে নাই।

কাছে কথাগুলি শুনে তৎ-প্রণীত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। (দ্রঃ শ্রীশ্রীসারদা দেবী, পৃঃ ৫২, পাদটীকা ৩; শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, পৃঃ ১১৭-১১৮, পাদটীকা ১।—সম্পাদক।

নিকুঞ্জ দেবী—তোমার সঙ্গে কথা কইলেই মনে জোর আসে আর প্রাণ জুড়ায়। মা, তাই যখনই প্রাণটা হু-হু করে তোমার কাছেই আসবার জন্য ব্যাকুল হই।

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, আমার তখন ১৮। ১৯ বৎসর বয়স হবে, তখন ওঁর সঙ্গে শুতুম (১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ)। একদিন বললেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কে ?

শ্রীশ্রীমা—আমি তোমার সেবা করতে আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি ?

শ্রীশ্রীমা—আমি তোমার সেবা করতে আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি আমা বই আর কাউকে জান না ?

শ্রীশ্রীমা—না, তিন সত্যি।

"একদিন বললেন, 'ছেলে কী হবে ? এই দেখছ সব মরছে।' তা আমি বললাম, 'সব কি যায় !'

"একদিন খাবার সময় নুন না থাকায় বলেছিলাম, 'নুন নেই'। তখন তিরস্কার করে বললেন, 'নেই কি' ? 'নেই' শব্দ বলতে নাই। সব যোগাড় করে রাখতে হয়।'

"শ্বশুরবাড়ি বাসকালে রামলালের বাবা (রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়) রাত্রে আমায় শুতে যেতে বলতেন, আর উনি কেবল হাসতেন। সেইসময় একসঙ্গে শুতুম আর সারারাত গল্পেই কেটে যেত। বলতেন—কেমন করে সংসারের কাজ করতে হয়, কেমন করে সকলকার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। আর জানতে হয়, ঈশ্বরই একমাত্র আপনার ও নিত্যবস্তু।

"কামারপুকুরে আমার মা আসাতে কত আদর-যত্ন করলেন আর বললেন, 'আপনি আচার তৈয়ার করে খাওয়ান।'

"জয়রামবাটীতে যখন ছিলাম তখন উনি এলেন। আমায় বললেন, 'সাজি মাটি দিয়ে পা-টা ধুয়ে দাও তো।' তা দেওয়াতে বাড়ির অন্য মেয়েরা দেখে বলাবলি করতে লাগল, 'ওমা, সারদার কি গো, স্বামীর সঙ্গে কিছুই হলো না তবু দেখ...।'

"শাশুড়ি (চন্দ্রমণি দেবী) যখন পুত্রশোকে* মুহ্যমান সেই সময় শাশুড়ির কাছেই থাকতেন, কত বোঝাতেন। একদিন প্রার্থনা করলেন, 'মা ! আমি তোমার নামগুণগান করব, আর মা যদি সদা-সর্বদা শোক করে আর কাঁদে কেমন করে পারব ! তা ওর মন উলটে দাও মা।' শেষে তাই হলো, শাশুড়ি সব সময়েই ভাবে থাকতেন।

"শম্ভু মল্লিক থাকার জন্য একটি বাসাবাড়ি (১১ এপ্রিল ১৮৭৬) করে দিলে। তা বৌমা, সেখানে থাকতে মন চাইত না। সেকথা বলতে তিনি হৃদয়কে বললেন, 'হৃদে, তবে তোর স্ত্রীকে আন'। হৃদুও বললে, 'আমার স্ত্রীর জন্য কি শম্ভু মল্লিক বাড়ি করে দিলে ?'

"ওখানে তখন একজন ব্রহ্মচারী (তান্ত্রিক সাধক) থাকত। মনে বড় ভয় হতো যদি ওঁর কোন মন্দ করে, তাই ১০ টাকা দিতে গেলুম যাতে কোন মন্দ না করে। তা ঠিক টের পেয়েছেন। অমনি নবতে এসে বললেন, 'আমার মা আছে, কে মন্দ করবে ?'

"রাম দত্ত প্রভৃতিকে একদিন বললেন, 'দেখ, বড় ছেলে ছেলে করে, তোমরা একবার নবতে যাও, আর বলে এস আমরাই আপনার ছেলে।'

"নৌকায় করে বালি** হয়ে একসঙ্গে দেশে যাওয়া, পরস্পর প্রসাদ খাওয়া আর কত গান গাইলেন, আহা ! সে কি ভাব ! আবার বললেন, 'আমি জানি তুমি কে। কিন্তু এখন বলব না। আর এর (নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ভিতরে সব আছে।'

"শাশুড়ির মৃত্যুর (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭) সময় বলতে লাগলেন, 'মা গো, তুমি কে গো, তুমি আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলে। মা, এক রূপে এতদিন দেখলি এখন যেন দেখিস।'

"শাশুড়ির মৃত্যুর পর একদিন খাবার পূর্বে বললেন, 'দাঁড়াও, আমি মার জন্য পঞ্চবটীতে একটু কেঁদে আসি।'

---

* ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের মৃত্যুতে।

** ঘাটাল থেকে মাইল চারেক দূরে বন্দর পর্যন্ত স্টীমার চলাচল আরম্ভ হলে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও হৃদয়কে নিয়ে একবার দেশে গিয়েছিলেন। ঘাটাল ছাড়িয়ে বন্দরে নেমে নৌকায় তাঁরা বালি-দেওয়ানগঞ্জে আসেন। কামারপুকুর থেকে বালির দূরত্ব আট মাইল। শ্রীশ্রীমা সেবারের কথাই বলেছেন এখানে।

—সম্পাদক

"হৃদুকে একদিন বললেন, 'তুই শালা আঁধের থাক, তুই এ-ঘরে আসিসনি। আমি তোকে গালাগাল দিই, তোরও রক্তমাংসের শরীর, তুইও দিস।'

"আমাকে ও আমার সঙ্গীদের দেখে বললেন, 'দেখ হৃদে, ওকে ছেড়ে দিতে আমার অবিশ্বাস হয় না, তবে লোকে কি বলবে।'

"বেতন ৭ টাকা সম্বন্ধে খাজাঞ্চীকে বললেন, 'যদি ওকে (শ্রীশ্রীমাকে) দাও তো দাও, তা না হলে গঙ্গার জলে ফেল, কি অতিথিসেবায় দাও। যা ইচ্ছা কর।'

"নবতে যখন থাকতুম সমস্ত দিন বসে একদিন মালা গেঁথে বললাম, 'ওঁকে বলো—পরতে হবে।' তা মালা গলায় পরে গান গাইলেন—'ভূষণ বাকি কি আছে রে, জগচ্চন্দ্র হার পরেছি।'

"বাড়ি (জয়রামবাটী) যাবার সময় বার বার ওঁকে দেখতে যাওয়াতে হৃদুকে বললেন, 'একশো বার কি ? যেতে বল।'

"গোলাপ-মাকে একদিন বললেন, 'ওর সহ্যগুণ কত, ওকে নমস্কার।"

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, সেবার যখন নয় মাস আসিনি বড় কষ্ট হয়েছিল।

নিকুঞ্জ দেবী—মা, তুমি দেবী! তুমি মা জিতেন্দ্রিয়!

শ্রীশ্রীমা—বৌমা, ও কথা বোলোনি, কি কপালে আছে কে জানে ? কাশীপুরে যখন থাকতুম তখন কত কি মনে উঠত, তা ওঁর কাছে গিয়ে তবে শান্তি হতো। কিন্তু নবতে যখন থাকতুম তখন অত কি হয়েছিল ?

"একদিন বললেন, 'তুমি আর লক্ষ্মী কে, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের বলব না। তোমার ধার শোধবার জন্য আমি বাউল হব আর তোমাকে সঙ্গে লব।'

"লক্ষ্মীর একাদশী শুনে বললেন, 'আমি শাস্ত্রের পার, খুব খাবে। আর থান ধুতি, যেন রাক্ষুসে বেশ।'

"পঞ্চবটীতে সীতাকে দেখেছিলেন, হাতে ডায়মন্ডকাটা বালা। সেই বালা দেখে আমায় সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন, এদিকে নিজে টাকা ছুঁতে পারতেন না।

"ওঁর অসুখের সময় বললেন, 'ইচ্ছা হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আর কেউ থাকবে না, কেবল লাটু। রঞ্জিত রায়ের দীঘিতে গিয়ে মায়ের ভোগ দিই।

"তোমার কত নাতি-পুতি [হবে], [তোমার] কিসের ভাবনা!

"একদিন ওঁকে বললাম, 'আমার ভাবটাব তো কিছুই হলো না।' তা শুনে বললেন, 'আবার কি হবে, আবার কি কাপড় ফেলে ধেই-ধেই করে নাচতে হবে, তখন কাপড় সামলাবে কে?'

"দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে বললেন, 'কৃপণ হওয়া ভাল তো লক্ষ্মীছাড়া হওয়া ভাল নয়।" *

---

* মাসিক বসুমতী, ৩১শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য-পরিচয়

সঙ্কলয়িতা
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাবের সার্ধশত বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। শ্রীভগবানের নবযুগলীলায় শ্রীশ্রীমায়ের অপরিহার্য ভূমিকা নির্ণয়ের চেষ্টাও পরিলক্ষিত হইতেছে। মাতৃভাবে ভাবিতা, মানবীমূর্তিতে প্রকটিতা এই মহাশক্তি অতি ধীরে জনমানসে আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। এই প্রকাশের পরিপূর্ণ রূপ আমরা এখনও দেখিতে পাইতেছি না; আমরা সমসাময়িক ঘটনাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া শুধু কল্পনাতেই উহা অনুভব করিবার চেষ্টামাত্র করিতে পারি। কিন্তু ঐরূপ করিতে হইলেও উপযুক্ত পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, ভক্তসাধারণের দৈনন্দিন অনুধ্যান বা স্মরণ-মননের পক্ষেও উহা অপরিহার্য।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলার প্রামাণিক তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সযত্নে প্রকাশ করিবার চেষ্টা বহু বৎসর যাবৎ করিয়া আসিতেছিলাম। এই পুস্তিকাখানি তাহারই আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তীতে পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল (স্নানযাত্রা, ১৩৬০)। ইহাতে তাঁহার মন্ত্রশিষ্যগণের সংখ্যা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিবদ্ধ হইয়াছে। ভবিষ্য-বংশধরগণের নিকট ইহা তদীয় লোকশিক্ষাদানের ব্যাপকতর প্রমাণস্বরূপ হইয়া থাকিবে। এইসকল শিষ্যেরাও তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন।

ঐশ্বরিক স্বরূপে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা অভিন্ন। ঠাকুরের কোন কোন পার্ষদ-ভক্তও শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষ স্বামী যোগানন্দের নাম সুবিদিত। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দও মায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তবে স্বামী যোগানন্দ যে মায়ের প্রথম মন্ত্রশিষ্য সেই সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দের ও স্বয়ং মাতাঠাকুরানীর

শ্রীমুখের উক্তি রহিয়াছে। মায়ের কাছে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দক্ষিণেশ্বরে মন্ত্র পাইয়াছিলেন বলিয়া যে-বিবরণ কেহ কেহ আমাদিগকে দিয়াছিলেন, শ্রীমা ও স্বামী সারদানন্দের সাক্ষ্যের পর ঐ বিবরণকে আর সত্য বলিয়া ধরা যাইবে না। সুতরাং ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ পরবর্তী কোন সময়ে মায়ের কাছে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি, স্বামী অভেদানন্দও শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। স্বামী অভেদানন্দকে কয়েকবার দর্শনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল তবে অন্যান্য বিষয়ে কথা হইলেও এই বিষয়ে তাঁহার সহিত কোন আলোচনা আমার হয় নাই। ১৩৪৫ সালে আমি রেঙ্গুন যাই। স্বামী অভেদানন্দের মন্ত্রশিষ্য ভুবন (ব্রহ্মচারী হরচৈতন্য) সেই সময়ে রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনে থাকিয়া ঠাকুর পূজা করিতেন। আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "আমার গুরুদেব [স্বামী অভেদানন্দ] মায়ের শিষ্য ছিলেন, বৃন্দাবনে মা তাঁকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। যোগীন মহারাজের দীক্ষার পরেই মার কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি দীক্ষাপ্রার্থী হন, আর 'ঠাকুর তোমাকে কিছু দিয়ে যাননি ?'—মার এই প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব বলেন, 'ঠাকুর আমার জিভে কিছু লিখে দিয়ে ধ্যান করতে বলেছিলেন, কিন্তু কী লিখেছিলেন জানি না। আমার যা কিছু অনুভূতি, সবই ধ্যান করে হয়েছে।' এই ঘটনা গুরুদেব নিজমুখে বলেছিলেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-লেখক শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তও শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণীর নিকট যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা এইরূপ ঃ ঠাকুরের স্থূল লীলাবসানের পর একদা তাঁহারা উভয়ে জয়রামবাটী গিয়াছিলেন। রাত্রে আহারের পর পুরুষভক্তেরা বহির্বাটীতে বিশ্রাম করিতেছেন এবং স্ত্রীলোকেরাও সবেমাত্র শয়ন করিয়াছেন; এমন সময় মায়ের একটি দর্শন উপস্থিত হয়। তিনি দেখিলেন, শ্রীম ন্যাংটা ছোট বালকমূর্তিতে জয়রামবাটীর অলি গলি দিয়া ছুটিতেছেন আর ঠাকুর তাঁহাকে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া মাকে বলিতেছেন, "দাও দাও, একে দাও।" "ঠাকুর কি

ছেলেকে কিছু দিয়ে যাননি ?"—বলিয়াই মা ছেলেকে ডাকাইয়া আনিয়া অন্যের অশ্রুতভাবে তখনই তাঁহাকে কিছু বলিয়া দেন।

কেবলমাত্র মন্ত্রদানের ভিতর দিয়াই অবতীর্ণ জগদ্‌গুরুশক্তি লোকোদ্ধার করেন না। তাঁহার অমোঘ ইচ্ছায়, আশীর্বাদে, কৃপাদৃষ্টিপাতে বা স্পর্শেও জীব পরাগতি লাভ করে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলায় এইরূপ ঘটনা বিরল নহে।

(১) স্বামী সৎসঙ্গানন্দ নিজ বিষয়াসক্ত পিতার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাভিক্ষা করিলে মা তদীয় পিতাকে একটিবার তাঁহার কাছে লইয়া আসিতে বলেন। মাতাঠাকুরানীর দর্শনাদি লাভ করিয়া পিতা কৃতার্থ হন ও তাঁহার মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটে। শেষজীবনে তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, "মা যদি দেবতা না হন তো দেবতা আর কে ?" 'মা মা' বলিতে বলিতে বৃদ্ধ[১] অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করেন।

(২) কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত আমাদের জনৈক বন্ধু[২] শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিতেন। সাধুদের কেহ কেহ তাঁহাকে মায়ের কাছে মন্ত্র লইতে বলিলে তিনি ভাবিতেন, "আমার দীক্ষা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তো ইষ্টদর্শন করিতেছি !" তাঁহার মনোভাবে প্রসন্না হইয়া অন্তর্যামিনী একদিন বলিলেন ঃ "বাবা, এই তোমার শেষ জন্ম।" তাঁহার ভগবদ্ভাবে তন্ময় জীবন অনেকের প্রাণে উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছে।

(৩) মুখে কথাটি না বলিয়া কেবলমাত্র সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাতে শ্রীশ্রীমা কিভাবে তাঁহার এক সন্তানের[৩] 'বকলমা' গ্রহণ করিয়াছেন সেই বিবরণ মায়ের জীবনীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

(৪) কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত একজনকে[৪] শ্রীশ্রীমা তাহার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। মায়ের আদেশ পালন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁহাকে অশেষমহিমান্বিত শ্রীদুর্গারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করিল।

---

১ শ্রীহট্টের দুলালি পরগনার বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত

২ হাওড়া-রামকৃষ্ণপুরের হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৩ খুলনার অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত

৪ কোয়ালপাড়ার হরিপদ মাঝি

আংশিকভাবে শ্রীশ্রীমায়ের গুরুশক্তির সাহায্য লাভ করিয়াছেন এরূপ ভক্তের সংখ্যা বড় কম নহে। মা যখন সরকারবাড়ি লেনের ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন তখন শ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ নিচের তলায় একজনকে[৫] মন্ত্র দিয়া বলিলেন : "তোমার এই রুদ্রাক্ষের মালা ওপরে গিয়ে মার হাতে দিয়ে বলবে, এই মন্ত্রটি আমার মালায় জপ করে দিন।" মা জপ করিয়া দিয়া বলেন : "আমি এতে সব শক্তি সঞ্চার করে দিলুম।"

স্থূলে লীলাবসানের পরেও মানবসন্তানের প্রতি শ্রীশ্রীমার দক্ষিণামূর্তিতে প্রকাশ বন্ধ হয় নাই। কোন কোন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী দেবস্বপ্নে তাঁহার কাছে মন্ত্র পাইয়াছেন, শোকে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন, সঙ্কটে পথের নির্দেশ পাইয়া বিপন্মুক্ত হইয়াছেন এরূপ বহু ঘটনা আমাদের জানা আছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও একান্ত অভাব নাই।

বোম্বাই প্রদেশ হইতে আগত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক[৬] কিছুকাল যাবৎ স্বপ্নে এক মাতৃমূর্তির দেখা পাইতেন, কিন্তু কাহাকে দেখিতেছেন বুঝিতে পারিতেন না। একদিন ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি দেখিয়াই তিনি চমকিয়া উঠেন; তাঁহার বুঝিতে বাকি থাকে না যে, এই মাতৃদেবীই এতদিন তাঁহাকে দর্শন দিয়া অপার্থিব আনন্দের অধিকারী করিয়াছেন।

কতিপয় গুরুভ্রাতার অনুরোধে ও আগ্রহে শ্রীশ্রীমায়ের কথা সংগ্রহের সমকাল হইতেই তদীয় মন্ত্রশিষ্যগণের নামধাম সংগ্রহ করিয়া আসিতেছিলাম, সময়ের ব্যবধানে ও অন্যান্য অনিবার্য কারণে সম্পূর্ণ সংগ্রহ যে হইয়া উঠে নাই তাহা ভালরূপেই জানি। আমার ধারণা, এই তালিকায় প্রায় শত শিষ্যের নাম বাদ পড়িয়াছে। যেসকল গৃহী শিষ্যের নাম এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হইল তাঁহাদের প্রায় সকলেরই নামের সাথে জেলা, মহকুমা ও গ্রাম বা শহরের নামোল্লেখ করিয়াছি। কাহারও কাহারও নামের সাথে নূতন বাসস্থানও উল্লিখিত হইয়াছে,

---

৫ ঢাকা জেলার কুমুদবন্ধু সেন

৬ প্রসন্নকুমার বলবন্তরাও জুন্নারকর

বিশেষতঃ যেখানে স্থায়ী আবাসের কথা জানিতে পারা গিয়াছে। সাধুদের পূর্বাশ্রমের পরিচয় দান বিহিত নহে বলিয়া জেলামাত্র উল্লেখ করিয়াছি; জেলা বলিতে পিতৃপিতামহের বাসভূমিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যগণের কেহ কেহ অবিবাহিত বা চিরকুমার থাকিয়া লোককল্যাণে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের নামের পাশে 'অবিবাহিত' লেখা হইয়াছে; কিন্তু এই অবিবাহিতের তালিকা মোটেই সম্পূর্ণ নহে।

মোট ১১৭৬ জন মন্ত্রশিষ্যের নাম এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হইল। তন্মধ্যে প্রায় ছয়শত জন আমার নিজের পরিচিত এবং অবশিষ্ট সকলের কথাও অতি বিশ্বস্তসূত্রে সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে যাহা কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহার বেশির ভাগই 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যগণের নামাদি-সংগ্রহকার্যেও আমাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই; এমনকি ১৯৪৬ সালে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হানাহানির সময় ক্ষিপ্ত জনতার হাতে পড়িয়া জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের অপরিসীম করুণাই যে বহুবিধ বিপর্যয়ের মধ্যে, তাঁহার অন্যান্য সন্তানগণের ন্যায় এই দীন সন্তানকেও রক্ষা করিয়া চলিয়াছে তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি এবং ভঙ্গুর জীবনের অবশিষ্ট কাল যাহাতে তদীয় পাদপদ্ম-চিন্তায় কাটাইতে পারি তজ্জন্য মহাপ্রাণ মাতৃভক্তগণের শুভকামনা ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

দুর্গাষ্টমী ১৫ আশ্বিন ১৪০২
২ অক্টোবর ১৯৯৫

শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য-পরিচয়

জেলা—কাছাড়

১	হারাণচন্দ্র বক্সি	শিলচর	

জেলা—শ্রীহট্ট

১-১৮ স্বামী অব্যক্তানন্দ, আদিনাথানন্দ, গোপেশ্বরানন্দ, চণ্ডিকানন্দ, জগদানন্দ, জ্ঞানানন্দ, দেবানন্দ (দেবেন্দ্র গুপ্ত), পরমাত্মানন্দ, পুরুষাত্মানন্দ, প্রেমেশানন্দ, শান্তিময়ানন্দ, শুদ্ধাত্মানন্দ, সত্যস্বরূপানন্দ, সৎসঙ্গানন্দ, সাধনানন্দ, সারদেশানন্দ, সুখদানন্দ। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য।

[করিমগঞ্জ]

১৯	অতুলচন্দ্র চৌধুরী (বি.এ)	দেবশ্রী	
২০	যতীন্দ্রচন্দ্র দত্ত	সুপাতলা	
২১	কুমুদকুমার চন্দ	বিয়ানীবাজার	

[সদর]

২২	লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী	ঢাকা (দক্ষিণ)	
২৩	বিনোদবন্ধু গুপ্ত (ডাক্তার)	গুপ্তপাড়া	
২৪	নবনীকুমার গুপ্ত (বি.এ)	কাশীপাড়া	
২৫	মোক্ষদামোহন দাশ (বি.টি)	দাশপাড়া	কাশী
২৬	ধনদা দেবী	পাটলীপাড়া	
২৭	রজনীকান্ত ভট্টাচার্য	,,	
২৮-২৯	যামিনীনাথ চক্রবর্তী (স্ত্রী) চারুবালা	লক্ষ্মীপাশা	
৩০	জয়গোবিন্দ শর্মাচৌধুরী	জামালপুর	পূর্বলাবান, শিলং

[দক্ষিণ শ্রীহট্ট]

৩১	বন্ধুবিহারী সেন	শঙ্করপুর	
৩২	নীরদবরণ গোস্বামী	বেকামুরা	

[সুনামগঞ্জ]

৩৩	প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য (রায়সাহেব)	সোনাউতা	শিলং

[হবিগঞ্জ]

৩৪	চন্দ্রমাধব ভট্টাচার্য	বাজুকা	
৩৫	উমাচরণ সেনমজুমদার	জয়পুর	ইয়ারপুর, পাটনা
৩৬	যশোদাকুমার মোদক (বি.এ)	সুজাতপুর	
৩৭	গোপেন্দ্রলাল পোদ্দার	"	
৩৮	তারকনাথ চক্রবর্তী (বি.টি)	মথুরাপুর	শিলচর
৩৯-৪৩	কর্ণাটকুমার চৌধুরী	ব্রাহ্মণডোরা	
	(স্ত্রী) প্রীতিলতা		
	(ভগিনী) মীরা দেবী (সন্ন্যাসিনী)		শ্রীসারদা আশ্রম, কলিকাতা
	(দিদি) চপলা চৌধুরী		
	(চপলার কন্যা) প্রতিভা চৌধুরী		
৪৪	মানগোবিন্দ চৌধুরী	কেন্দুয়াবহ	
৪৫	সুরেশচন্দ্র সিংহ	ছাতিয়ান	
৪৬	রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত	মিরাশী	
৪৭	ক্ষীরোদবালা রায়	"	
৪৮	হৃদয়চন্দ্র দেব	যাত্রাপাশা	
৪৯	শ্রীবাস দাস (ডাক্তার)	হবিগঞ্জ	
৫০	সুরেন্দ্রচন্দ্র ধর (বি.এ)	বারিদপুর	অবিবাহিত
৫১	দেবেন্দ্রলাল রায়	জলসুখা	"
৫২	গগনচন্দ্র দত্ত	মোহনাবাদ	
৫৩	উমেশচন্দ্র পুরকায়স্থ	জন্তরী	
৫৪	নির্মল গোস্বামী	পুটিজুরী	
৫৫	সীতেশচন্দ্র দেবগুপ্ত	সুঘর	শিলচর
৫৬	বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার	"	লাবান, শিলং
৫৭	চন্দ্রকুমার মজুমদার	"	
৫৮	অখিলচন্দ্র দে	পৈল	

জেলা—ময়মনসিংহ

১-৭ স্বামী গিরিজানন্দ, ত্র্যম্বকানন্দ, নিগমানন্দ, বিকাশানন্দ, রমানন্দ, শৈলানন্দ, স্বয়ংচৈতন্যানন্দ।

[নেত্রকোণা]

৮	রাজনারায়ণ সাহা	কুল্লাগড়া	
৯	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা	"	
১০	গজেন্দ্রচন্দ্র সাহা	"	
১১	কাশীনাথ রায়বর্মন	কুতবপুর	
১২	সুরেশচন্দ্র ঘোষ (বি.এল)	পাঁচাশী	
১৩	ঈশ্বরচন্দ্র চন্দ	হাসামপুর	
১৪-১৫	নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (এম.এ) (ভ্রাতা) উপেন্দ্রচন্দ্র	নওপাড়া	১২৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, টালা
১৬	সুধাংশুবিকাশ সান্যাল (এম.এ, বি.এল)	"	
১৭-১৯	শ্রীশচন্দ্র সান্যাল (বি.এ) (স্ত্রী) নলিনীবালা (মাতা) কুসুমকামিনী	"	
২০	চারুচন্দ্র অধিকারী	কাটিহালি	
২১	সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	সমাজ	
২২-২৩	নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (এম.এ) (ভ্রাতা) পরেশচন্দ্র (এম.বি)	দশহাল	৭-১ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন পি ১৬, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড
২৪	দীনেশচন্দ্র চক্রবর্তী (বি.এ)	দিয়ারা	

[কিশোরগঞ্জ]

২৫	মণীন্দ্রনাথ মজুমদার	গচিহাটা	
২৬	সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	লাছন্দ	
২৭	সুরেশচন্দ্র ঘোষ	সহস্রাম	
২৮	শ্যামাচরণ চক্রবর্তী	কাপাশাটিয়া	কাশী
২৯	প্রিয়ম্বদা মজুমদার	ধনকোরা	
৩০	পীতাম্বর নাথ	মির্জাপুর	
৩১	চারুচন্দ্র অধিকারী (ডাক্তার)	পুকুরিয়া (ঝাড়গ্রাম)	

[সদর]

৩২-৩৪	নবদ্বীপচন্দ্র রায়বর্ম্মন (ডাক্তার)	শ্যামগঞ্জ	
	(স্ত্রী) সুশীলাসুন্দরী		
	(মাতা) বামাসুন্দরী		
৩৫	সুশীলা আচার্য	উস্তি	
৩৬	রামচন্দ্র সাহা	ছনকান্দা	
৩৭	ললিতকৃষ্ণ দাশ (ডাক্তার)	পারুলতলা	
৩৮-৩৯	মনতোষকুমার গাঙ্গুলী (বি.এ)	ময়মনসিংহ	
	(ভ্রাতা) সন্তোষকুমার		
৪০-৪১	চিন্তাহরণ দেব	"	
	(ভ্রাতা) বিনোদবিহারী	"	রেঙ্গুন

[টাঙ্গাইল]

৪২-৪৩	সুশীলকুমার বসু (এম.এ)	বেড়াবুচিনা	
	(ভ্রাতা) সুধীরকুমার		
৪৪-৫০	শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	ঘারিন্দা	
	(স্ত্রী) সুশীলাবালা		
	সুরেন্দ্রনাথ		
	(স্ত্রী) কিরণবালা		
	সৌরীন্দ্রনাথ		
	(স্ত্রী) বিন্দুবাসিনী		
	সত্যেন্দ্রনাথ		
৫১-৫৩	নীলকান্ত চক্রবর্ত্তী (বি.এ)	"	
	(স্ত্রী) মাতঙ্গিনী		
	(ভ্রাতা) মোহিনীমোহন		
৫৪-৫৫	ক্ষিতীশগোবিন্দ মজুমদার	"	
	নীরদবালা		
৫৬	ভবানীনাথ সরকার	"	

৫৭-৬৪	সোহাগিনী ভৌমিক	শিবপুর	
	উপেন্দ্রনাথ ভৌমিক		
	(স্ত্রী) ষোড়শীবালা		
	ধীরেন্দ্রনাথ (বি.এল)		
	(ভ্রাতা) জগদীশচন্দ্র		
	সুরেন্দ্রনাথ		
	পুলিনবিহারী		
	(স্ত্রী) প্রভাবতী		
৬৫	ধীরেন্দ্রকুমার সাহা	বল্লা	
৬৬	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা (ডাক্তার)	বল্লা	
৬৭	কানাইলাল সাহা	"	
৬৮-৬৯	মতিলাল সাহা	"	
	(ভ্রাতা) রমণীমোহন	"	
৭০	যশোদালাল সাহা	"	
৭১	জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় (এম.বি)	"	নবদ্বীপ (তেলিপাড়া)
৭২-৭৩	ননীমোহন শেঠচৌধুরী (সস্ত্রীক)	"	
৭৪-৭৫	মতিলাল বণিক	"	
	(ভ্রাতা) হলধর	"	
৭৬	সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (এম.এ, বি.এল)	সল্লা	বারাকপুর
৭৭-৭৯	গোপালচন্দ্র রায় (ডাক্তার)	মৈষামুরা	
	(স্ত্রী) কুলকামিনী		
	(পুত্র) প্রতাপাদিত্য (ডাক্তার)		
৮০	মন্মথনাথ রায়	আলিসাকান্দা	নবদ্বীপ (তেঘরিপাড়া)
৮১	কিশোরীমোহন ভৌমিক (বি.এল)	খুপিপাড়া	
৮২	জিতেন্দ্রকুমার সাহা	"	
৮৩	পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক	জোয়াইর	
৮৪	শ্যামসুন্দর দাস	"	
৮৫	জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ (বি.এ)	গলগণ্ডা	
৮৬	কেদারনাথ গুহ	"	
৮৭	পূর্ণচন্দ্র মিত্র	"	

৮৮	বিনোদবিহারী ঘোষ	আলাপনগর	
৮৯	রমণীমোহন সাহা (এম.বি)	পোড়াবাড়ী	জামালপুর
৯০	আদরিণী রায়	বাসাইল	
৯১	ফণীশচন্দ্র সেনগুপ্ত (ডাক্তার)	শধুপুর	
৯২	হেমচন্দ্র চক্রবর্তী	কালীহাতী	
৯৩-৯৪	অনাথ বন্ধু চাকী (ভাইপো) মণীন্দ্রমোহন	ভাদাই	
৯৫	গঙ্গাধর সাহা	কাইয়ামারা	
৯৬	কুমুদকান্ত দাশগুপ্ত	টাঙ্গাইল	
৯৭	যতীন্দ্রলাল সাহা	টাঙ্গাইল	
৯৮	কিশোরীলাল	"	নবদ্বীপ (গানতলা রোড)

জেলা—ঢাকা

১-১৪ স্বামী অভয়ানন্দ, আদ্যানন্দ, কাশীশ্বরানন্দ (প্রফুল্ল), গৌরীশানন্দ, চিন্ময়ানন্দ (শচীন), ধ্রুবেশ্বরানন্দ, নারায়ণানন্দ, নিত্যস্বরূপানন্দ, বিশ্বেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মেশ্বরানন্দ, যোগীশ্বরানদ, শঙ্করানন্দ (মতিলাল, সুহৃদ সমিতি), সম্বুদ্ধানন্দ। ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য (হেমেন্দ্র)।

[মুন্সীগঞ্জ]

১৫-১৭	সুরেন্দ্রকান্ত সরকার (স্ত্রী) শচীবালা (ভ্রাতা) সুরেশচন্দ্র	দক্ষিণপাইকসা	ধীপুর
১৮	প্রিয়বালা দেবী	পূর্বসিমুলিয়া	কাশী
১৯	হেমন্তকুমার মিত্র	নাটেশ্বর	২৩/৪ গড়িয়াহাট রোড, কলিঃ
২০	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	আপরকাঠি	
২১	অখিলচন্দ্র বসু	কাজিরপাগলা	
২২-২৪	প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী (স্ত্রী) হেমাঙ্গিনী (ভ্রাতা) সতীশচন্দ্র	ইছাপুরা	
২৫-২৬	গোপালচন্দ্র দে (স্ত্রী) নলিনীবালা	"	

২৭	রাইমোহন চৌধুরী	বজ্রযোগিনী	
২৮	ভুবনচন্দ্র গুহ	"	
২৯-৩০	রাজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	"	
	(স্ত্রী) সর্বমঙ্গলা		
৩১	মধুসূদন বসু (বি.এ)	"	
৩২-৩৩	জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী (বি.এ)	কুশারীপাড়া	যকনপুর, পাটনা
	(স্ত্রী) চারুবালা		
৩৪-৩৫	গুরুনাথ নাথ	পশ্চিমপাড়া	
	(স্ত্রী) যামিনীপ্রভা		
৩৬-৩৭	রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্ত (বি.এ)	আউটসাহী	
	(স্ত্রী) গিরিজা		
৩৮-৩৯	ব্রজনাথ সেন (বি.এ)	নেত্রাবতী	
	(স্ত্রী) অশ্রুমতী		
৪০	যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত (কবিরাজ)	সোনারঙ্গ	
৪১-৪২	বিনয়বালা সেন	"	
	(ভগিনী) সুধাবালা সেন		
৪৩-৪৪	মাখনলাল সেন (বি.এ)	"	
	(স্ত্রী) মৃন্ময়ী		
৪৫	প্রমোদকুমার সেন	"	
৪৬	নীলিমা দাশগুপ্ত	"	
৪৭-৪৮	বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত (কবিরাজ)	"	
	(স্ত্রী) সুরবালা		
৪৯	চারুবালা সেনগুপ্ত	"	সেবাশ্রম, কাশী
৫০	সিতাংশুভূষণ সেন (সুহৃদ সমিতি)	"	
৫১	রাধিকামোহন নন্দী	বড়লিয়া	যাদবপুর কলোনী
৫২-৫৮	উমেশচন্দ্র দত্ত (ডাক্তার)	"	
	(স্ত্রী) সুশীলাবালা		
	(পুত্র) নরেশচন্দ্র (এম.বি)		
	(ভ্রাতা) লক্ষ্মীকান্ত (উকিল)		৩, ঈশ্বরদাস লেন, ঢাকা
	শরচ্চন্দ্র (বি.এল)		
	(স্ত্রী) কুমুদিনী		
	(ভ্রাতা) সুরেশচন্দ্র		

৫৯-৬০	সুরেন্দ্রলাল সেন (এম.এ)	মধ্যপাড়া	
	(স্ত্রী) স্নেহলতা		
৬১-৬২	বসন্তকুমার সরকার (ডাক্তার)	জৈনসা	গফরগাঁও
	(স্ত্রী) দক্ষিণাকালী		
৬৩	কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ধোপরাপাশা	
৬৪-৬৫	অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়	"	
	(ভ্রাতা) অমূল্যবন্ধু		
৬৬	উপেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন (বি.এসসি)	স্বর্ণগ্রাম	
৬৭	দেবেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী (এম.এ)	"	
৬৮-৭০	বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত (বি.এ)	কলমা	
	(স্ত্রী) ইন্দুবালা		
	(ভগিনী) তরলা		
৭১-৭৩	ভূপতিচন্দ্র দাশগুপ্ত	কলমা	
	(স্ত্রী) চপলা		
	(কন্যা) গীতা দেবী		আনন্দ আশ্রম
৭৪	নলিনীকুমার চক্রবর্তী	"	
৭৫-৭৬	দীনেশচন্দ্র সেন (কবিরাজ)	বরাকর	
	(স্ত্রী) রাজবালা		
৭৭	নগেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়	"	
৭৮-৭৯	নিশিকান্ত মজুমদার	মূলচর	
	(স্ত্রী) সন্তোষবালা		
৮০	নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কনকসার	
৮১	হীরালাল চট্টোপাধ্যায়	বাগরা	চক্রধরপুর
৮২	শৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু	কোলা	
৮৩	যোগেশচন্দ্র গাঙ্গুলী	"	
৮৪	ধীরেন্দ্রচন্দ্র পাল	লতপদী	
৮৫	পূর্ণচন্দ্র পাল	"	
৮৬	যোগেন্দ্রচন্দ্র পাল	"	
৮৭-৮৮	যোগেন্দ্রচন্দ্র পাল (সস্ত্রীক)	"	
৮৯	বিনোদাকান্ত দাশগুপ্ত	গাউপাড়া	
৯০-৯১	চন্দ্রমোহন দত্ত	"	
	(স্ত্রী) চপলাসুন্দরী		

৯২-৯৪	হেরম্বচন্দ্র দে (সস্ত্রীক)	গারুড়গাঁ	
	যোগেশচন্দ্র দে		
৯৫	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এম.এ)	পাঁচগাঁ	
৯৬	যোগেশচন্দ্র ঘোষ (বি.এল)	কয়কীর্তন	
৯৭	রাজেন্দ্রনাথ দত্ত	চিত্রকোট	
৯৮	হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	চিত্রকরা	
৯৯	রাধাশ্যাম রায় (বি.এ)	আবীরপাড়া	
১০০-১০১	উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কুকুটিয়া	
	(স্ত্রী) বিমলাসুন্দরী		
১০২	জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু	কুচিয়ামারা	
১০৩	দক্ষিণাচরণ তপাদার (বি.টি)	বিবন্দী	
১০৪	উপেন্দ্রচন্দ্র কর (ডাক্তার)	বাসাইল	পাটামারি (গোয়ালপাড়া)
১০৫	সুরেন্দ্রকুমার রায়	গোবিন্দপুর	
১০৬	হীরালাল গাঙ্গুলী (বি.এ)		
	[নারায়ণগঞ্জ]		
১০৭	অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত	ভাটপাড়া	ময়মনসিংহ
১০৮	সতীশচন্দ্র গুহরায় (বি.এ)	নওয়াগাঁ	
১০৯-১১০	ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত (বি.এ)	দুপতারা	ডুরাণ্ডা, রাঁচি
	(স্ত্রী) সুহাসিনী		
১১১-১১৪	তারকনাথ রায়চৌধুরী	বালিয়াহানি	
	(স্ত্রী) প্রসন্নময়ী		
	(কন্যা) হিরণবালা		
	(জামাতা) আশুতোষ ভট্টাচার্য	চক্রধা	
১১৫	বীরেন্দ্রমোহন চন্দরায় (বি.এ)	সোনারগাঁ	
১১৬	কৃষ্ণদাস দাস	পানাম	
১১৭	অমৃতলাল দত্ত	নুরালাপুর	
১১৮	সুরেন্দ্রনাথ রায়	নূতন চাষাড়া	
১১৯	যোগেন্দ্র ধর	নারায়ণগঞ্জ	

[সদর]

১২০-১২১	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বি.ই) (স্ত্রী) রাজবালা	২১৭, রামকৃষ্ণমিশন রোড, ঢাকা
১২২	ধীরেন্দ্রচন্দ্র সোম	৫৩, কায়েতটুলি, ঢাকা
১২৩	প্রহ্লাদচন্দ্র রায়	২০৯, লালমোহন শঙ্খনিধি ষ্ট্রীট, "
১২৪-১২৫	নীরদরঞ্জন মজুমদার (মাতা) সুশীলাসুন্দরী	রামকৃষ্ণপুর
১২৬	মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	ফরিদাবাদ
১২৭	ললিতমোহন সাহা (বি.এল)	সাভার
১২৮-১২৯	জিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (এম.এ) (স্ত্রী) উষাবালা	মান্দাইল
১৩০	সুরেন্দ্রমোহন বসু	পূর্বদী
১৩১	মাখনলাল সরকার	কোণ্ডা
১৩২	শরৎকামিনী রায়	বল্সতা
১৩৩	রাজলক্ষ্মী মিত্র	শুভাঢ্যা

[মাণিকগঞ্জ]

১৩৪	লাবণ্যপ্রভা গুপ্ত	মত্ত
১৩৫	প্রিয়ম্বদা গুহরায়	সিমুলিয়া
১৩৬	যোগেন্দ্রনাথ রায়	তিল্লী
১৩৭	মুকুন্দবিহারী সাহা (এম.এ)	সিঙ্গাইর
১৩৮-১৩৯	অক্ষয়কুমার রায় (স্ত্রী) আমোদিনী	বালিয়াকান্দি
১৪০-১৪১	অবিনাশচন্দ্র বসু (স্ত্রী) শরৎকামিনী	পাঠানকান্দি
১৪২	গগনচন্দ্র দত্ত	"
১৪৩	উপেন্দ্রনাথ ঘোষ	খেরুপাড়া
১৪৪	হেমচন্দ্র দত্ত (বি.এ)	"
১৪৫-১৪৬	পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (স্ত্রী) সুশীলাবালা	নবগ্রাম
১৪৭	কুসুমকুমারী দেবী	মাইজখাড়া ৩/৩এ কামারডাঙ্গা, ইটালি

১৪৮-১৫০	অভয়শঙ্কর রায়	তেওতা
	(স্ত্রী) নিরুপমা	৪৫, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা
	(ভ্রাতৃবধূ) হেমপ্রভা	
১৫১	গিরিজানন্দ রায়চৌধুরী	শ্রীবাড়ীবট্যা
১৫২	বিনোদিনী [পদবী অজ্ঞাত] ঢাকা জেলায় রায়পুর গ্রামে বাড়ি ; 'কিনু' নামে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় উল্লেখ আছে।	
১৫৩	উপেন মজুমদার, শিলচরে টেলিগ্রাফ-মাস্টার, তারপাশা হইতে নৌকা করিয়া বাড়ি যাইতে দেখা গিয়াছে।	

জেলা—ফরিদপুর

১-১৬	স্বামী অব্যয়ানন্দ, অশেষানন্দ, আত্মপ্রকাশানন্দ, আদীশ্বরানন্দ, জ্ঞানেশানন্দ, প্রজ্ঞানানন্দ, বিনয়ানন্দ, ভূধরানন্দ, মুক্তানন্দ, মেঘেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ (দুর্গানাথ), সত্যানন্দ, সন্তোষানন্দ, সুখাত্মানন্দ, স্বপ্রকাশ আরণ্য (কুঞ্জবিহারী ধর)। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ।	

[গোপালগঞ্জ]

১৭	জিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরতা	মটবাড়ী
১৮-১৯	পঞ্চানন ব্রহ্মচারী	পশ্চিমপাড়া
	(পুত্র) জ্ঞানরঞ্জন	
২০	সুরেশচন্দ্র চৌধুরী	ডহরপাড়া
২১-২২	হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	কাঁশাতলী
	(ভ্রাতা) উপেন্দ্রনাথ	
২৩	সুরেন্দ্রনাথ সেন	"
২৪-২৫	নির্মলা সেন	পিঞ্জরী
	(পুত্র) দেবেন্দ্রনাথ	
২৬	মাখনলাল দত্ত	ননীক্ষীর
২৭	প্রফুল্লমুখী বসু	ওলপুর
২৮	লালবিহারী সেন (ডাক্তার)	কাজুলিয়া
২৯-৩১	শোকহরণ দাশগুপ্ত	খান্দারপাড়া
	(স্ত্রী) সুমতিবালা	
	(সুমতির দিদি) সরযূবালা সেনগুপ্ত	কাশী
৩২	জনৈক (পদবী—দে)	দেওড়া

[মাদারিপুর]

৩৩	বিধুভূষণ ঘটক	বিঝারি	
৩৪-৩৬	শ্রীশচন্দ্র ঘটক	”	রাঁচি
	(স্ত্রী) সুরমাসুন্দরী		
	(দিদি) হরবিহারী		
৩৭	যতীন্দ্রমোহন ঘোষাল	মহীসার	
৩৮-৩৯	নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত (বি.এল)	পালং	
	(স্ত্রী) সরযূবালা		
৪০	অখিলচন্দ্র দাশগুপ্ত	”	
৪১-৪২	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (বি.এসসি)	”	
	(স্ত্রী) আশালতা		
৪৩	নগেন্দ্রচন্দ্র পাল	”	
৪৪	আমোদিনী রায়	জপসা	
৪৫	নগেন্দ্রনাথ পাল	বালুচরা	
৪৬	মোক্ষদাচরণ গুহ (বি.টি)	এড়িকাঠি	
৪৭	হরবিলাস দেব	সারিস্তাবাদ	
৪৮	সুরেন্দ্রনাথ দেব	”	
৪৯	প্রফুল্লচন্দ্র সেন	ধামারণ	
৫০-৫১	কুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায় (বি.এ)	খালিয়া	
	(স্ত্রী) লাবণ্যময়ী		
৫২	যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস	সালধ	
৫৩	বিনোদবিহারী শীল	কাগদি	
৫৪	শশধর মজুমদার (বি.টি)	সেনদিয়া	৪৩বি, বালিগঞ্জ প্লেস
৫৫	প্রভাতচন্দ্র দাস	বীরমোহন-মাইজপাড়া	
৫৬	প্রভাতচন্দ্র দে	বিনতিলক	
৫৭	পার্বতীচরণ শীল	কাঠগুলি	
৫৮	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কনকসার	

[সদর]

৫৯	নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ফরিদপুর	
৬০	যামিনীকান্ত নাগ	কানাইপুর	
৬১	মন্মথনাথ বসু (বি.এল)	আলগী	

৬২	সতীন্দ্রমোহন বসু (এম.এ, বি.এল)	”	যাদবপুর কলোনী
৬৩	গিরিবালা ঘোষ	কালীনগর	কাশী
৬৪	পূর্ণচন্দ্র শেঠ		

জেলা—বাখরগঞ্জ

১-১১ স্বামী অরূপানন্দ, কালিকানন্দ (রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, দক্ষিণেশ্বর), গিরিশানন্দ, পরমানন্দ (বসন্ত), প্রবুদ্ধানন্দ, ভূমানন্দ, মনীষানন্দ, মোক্ষানন্দ, রামানন্দ, ব্রহ্মচারী সূর্যকুমার, ব্রজদাস বাবাজী।

[সদর]

১২-১৩	সুরেন্দ্রকুমার সেন (ডাক্তার)	বরিশাল	
	(স্ত্রী) ইন্দুবালা		
১৪	বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত	”	
১৫-১৬	প্রেমানন্দ দাশগুপ্ত	”	
	(স্ত্রী) মনোরমা		
১৭	সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী	বার্থী	
১৮	নগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা	”	বার্ণপুর
১৯	কুঞ্জলাল গুহঠাকুরতা	”	
২০	অবনীমোহন গুহ	দেহেরগতি	
২১	শরৎচন্দ্র বসু	দেহেরগতি	
২২	সতীশচন্দ্র ঘোষ	বাঁকাই	
২৩	অনন্তকুমার দাশগুপ্ত	গৈলা	
২৪	দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	”	
২৫-২৬	আশুতোষ সেনগুপ্ত (বি.এ)	ভারুকাবী	
	(স্ত্রী) অমিয়বালা		
২৭	রাধিকারঞ্জন সেনগুপ্ত	”	
২৮	অমৃতলাল দাশগুপ্ত (কবিরাজ)	”	
২৯	গোলাপকুমারী সোমদ্দার	সুন্দরদী	
৩০	হরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (কবিরাজ)	নলচিড়া	
৩১-৩২	অবিনাশচন্দ্র গুহ	অভয়নীল	
	(স্ত্রী) লাবণ্যপ্রভা		
৩৩	শশিকুমার বসু	”	

৩৪	বিজয়মঙ্গল রায়	পিপলিতা	
৩৫	হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাদলপাড়া	
৩৬	মতিলাল বিশ্বাস	দুর্গাপুর	
৩৭	কুসুমকুমারী বসু	রৈভদ্রদী	
৩৮	অতুলচন্দ্র রায় (বি.এ)	বাসণ্ডা	
	[পিরোজপুর]		
৩৯	কৈলাসকামিনী রায়	নরোত্তমপুর	
৪০	সতীশচন্দ্র রায়	”	
৪১	ধীরেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা (বি.এ)	বানারিপাড়া	
৪২	মনোমোহিনী বিশ্বাস	সাতবাড়িয়া	
৪৩	মনোরঞ্জন বিশ্বাস	”	
৪৪-৪৫	কামিনীকুমার উকিল (স্ত্রী) চারুবালা	নৈকাঠি	
৪৬	উপেন্দ্রনাথ দত্ত	জলাবাড়ী	কাশী
৪৭	সুরেন্দ্রনাথ রায় (ডাক্তার)	বাইশারী	

জেলা—পাবনা

১-৪ স্বামী প্রণবানন্দ, বিদেহানন্দ, মুক্তেশ্বরানন্দ। ব্রহ্মচারী শত্রুঘ্ন (অতুল)।

	[সিরাজগঞ্জ]	
৫-৭	সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক (বি.এ) (স্ত্রী) সরযূবালা (ভ্রাতা) যতীন্দ্রনাথ	কানসোনা
৮	ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক	কানসোনা
৯	শচীন্দ্রনাথ ভৌমিক	শক্তিপুর
১০-১২	ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল (স্ত্রী) নীহারবালা (ভাগিনেয়) সত্যকুমার রায়	সলপ
১৩-১৪	নিত্যনিরঞ্জন সান্যাল (ভ্রাতা) সত্যরঞ্জন	”
১৫	শ্রীশচন্দ্র সরকার	
১৬	হেমন্তকুমার সরকার (বি.এ)	সমাজ

১৭	হীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (এম.এ)	লাহিড়ীমোহনপুর	
১৮-২০	অবিনাশচন্দ্র রায়	মূলকান্দি	
	(দুই ভ্রাতা) প্রফুল্লকুমার, বিরাজমোহন		
২১	সারদাকিঙ্কর রায় (ডাক্তার)	সিরাজগঞ্জ	
২২-২৫	কালীপদ রায় (বি.এ)	বাগবাটী	সিরাজগঞ্জ
	(স্ত্রী) সুরমা		
	(পুত্র) সুধীরচন্দ্র		
	ইন্দুবালা রায়		
২৬	যতীন্দ্রনাথ রায়	রাণীগ্রাম	
২৭-২৮	নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	"	
	(স্ত্রী) সাবিত্রী		
২৯	সাধুচরণ কর্মকার	মাকরকোলা	

জেলা—রাজশাহী

১-২	শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন লাহিড়ী	রাজশাহী	
	(স্ত্রী) ননীবালা		
৩-৪	বিভূতিভূষণ মৈত্র	পুঁটিয়া	৪, চৌষট্টিযোগিনী
	(স্ত্রী) ক্ষীরোদবাসিনী		ঘাট, কাশী

জেলা—কুচবিহার

১	রাধাগোবিন্দ রায়	কুচবিহার
২	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"
৩	ফণিভূষণ গুহ মজুমদার (বি.এ)	"

জেলা—দিনাজপুর

১-২	অবিনাশচন্দ্র সেন	দিনাজপুর
	(স্ত্রী) চারুবালা	
৩-৪	ললিতচন্দ্র সেন	"
	(কন্যা) ইন্দুমতী সেন	
৫	কামিনীসুন্দরী গুপ্ত	"

জেলা—মালদহ

১	স্বামী আত্মানন্দ	
২	ব্রহ্মময়ী শুকুল	হরিশ্চন্দ্রপুর
৩	গৌরীপ্রসাদ শুকুল	"

জেলা—নদীয়া

১-৫ স্বামী অনন্তানন্দ, দয়ানন্দ, দিব্যানন্দ, মাধবানন্দ, সিদ্ধানন্দ।

[কুষ্টিয়া]

৬	ভূপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক	জগতী	গলসী, বর্ধমান
৭	অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস (মোক্তার)	দুধকুমড়া	
৮	অনুকূলচন্দ্র সান্যাল (এম.এ, বি.এল)	সোদকী	
	[মেহেরপুর]		
৯	ফণিভূষণ সান্যাল	ধোড়দহ	গণকবাঁদি, মেদিনীপুর
১০	গৌরীকান্ত বিশ্বাস	কুল্যাগ্রাম	ভুরাণ্ডা, রাঁচী
১১	শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস	যোগীনদা	
	[সদর]		
১২	পাঁচুগোপাল মল্লিক (এম.এ)	শিবনিবাস	
১৩-১৪	কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	মুড়াগাছা	
	(স্ত্রী) সুকুমারী		
১৫-১৬	মহেন্দ্রনাথ শী	নবদ্বীপ	
	(স্ত্রী) লক্ষ্মী		
	[রাণাঘাট]		
১৭	তমালিনী দেবী	শান্তিপুর	
১৮	জনৈক (পদবী—গোস্বামী)	"	
১৯-২০	আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (সস্ত্রীক)	"	

জেলা—মুর্শিদাবাদ

১-৩	ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বি.ই)	বহরমপুর	
	(স্ত্রী) সুশীলাবালা		
	(ভাজ) মেনকা		
৪-৫	পুণ্ডরীকাক্ষ বসু	"	
	(স্ত্রী) প্রভাবতী (শশিভূষণ ঘোষের ১মা কন্যা)	"	
৬	কালীদাসী মিত্র	"	
৭-৮	পূর্ণবাবু (সস্ত্রীক)		খোঁড়াপা কায়স্থ জমিদার

জেলা—খুলনা

১ স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ

[সদর]

২	দ্বিজেন্দ্রলাল সেন (এম.বি)	খুলনা	
৩	পুলিনবিহারী দাশগুপ্ত (বি.এ)	সেনহাটি	
৪-৬	যতীন্দ্রনাথ ঘোষ	মহেশ্বরপাশা	ডুরাণ্ডা, রাঁচী
	(স্ত্রী) ইন্দুবালা		
	(দিদি) নগেন্দ্রবালা মিত্র	রাড়ুলী	

[বাগেরহাট]

৭-৮	উপেন্দ্রনাথ দত্ত (রায়সাহেব)	কচুয়া	
	(ভ্রাতা) বীরেন্দ্রনাথ		
৯	ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী	শ্রীপুর-বনগ্রাম	
১০	প্রমোদাচরণ সেনগুপ্ত	ভট্টপ্রতাপ	
১১	মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী (কবিরাজ)	মূলঘর	

জেলা—যশোহর

১-৫ স্বামী অম্বানন্দ (সুরীন), কমলেশ্বরানন্দ, গোকুলানন্দ, প্রাণাত্মানন্দ, বাসুদেবানন্দ।

[নড়াল]

৬	সতীশচন্দ্র মজুমদার	ইৎনা	
৭-৮	নলিনীকান্ত বসু	দীঘলিয়া	
	(স্ত্রী) চপলাবালা		
৯-১০	মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত (এম.এ, বি.এল)	কালিয়া	
	(স্ত্রী) কুন্তলিনী		
১১	জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (এম.বি)	”	১, রামকমল সেন লেন, কলি:
১২	জ্যোতির্ময়ী বসু	শ্রীধরপুর	

[মাগুরা]

১৩	রমেশচন্দ্র সরকার (বি.এ)	আটকবানা	

[সদর]

১৪-১৫	দুর্গাপদ ঘোষ (এম.বি)	বাসুরিয়া	
	(স্ত্রী) নিরুপমা	”	কাশী
১৬	সুশীলকুমার সরকার	পাজিয়া	সম্বলপুর

[বনগাঁ]

১৭	অমূল্যচরণ বসু	সামন্তা
১৮	অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস	ফতেপুর
১৯	শিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	মহেশপুর
২০	অবিনাশচন্দ্র মজুমদার	"
২১	প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার (বি.এ)	"
২২	অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য	যশোহর

জেলা—চব্বিশ পরগনা

১-৬ স্বামী অপর্ণানন্দ, কালিকানন্দ (আশ্রম ঃ মুথাডাঙ্গা, আরামবাগ), ধীরানন্দ, প্রবোধানন্দ, হরানন্দ। ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথ।

[ব্যারাকপুর]

৭	কিরণশশী দেবী	দক্ষিণেশ্বর
৮	মণিলাল ঘোষাল	বেলঘরিয়া
৯-১১	শৈলবালা দেবী (তারকনাথ মুখুজ্যের স্ত্রী)	"
	(দুই পুত্রবধূ) নির্মলা, শিবরানী	
১২-১৪	ঠাকুরচরণ মুখোপাধ্যায়	সোদপুর
	(স্ত্রী) ইন্দুমতী	
	(পুত্র) বিভূতিকুমার (বি.এ)	
১৫	হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী	"
১৬	চারুবালা সরস্বতী	আগরপাড়া
১৭	শৈলজামোহন রায়চৌধুরী	নিমতা
১৮	নির্মলা ঘোষ	সুখচর
১৯	মনোমোহন গাঙ্গুলী	খড়দহ
২০-২১	প্রতিভাময়ী দেবী	খড়দহ, কুলীনপাড়া
	(ভগিনী) গৌরীবালা	বারাসত, হরিতলা
২২	গৌরহরি ভট্টাচার্য (এম.ডি, হোমিও) ভাটপাড়া	৩৭ কলেজ রো, কলিঃ

[বসিরহাট]

২৩	বঙ্কিমচন্দ্র বসু	আড়বালিয়া

২৪-২৯	চমৎকারিণী চৌধুরী	টাটরা
	(জা) শৈলবালা	
	শরৎকুমারী চৌধুরী	”
	সরোজিনী চৌধুরী	”
	(কন্যা) সুষমা বসু	পাইকপাড়া
	নীরদবাসিনী ঘোষ (কেনা)	

[ডায়মন্ড হারবার]

৩০	প্রবোধচন্দ্র দে	বোড়াল
৩১	মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	কুন্দরালী
৩২-৩৩	অমরনাথ ভট্টাচার্য	বারুইপুর
	(ভ্রাতা) সুনীতনাথ	
৩৪	রামহরি চট্টোপাধ্যায় (ডাক্তার)	জয়নগর
৩৫	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	লাঙ্গলবেড়িয়া
৩৬	গোঁসাইদাস চক্রবর্তী	”
৩৭	নরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (এম.এ, বি.এল)	হরিনাভি
৩৮-৪৫	রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বি.এল)	৬৫ বাজার রোড, বেহালা
	স্ত্রী ও দুই কন্যা	
	(তিন পুত্র) বিধুভূষণ (বি.এল)	
	শশিভূষণ (ডাক্তার)	
	মোহিনীমোহন (বি.এল)	
	বিধুভূষণের স্ত্রী অনুপমা	
৪৬	সুশীলকুমারী দে	হরিসভা স্ট্রীট, খিদিরপুর
৪৭	বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	ফুটিগোদা

কলিকাতা

১-১৪	স্বামী অভেদানন্দ, অসঙ্গানন্দ, ওঁকারানন্দ, ওঁকারেশ্বরানন্দ, কালিকানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, নির্ভয়ানন্দ, প্রকাশানন্দ, বলদেবানন্দ, বিরজানন্দ, যোগানন্দ, শ্যামানন্দ, শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) [পরে উল্লিখিত ক্রঃ সঃ ১০১], ব্রহ্মচারী নন্দদুলাল, ব্রহ্মবাদী (বঙ্কুবাবু, সাবরেজিস্ট্রার ছিলেন)।
১৫	দুর্গা দেবী (দুর্গাপুরী দেবী, শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম)

১৬	সরলা দেবী (প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা, শ্রীসারদা মঠ)	
১৭-২২	নগেন্দ্রবালা ঘোষ (শশিভূষণ ঘোষের স্ত্রী)	৫২, রামকান্ত বসু স্ট্রীট
	(পুত্র) সুশান্তকুমার (পাকা)	
	(কন্যাত্রয়) সন্তোষিণী সিংহ	
	সুহাসিনী বসু	
	রাধারানী হালদার	
	(পুত্রবধূ) নীহারবালা	
২৩-২৯	নিত্যানন্দ বসু	৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীট
	(স্ত্রী) কমলা	
	রামকৃষ্ণ বসু	
	(স্ত্রী) সুশীলাবালা	
	(কন্যা ২য়া) মাধবীলতা কর	
	(কন্যা ১মা) মঞ্জুলালী মিত্র	
	(১মার স্বামী) রবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	১৯ডি নীলমণি মিত্র স্ট্রীট
৩০-৩৬	কৃষ্ণময়ী রায়চৌধুরী (বলরাম বসুর ২য়া কন্যা)	
	(কন্যা ১মা) রাধারানী বসু	৫০, টার্ফ রোড
	(পঞ্চকন্যা) উষারানী বসু,	
	রত্নমালা বসু, বিমলা বসু,	
	কমলা ঘোষ, শিবরানী মিত্র	
৩৭	ইন্দুবালা ঘোষ (ভুবনমোহিনীর কন্যা)	
৩৮-৪০	অনিলাবালা, প্রমীলাবালা বসু	৫৮বি রামকান্ত বসু স্ট্রীট
	শৈবলিনী সরকার (চুনিলাল বসুর পুত্রবধূ ও কন্যা)	
৪১-৪২	প্রবোধচন্দ্র বসু	৫৯/২, রামকান্ত বসু স্ট্রীট
	(স্ত্রী) লীলাবতী	
৪৩-৪৪	নরেশচন্দ্র ঘোষ	”
	(মাতা) রাজবালা	
৪৫	উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২/১ রামকান্ত বসু স্ট্রীট
৪৬	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)	১৩, বোসপাড়া লেন
৪৭	প্রভাবতী সান্যাল	২০, বোসপাড়া লেন
	বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের স্ত্রী	
৪৮	প্রফুল্লমুখী দেবী	২৭, বোসপাড়া লেন
৪৯	ভবানী দেবী (টপা)	বোসপাড়া

৫০	মানবকৃষ্ণ মিত্র (তেজচন্দ্র মিত্রের পুত্র)	বোসপাড়া
৫১	অক্ষয়কুমার মিত্র (ডাক্তার)	”
৫২-৫৩	ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	”
	(স্ত্রী) প্রসাদী	
৫৪	মহামায়া দে	৫, হরলাল মিত্র লেন
৫৫	প্রবোধবালা মিত্র	২, বৃন্দাবন পাল বাইলেন
৫৬	নরেশনন্দিনী দেবী	রাজবল্লভ পাড়া
৫৭	চপলা ঘোষ	৫/৫এ বীরচাঁদ গোঁসাই লেন
৫৮-৬০	কিরণচন্দ্র দত্ত	১, লক্ষ্মীদত্ত লেন
	সুধাংশুমোহন দত্ত	
	(ভ্রাতা) বিভূতিভূষণ	
৬১-৬২	পূর্ণচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী	শ্যামবাজার
	কান্তিচন্দ্র ঘোষ (বি.এল)	
৬৩-৬৪	অঘোরনাথ ঘোষ (এম.বি)	পি ২০, নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট
	(স্ত্রী) সুখবালা	
৬৫-৭০	মহামায়া মিত্র	২০/১ শ্যামপুকুর লেন
	হরিপদ ঘোষের (স্ত্রী) সুবর্ণবালা	”
	হিরণ্ময়ী ঘোষ	” সিউড়ী
	সরযূবালা, মৃণালিনী	৩১, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
	কালীপদ ঘোষের পুত্রবধূ	
৭১	অশোককৃষ্ণ দেব	শোভাবাজার রাজবাটী
৭২-৭৩	শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় (এম.বি)	পি-৬৯, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট
	(স্ত্রী) গৌরীপ্রভা	
৭৪-৭৫	নারায়ণচন্দ্র বসু (ডাক্তার)	৩৭/২, খেলাতবাবু লেন, টালা
	(স্ত্রী) চণ্ডীবালা	
৭৬	বিশ্বেশ্বরী মিত্র	২/১, শিকদার বাগান স্ট্রীট
৭৭-৮৩	ভূপেন্দ্রকুমার বসু (এম.এ, বি.এল)	৩৭, শিকদার বাগান স্ট্রীট
	(স্ত্রী) নন্দরানী	
	(ভগিনী) প্রিয়বালা চৌধুরানী	
	নরেন্দ্রকুমার (বি.এল)	
	(স্ত্রী) নীহারবালা	

	বীরেন্দ্রকুমার (বি.এ)	৩৬, পাইকপাড়া রো	
	(স্ত্রী) সরোজিনী		
৮৪-৮৭	রাজলক্ষ্মী ঘোষ	৬, চালতাবাগান লেন	
	(বধূত্রয়) সুশীলবালা,		
	বীণাপাণি, শিবরানী		
৮৮-৮৯	গোপালচন্দ্র দাস (সস্ত্রীক)	ডাফ্স্ট্রীট	
৯০	সরযূবালা সেন	৩৪বি, সরকার লেন	
৯১	যদুনাথ দে	১৫৮সি, আপার সার্কুলার রোড	
৯২	আশুতোষ মিত্র	১৬৪, আপার সার্কুলার রোড	
৯৩-৯৪	শরৎসুন্দরী সরকার	১৭৭, আপার সার্কুলার রোড	
	নির্ঝরিণী সরকার	১৮বি মোহনলাল স্ট্রীট	
৯৫-৯৬	প্রভাসচন্দ্র মিত্র	২৩১/৪ডি, আপার সার্কুলার রোড	
	(স্ত্রী) সুশীলাবালা		
৯৭-৯৯	শচীন্দ্রনাথ বসু (এম.বি)	২০, বলাই সিংহ লেন	
	(স্ত্রী) সরলাবালা		
	(ভগিনী) মলিনাপ্রভা ঘোষ	৩, পঞ্চানন ঘোষ লেন	
১০০	অনন্তকুমার রায় (এম.এ)	পঞ্চানন ঘোষ লেন	শেষজীবনে সন্ন্যাসী
১০১-১১৩	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (এম.এ)	১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন	
	(স্ত্রী) নিকুঞ্জ দেবী		
	(ভগিনী) কৃষ্ণকুমারী		
	(পুত্র ১) প্রভাসচন্দ্র গুপ্ত		
	(পুত্রবধূ) কমলিনী		
	(পুত্র ২) চারুচন্দ্র		
	(কন্যা ১) সরোজিনী সেন		
	(কন্যা ২) মৃণালিনী মল্লিক		
	(দৌহিত্র) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক (বি.এ)		
	(কন্যা ৩) মানময়ী রায়		
	(জামাতা) যোগেন্দ্রনাথ রায় (মোক্তার) হুগলী		
	(কন্যা ৪) রাধারানী রায়		
	নিকুঞ্জ দেবীর ভগিনী কৃষ্ণকুমারী		

১১৪	প্রফুল্লকুমারী বসু	১/১, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন
১১৫-১১৯	সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত (সস্ত্রীক)	মসজিদবাড়ি স্ট্রীট
	(মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের দাদা)	
	গৌরগোবিন্দ গুপ্ত (এম.এ)	১০০বি, মসজিদবাড়ি স্ট্রীট
	(মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের পুত্র)	
	(মাতা) ভগবতী	
	অশোককুমার গুপ্ত	
১২০	নিবারণচন্দ্র দত্ত	আহিরীটোলা
১২১	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	নিমু গোস্বামী লেন
১২২	অক্ষয়কুমার শীল	২৪/১ শঙ্কর হালদার লেন
১২৩-১২৪	শ্রীশচন্দ্র মতিলাল	১৮বি, দুর্গাচরণ পিথুরী লেন
	(স্ত্রী) ধরাসুন্দরী	
১২৫	উপেন্দ্রনাথ সরকার (বি.এ)	চাঁপাতলা সীতারামপুরে শিক্ষক ছিলেন।
১২৬	খেলাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৯, সার্পেন্টাইন লেন
১২৭-১২৮	অতুলকৃষ্ণ দাস	১২, সার্পেন্টাইন লেন
	(ভ্রাতা) নগেন্দ্রকৃষ্ণ	
১২৯	বীণাপাণি চট্টোপাধ্যায়	৩, মদন বড়াল লেন
১৩০	বিপিনবিহারী দে	১০, মদন বড়াল লেন
১৩১	সুরমাসুন্দরী বসু	৬৪, রাখাল ঘোষ লেন
১৩২	পঙ্কজিনী মিত্র	৫, ডিহি এন্টালী রোড
১৩৩	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	এন্টালী, দিল্লীতে চাকুরি করতেন।
১৩৪-১৩৬	ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (সস্ত্রীক)	ডিক্সন লেন
	(ভগিনী) সরস্বতী	
১৩৭	চারুশীলা (সন্ন্যাসিনী)	ভবানীপুর
১৩৮	রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ভবানীপুর
১৩৯	যদুপতি চট্টোপাধ্যায়	৭৫, ল্যান্সডাউন রোড
১৪০-১৪২	জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল (এম.বি)	
	(১মা স্ত্রী) হেমপ্রভা	১২২ বি, ল্যান্সডাউন রোড
	(২য়া স্ত্রী) সুরূপাসুন্দরী	
১৪৩	বিজয়কৃষ্ণ বসু	১০, ল্যান্সডাউন প্লেস

১৪৪	রাজলক্ষ্মী বসু	১০, আশু বিশ্বাস রোড
১৪৫-১৪৬	দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার) সাবিত্রী দেবী	ভবানীপুর শিবপুর, হাওড়া
১৪৭	তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২২, গোবিন্দ ঘোষাল লেন
১৪৮-১৪৯	লক্ষ্মীপ্রিয়া দত্তচৌধুরী	৮, অন্নদা ব্যানার্জী লেন
	(ভগিনী) রানীবালা দত্ত	১৮০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
১৫০	শশিভূষণ দাস	১২৭/২/১, মনোহরপুকুর রোড
১৫১	সতীশচন্দ্র দাস	দর্জিপাড়া, স্বদেশী যুগে যোগেন ঠাকুরের দলের
১৫২	কানাই (ব্রাহ্মণ)	বাবুরাম ঘোষ লেন ”
১৫৩	চুনিলাল ঘোষ	বাগবাজার ”
১৫৪	আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজকুমারের গৃহশিক্ষক)	আসাম-গৌরীপুর
১৫৫	ডাঃ হারাণ ব্যানার্জ্জির স্ত্রী	বালিগঞ্জ
১৫৬	বটকৃষ্ণ ঘোষ	মঠের বড়দা
১৫৭	অ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ান মহিলা	
১৫৮	কুসুমকুমারী আইচ	২৪ সাহানগর রোড
১৫৯	হেমন্তবালা বসু	৪১ রাজকৃষ্ণ ঘোষাল রোড, কসবা

হাওড়া

১-৫ স্বামী কৃষ্ণানন্দ, পরানন্দ, ভাস্করানন্দ, শান্তানন্দ, সর্বেশানন্দ।

[সদর]

৬	সুষমাবালা ঘোষ (নবগোপাল ঘোষের পুত্রবধূ)	রামকৃষ্ণপুর
৭	বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	৫, যদু মুখার্জি লেন, বাজে শিবপুর
৮	ননীবালা দেবী	১৫, ভরপাড়া রোড, শিবপুর
৯	নারায়ণচন্দ্র রুদ্র	শিবপুর পুরী
১০	কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (এম.এ)	মাকড়দহ রোড, ব্যাঁটরা
১১-১৩	সুষমা দেবী (দুই ভাজ) প্রসাদময়ী, সুরমাসুন্দরী	১০/৭এ, সীতানাথ বসু লেন, সালকিয়া
১৪	জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	সীতানাথ বসু লেন, সালকিয়া
১৫-১৬	সন্তোষকুমার গাঙ্গুলী (মাতা) ফিরোজাসুন্দরী	বেলুড়

১৭	কৃষ্ণপ্রসন্ন কাঁড়ার	ঝিকরা	৮, রাজারাম দাস লেন, হাওড়া
১৮	শৈলেন্দ্রনাথ মণ্ডল		নিজবালিয়া
১৯	অনুপমা হালদার		ভাণ্ডারদহ
২০-২১	ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		আন্দুল
	(স্ত্রী) হরিমতী		
২২	শৈলবালা মান্না		জুজারসা

[উলুবেড়িয়া]

২৩-২৪	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	নওপাড়া
	(স্ত্রী) গুইবালা	
২৫	সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	গাজিপুর
	(এম.এ. পিএইচ.ডি)	৫৯বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা
২৬	কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়	গাজিপুর
২৭	বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী	মহিষামুড়ি

জেলা—মেদিনীপুর

১-১৪ স্বামী অমরেশানন্দ, কৈবল্যানন্দ, গৌরীশ্বরানন্দ, চিদানন্দ, ধর্মানন্দ, পরমেশানন্দ, প্রশান্তানন্দ, বৈরাগ্যানন্দ, ভজনানন্দ, মুকুন্দানন্দ, যাদবানন্দ, সনাতনানন্দ, ব্রহ্মচারী অদ্বৈতচৈতন্য, রামযদু।

[তমলুক]

১৫	রজনীকান্ত প্রামাণিক (বি.এল)	তমলুক
১৬	গিরিজাচরণ অধিকারী	”
১৭	হিমাংশুশেখর দাস	আসনান
১৮	গোপালচন্দ্র দাস	দক্ষিণময়না
১৯-২০	লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ	ছেনিয়াগড়
	(স্ত্রী) নগেনবালা	
২১	ভবসুন্দরী বক্সী	”
২২	তারাকিঙ্কর সিংহ (এম.এ, বি.এল)	”

[কাঁথি]

২৩	সিন্ধুনাথ পাণ্ডা	খাগড়াবনী

[সদর]

২৪-২৬	অক্ষয়কুমার সিংহ (মোক্তার)	মেদিনীপুর
	(পুত্রদ্বয়) হেমচন্দ্র, হরেন্দ্রকুমার	

২৭-২৮	যতীন্দ্রনাথ দাস (বি.এল)	"	
	(স্ত্রী) নীহারকুমারী		
২৯	প্রফুল্লকুমার মাইতি (বি.এল : শিক্ষক)	"	
৩০	সমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বি.এ)	"	
৩১	মিহিরচন্দ্র বড়াল	"	
৩২	মন্মথনাথ ভট্টাচার্য	মেদিনীপুর	
৩৩	মহিমচন্দ্র দত্ত (এম.এ, বি.এল)	"	
৩৪	রামপদ রায়	"	ঝাড়গ্রাম
৩৫-৩৬	পরেশচন্দ্র কর	"	
	(ভ্রাতা) প্রহ্লাদচন্দ্র		
৩৭	কমলা সান্যাল	"	(সোয়ান সাহেবের হাতা)
৩৮	প্রাণকৃষ্ণ পেট্যাল	"	(মাণিকপুর)
৩৯	জয়ন্তকুমার ঘোষ	"	এড়িয়ামারা
৪০-৪২	শিবদাস দোলই	টুর্ব্যাপাড়া	
	(কাকা) যতীন্দ্রনাথ		
	(ভাগিনেয়) ভূষণচন্দ্র পুইল্যা	দঁতাল-চাঁদাবিলা	
৪৩	অমরেন্দ্রনাথ রায়	গড়বেতা	
৪৪	শশিভূষণ রায়	"	
৪৫	মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য	"	
৪৬	ক্ষীরোদলাল তেওয়ারী	"	
৪৭	জ্যোতিশ্চন্দ্র পাঁড়ে	"	শালবনী
৪৮	হরলাল বিশ্বাস	আমলাগোড়া	

[ঘাটাল]

৪৯-৫২	নলিনবিহারী সরকার (ডাক্তার)	চন্দ্রকোণা	
	(স্ত্রী) দুর্গাদেবী, (মাতা) চমৎকারিণী,		
	(শ্যালক) হরিপদ সরকার	"	
৫৩-৫৪	কৃষ্ণকিশোর সরকার	"	শালবনী
	(পিসী) ভবরানী		
৫৫-৫৬	হরিনারায়ণ চক্রবর্তী	"	
	(ভগিনী) শবাসনা		

৫৭	অরবিন্দ হালদার	চন্দ্রকোণা
৫৮	বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ	গোপীনাথপুর
৫৯	রামসুধীর দে	জগন্নাথপুর
৬০-৬১	শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শিরোমণি)	নিমতলা
	(স্ত্রী) বিনোদিনী	
৬২	হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাসুদেবপুর খড়গপুর
৬৩	শশধর মুখোপাধ্যায়	পাইকমাঝিটা
৬৪	পতিতপাবন মণ্ডল	টুঙ্গি-বলরামপুর
৬৫	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (বি.টি)	রামচন্দ্রপুর
৬৬	প্রবোধচন্দ্র সিংহ	সয়লা
৬৭	লীলাবতী ঘোষ	যদুপুর

জেলা—হুগলী

১-১৬ স্বামী অবধূতানন্দ, গৌরবানন্দ, তত্ত্বানন্দ (গোবিন্দ), তন্ময়ানন্দ, নিত্যানন্দ (নেপালেশ্বর), নিশ্চলানন্দ, প্রজ্ঞানন্দ, বরদানন্দ, বিমলানন্দ, বেদানন্দ, বোধানন্দ, ভাগবতানন্দ, সংস্বরূপানন্দ। ব্রহ্মচারী প্রকাশ, গোবর্দ্ধন (ভট্টাচার্য, জনাই), প্রসন্নকুমার (শ্যামবাজার)।

[শ্রীরামপুর]

১৭	অনাথনাথ মিত্র	বাক্‌সা
১৮-১৯	সুধীরা বসু	জেজুর
	(বোনঝি) বাণী দেবী (ব্রহ্মচারিণী)	শ্রীসারদা আশ্রম, কলিকাতা
২০	গোকুলদাস দে (এম.এ)	মশাট
২১-২২	ফেলারাম ঘোষ	কলাছড়া
	(স্ত্রী) সুমতিবালা	
২৩	মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় (বি.এ)	পায়রাগাছা ১২/১এ নিরঞ্জন ব্যানার্জী লেন, শিবপুর
২৪	পাঁচকড়ি গাঙ্গুলী	জনাই
২৫	শশধর গাঙ্গুলী	"
২৬	কালিদাস দাস	"
২৭	শুইরাম নাগ	"

২৮-২৯	হরেরাম ঘোষ	আঁটপুর
	(স্ত্রী) অমলা	
৩০-৩১	বিদ্যুল্লতা ঘোষ	" ১, হেম কর লেন, কলিকাতা
	(জা) ইন্দুপ্রভা	হরিণধুকুড়ি, ঘাটশিলা
৩২	নির্মলা মিত্র (বিপিনবিহারী ঘোষের কন্যা)	
	[সদর]	
৩৩	যতীন্দ্রমোহন বসু	চন্দননগর (বৌবাজার)
৩৪	উপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	আকনা
৩৫	সতীশচন্দ্র পল্লে	"
৩৬-৩৭	কৃষ্ণকিশোর পাত্র	ত্রিবেণী
	(ভ্রাতা) ত্রিলোচন	
৩৮-৩৯	কেশবচন্দ্র নাগ (বি.এ)	গুড়াপ
	(বৌদি) তরুবালা	
	[আরামবাগ]	
৪০-৪২	প্রভাকর মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)	আরামবাগ
	(স্ত্রী) ব্রজবালা	
	(মাতা) বরদা	
৪৩	ত্রিলোচন নাথ (উকিল)	"
৪৪-৪৮	মণীন্দ্রভূষণ বসু (উকিল)	বায়ুগ্রাম
	(স্ত্রী) কৃষ্ণমানিনী	
	(মাতা) দাক্ষায়ণী	
	(ভগিনী) চারুশীলা সরকার	
	তারাপদ দত্ত	
৪৯-৫০	কুঞ্জবিহারী চিনে (সস্ত্রীক)	হাটবসন্তপুর
৫১	হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বি.এল)	বাতানল
৫২	শ্রীশচন্দ্র ঘোষ	মামুদপুর
৫৩	মন্দাকিনী রায়	নবাসন
৫৪	কৌতুকবালা রায়	"
৫৫-৫৬	লক্ষ্মণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"
	(স্ত্রী) তুলসীসুন্দরী	

৫৭-৫৮	রামকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	”	
	(স্ত্রী) সুরবালা		
৫৯	রাধামাধব দত্ত	”	
৬০	আশুতোষ পাঁজা	কিশোরপুর	
৬১	জিতেন্দ্রনাথ সরকার	গোঘাট	
৬২	বাসনাবালা নন্দী	কামারপুকুর	
৬৩	বনমালী মুখোপাধ্যায়	মণ্ডলগাঁতি	
৬৪	রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী	বাঘারবাড়	কোলাঘাট
৬৫	শ্যামদাস গোস্বামী	বেলভিহা	
৬৬-৬৭	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বি.এ)	শ্যামবাজার	
	(স্ত্রী) সুগন্ধবালা		
৬৮	মতিবালা দাসী	”	
৬৯	গোবিন্দচন্দ্র দাস	”	
৭০	অদ্বৈতচরণ দাস	”	
৭১	হৃষীকেশ নন্দী	কৃষ্ণগঞ্জ	
৭২-৭৩	দ্বিজবর মুখোপাধ্যায় (বি.এ)	”	
	(স্ত্রী) প্রভাবতী		
৭৪-৭৫	চন্দ্রকান্ত আদক (ভ্রাতা) অমূল্য	ডহরকুণ্ড	
৭৬-৭৮	শরচ্চন্দ্র মিত্র	তিরৌল	
	(স্ত্রী) নগেন্দ্রনন্দিনী		
	(ভ্রাতা) সত্যেশচন্দ্র (এল.এম.এস)		
৭৯-৮৩	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তিন ভাই :		
	রামভূষণ চক্রবর্তী	ইছাপুর	
	(স্ত্রী) মন্মথমোহিনী		
	নীরদভূষণ		
	(স্ত্রী) যামিনীবালা		
	ক্ষীরোদভূষণ		
৮৪-৯০	স্বামী সারদানন্দের চারভাই :		
	চারুচন্দ্র (স্ত্রী) নারায়ণী	দক্ষিণেশ্বর (বাচস্পতিপাড়া)	
	সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (এম.বি)	”	
	(স্ত্রী) আশালতা		

	নরেশচন্দ্র (বি.এসসি)	কসবা	বালিগঞ্জ
	(স্ত্রী) সরযূ		
	কেশবচন্দ্র		

জেলা—বাঁকুড়া

১-১৫ স্বামী ঈশানানন্দ, ঋতানন্দ (গগন), কেশবানন্দ, চন্দ্রেশ্বরানন্দ, তারকেশ্বরানন্দ, ধ্রুবানন্দ, পরমেশ্বরানন্দ, বিদ্যানন্দ, ভবেশানন্দ, মহাদেবানন্দ, মহেশ্বরানন্দ, সান্দ্রানন্দ, স্ব-স্বরূপানন্দ, হরিপ্রেমানন্দ। ব্রহ্মচারী বিনোদবিহারী (কোয়ালপাড়া)।

[সদর]

১৬-২১	বিভূতিভূষণ ঘোষ (বি.এ)	বাঁকুড়া	
	(দুই স্ত্রী) অমিয়বালা, কমলা		
	(ভ্রাতা) কিরীটিভূষণ (বি.এসসি)		
	শশীভূষণ ঘোষ (এম.এ)	”	রাঁচি
	(মাতা) সুবর্ণপ্রভা		
২২	রাজেন্দ্রনাথ দত্ত	বাঁকুড়া	
২৩-২৪	চিন্ময় মুখোপাধ্যায়	বাঁকুড়া	
	(ভ্রাতা) মন্মথ		
২৫	অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়	”	
২৬	বিরজাকান্ত মুখোপাধ্যায়	”	
২৭	কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়	”	
২৮	সনাতন চট্টোপাধ্যায়	”	
২৯	নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (এম.এ, বি.টি)	”	
৩০	যুগলচরণ মল্লিক	”	
৩১	রামতারণ দাস	”	
৩২	রাধানাথ কর্মকার	”	
৩৩-৩৪	নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উকিল)	”	(যুগীপাড়া)
	(স্ত্রী) মনোরমা		
৩৫	জয়চাঁদ দত্ত (বি.এল)	খাতড়া	
৩৬	অমূল্যরতন মিশ্র	ইঁদপুর	
৩৭	ফেলারাম গোস্বামী	দেউলী	
৩৮	নকুলচন্দ্র চন্দ	মলিয়ান	

৩৯	হংসেশ্বর মহান্তি	হিড়বাঁধ	
৪০	গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ	কন্যামারা	
৪১	করালীচরণ মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)	শীতলা	
৪২	বগলানন্দ নিয়োগী	বেলিয়াতোড়	
৪৩	প্রমথনাথ লাই (বি.এ)	”	
৪৪	পঞ্চানন ঘোষ	”	
৪৫	বিনয়কৃষ্ণ রায়	”	
৪৬	বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ	”	
	[বিষ্ণুপুর]		
৪৭-৫৪	সুরেশ্বর সেন	বিষ্ণুপুর	
	(স্ত্রী) শৈলবালা		
	(পুত্রদ্বয়) ভূপেশ্বর, রাজেশ্বর		
	(কন্যা) সত্যবতী পালিত		
	(দুই ভ্রাতা) গুণেশ্বর, মতীশ্বর		
	নির্মলাবালা		
৫৫-৫৬	মহীন্দ্রনাথ ঘোষ	”	
	(মাতা) রাধারানী		
৫৭	মাখনময়ী মণ্ডল	”	
৫৮	অমূল্যরতন চৌধুরী	”	
৫৯	গোষ্ঠবিহারী গরাই	”	
৬০	প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী (বি.এ)	বলরামপুর	বিষ্ণুপুর
৬১	অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ (বি.এ)	হররা	
৬২-৬৩	গোবিন্দমোহন মুখোপাধ্যায়	জোতবেহার	
	(ভ্রাতা) মনোমোহন		
৬৪-৬৭	ব্রজবালা সেন	বাজে ময়নাপুর	
	(অক্ষয়কুমার সেনের স্ত্রী)		
	(পুত্র) গোপালকিঙ্কর		
	(পুত্রবধূ) চণ্ডীবালা		
	(ভাগনে বৌ) শান্তবালা ঘোষ		

৬৮	উত্তমবালা বন্দ্যোপাধ্যায়	ময়নাপুর
৬৯	জ্যোতিশ্চন্দ্র বাড়ুই (বি.এ)	"
৭০	নারায়ণী মণ্ডল	রাধামাধবপুর
৭১	কুঞ্জবাসিনী দেবী	গাঁতি-কৃষ্ণনগর
৭২	রজনীকান্ত দে	কোতুলপুর
৭৩	রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"
৭৪-৭৫	ফকিরচন্দ্র মণ্ডল	কোয়ালপাড়া
	(স্ত্রী) সুশীলাবালা	
৭৬	হৃষীকেশ রায়	"
৭৭	নন্দরানী দত্ত	"
৭৮	প্রমীলা বসু	"
৭৯	প্রমীলাবালা মণ্ডল	"
৮০	ভোলাময়ী কোলে	"
৮১-৮৩	হরিহর ঘোষাল	"
	ইন্দুবালা ঘোষাল	
	কুসুমকামিনী দেবী	
৮৪	যুগলকিশোরী চৌধুরী	কোয়ালপাড়া
৮৫-৮৭	গোলোকচন্দ্র চৌধুরী	"
	(স্ত্রী) বিনোদবালা	
	(ভগিনী) যামিনীবালা	জয়রামবাটী
৮৮-৯১	জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	তাজপুর
	(স্ত্রী) কালীবালা	
	মন্মথনাথ	
	(স্ত্রী) রাধারাণী (রাধু)	জয়রামবাটী
৯২	সুশীলাবালা দেবী (মাকু)	তাজপুর
৯৩-৯৪	ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	জয়রামবাটী
	(স্ত্রী) প্রভাবতী	
৯৫-৯৬	সুবাসিনী দেবী	"
	(দিদি) কিরণবালা	শিহড়

৯৭-৯৯	বিহারীলাল ঘোষ	জয়রামবাটী
	(স্ত্রী) নগেন্দ্রবালা	
	(ভ্রাতৃবধূ) ভুবনমোহিনী	
১০০	আশুতোষ ঘোষ	"
১০১	সদুবালা বিশ্বাস	"
১০২	অমূল্যবালা মণ্ডল	"
১০৩-১০৫	শম্ভুনাথ রায়	জিবট্যা
	(স্ত্রী) বিন্দুবাসিনী	
	(ভ্রাতা) সজনীকান্ত (ডাক্তার)	
১০৬	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শাসপুর
১০৭	জলদবরণ মণ্ডল	খটনগর
১০৮	গঙ্গারাম মণ্ডল	পাঠিত-মহেশপুর
১০৯	রামভাবিনী রায়	ডোঙ্গানল
১১০	গোকুলচন্দ্র ঘোষ (বি.এসসি)	বিষ্ণুপুর
১১১	সুরেন্দ্রনাথ কর	"

জেলা—বর্ধমান

১-৬ স্বামী অসিতানন্দ, গঙ্গেশানন্দ, তপানন্দ, ধ্যানেশানন্দ, নির্বিশেষানন্দ (অমূল্য কাব্যতীর্থ), বিশুদ্ধানন্দ।

[সদর]

৭-৮	ভূদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	বর্ধমান
	(স্ত্রী) যতীন্দ্রবালা	
৯	মাখনবালা চট্টোপাধ্যায়	বাঘাড়
১০	পঙ্কজকুমার আইচ	"
১১	হংসেশ্বর নায়েক	নারচে-নপাড়া
১২	প্রভাসিনী দেবী	মানকর
১৩-১৪	প্রমথনাথ চেল	"
	(স্ত্রী) ভোলাময়ী	
১৫-১৬	আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	তালিত
	(স্ত্রী) নৃসিংহকুমারী	
১৭	পূর্ণচন্দ্র যশ	মধ্যমগ্রাম

[কাটোয়া]

১৮-১৯ খগেন্দ্রকৃষ্ণ রায় শ্রীখণ্ড বেলুড়
(স্ত্রী) সরযূবালা

[কালনা]

২০-২১ রামচন্দ্র মজুমদার কুমারপাড়া
(দিদি) ভগবতী

২২-২৩ অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঘনাপাড়া ২১/৪, গড়িয়াহাট রোড, কলিঃ
(স্ত্রী) মৃণালিনী

জেলা—বীরভূম

১ স্বামী গোপালানন্দ

২ ফকিরচাঁদ সাঁতরা

যাঁহাদের ঠিকানা জানা যায় নাই

১ রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক)

২ দিবাকর দে (রায় সাহেব) বঙ্গ পশুচিকিৎসা কলেজের সহ-অধ্যক্ষ

৩ নেপালচন্দ্র গুপ্ত পূর্ববঙ্গ ভাগা রেলস্টেশনে টেলিফোন বিভাগে কাজ করিতেন।

৪ মনোমোহন মিত্র যে-ব্রাহ্মণকন্যাকে শ্রীশ্রীমার কাছে পাঠান ('ভক্ত মনোমোহন')।

৫ অন্নপূর্ণার মার সঙ্গে এসে যে সুশ্রী মেয়ে দীক্ষা নেন ('শ্রীশ্রীমায়ের কথা')।

৬ বিষ্ণুপুর স্টেশনে দীক্ষিত হিন্দুস্থানী খালাসী

৭ বটুবাবু কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে ছিলেন

৮ রাজচন্দ্র স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্রে উল্লিখিত

জেলা—মানভূম

১ রাজেন্দ্রলাল দে পুরুলিয়া

২ যতীন্দ্রমোহন মিত্র (আই.এম.এস) " দেরাদুন

৩ সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বাগদা

৪ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় "

৫-৬ রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "
(ভ্রাতা) যোগেশচন্দ্র

৭-৯	অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	পুষ্ণা
	(স্ত্রী) শ্রীমতী (দিদি) ব্রজেশ্বরী	
১০	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)	,,
১১	প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	লাকরা

জেলা—বালেশ্বর

১	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	কোঠার
২	মুকুন্দমুরারি ঘোষের মাতা	ভদ্রক

জেলা—কটক

১-২	জগদ্বন্ধু মুখোপাধ্যায়	কটক	
	(স্ত্রী) রাজলক্ষ্মী দেবী		
৩	বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়	বহুগ্রাম	
৪	ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	,,	
৫	বৈকুণ্ঠনাথ দে	,,	
৬	শরৎকুমারী ঘোষ	,,	
৭-১০	হরিপ্রসাদ বসু	,,	
	(স্ত্রী) রতনবালা		
	রাধাপ্রসাদ বসু		
	(স্ত্রী) শশীবালা		
১১	হরিবল্লভ ঘোষ	জামালপুর	
১২	ব্রজনাথ মিশ্র	খণ্ডশাহী	
১৩	আকুল মিশ্র (কাব্যতীর্থ)	,,	কটক
১৪	উপেন্দ্রনাথ নন্দ	সিংহমাপুর	

জেলা—পুরী

১	স্বামী ভবেশ্বরানন্দ	
২	বৈষ্ণবচরণ পট্টনায়ক	ভুবনেশ্বর

কাশী

১	ব্রহ্মচারী নৃসিংহচৈতন্য (নীরেন)
২	হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (দাশু)

এলাহাবাদ

১	স্বামী কপিলেশ্বরানন্দ (লালমোহন)	
২	শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (এম-এ)	বাদশাহীমণ্ডী

৩-৪ নরেন্দ্রনাথ মিত্র (এম.এসসি)
(ভ্রাতা) সচ্চিদানন্দ মিত্র ,, মুসৌরী কলেজের অধ্যক্ষ

আলমোড়া

১ রুমা দেবী গার্বিয়ান

বোম্বাই

১ সোরাব মোদী (চিত্র-পরিচালক)
২ (দাদা) বারহাম্‌গোর মোদী

মধ্যপ্রদেশ

১ স্বামী জগদীশানন্দ

তামিলনাড়ু

১ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ (শঙ্কর)
২-৩ ভি. নারায়ণ আয়ার (এম.এ, এম.এল) মারে গেট রোড, আলোয়ার পেট, মাদ্রাজ
(স্ত্রী) সুন্দরী নারায়ণ আয়ার

কর্ণাটক

১ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ম্যাঙ্গালোর
২ স্বামী শ্রীবাসানন্দ (পূর্বাশ্রমে নারায়ণ আয়েঙ্গার) ব্যাঙ্গালোর
৩ স্বামী মোক্ষদানন্দ (মুদাপ্পা) পুন্নামপেট, কুর্গ
৪-৫ নারায়ণ আয়েঙ্গারের স্ত্রী কৃষ্ণমন্দিরম শঙ্করপুরম, ব্যাঙ্গালোর
(জ্যেষ্ঠা কন্যা) রঙ্গনায়কী
৬-৭ কনক ও শিবা শ্রীসা[illegible]মন্দির, [illegible]জার টাউন, ব্যাঙ্গালোর
৮ এম. রাজাগোপাল নাইডু [illegible], স্টো[illegible] স্ট্রীট, কলাসপালয়ম, ,,
৯ এন. বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার অফিসার-ইন-চার্জ, অবজারবেটরী, ,,
১০ এম. শ্রীরঙ্গম্মাল ১১৯, হোসা অগ্রহারম্, মহীশূর
১১ পি. আদিমূলম পিল্লে ফোরম্যান, ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, শিবসমুদ্রম

কেরল

১ স্বামী অম্বানন্দ (সি. মধুরম) বিবেকানন্দ আশ্রম
২ (ভ্রাতা) সি. দামোদর কাইমুট হাউস, পোঃ মাভেলিকারা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

১ স্বামী অতুলানন্দ (গুরুদাস)
২ ব্রহ্মচারী অমৃতানন্দ (মিঃ জনসন)
৩ ডাঃ হ্যালক নিউইয়র্ক
৪ মিস গ্রে (পরে মিসেস হ্যালক)